রূপদর্শীর নক্‌শা

রূপদর্শী
লিখিত

অহিভূষণ মালিক
চিত্রিত

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
12403
25.4.55
AGARTALA

মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

তিন টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

এই লেখকের আরো রচনা

এই কলকাতায়

মেঘনামতী

কথায় কথায়

সার্কাস

মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয়া

সরলাবালা সরকার

শ্রীচরণকমলেষু

আপন কথা

রূপদর্শীর নক্‌শাগুলোর যেটুকু ছি ছি সেটুকু আমার প্রাপ্য। কারণ আমি লেখক। আরো ভালো লিখতে পারলে আরো বেশি তারিফ পেতাম। কিন্তু এই রচনাগুলোর যেটুকু বাহা বাহা, তা পাওনা সাগরময় ঘোষের, কারণ তিনি সম্পাদক। তিনি তাগিদ দিয়ে না লেখালে এগুলো কোনোদিনই বেরুতো না, রূপদর্শীর জন্মই হ'ত না।

তা হলে বিত্তান্তটা বলি।

এক বন্ধু, প্রতাপকুমার রায়, এখন দিল্লীতে, 'টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া'র ম্যানেজারি করছেন। যখন কলকাতায় ছিলেন, তাঁর অধীনে চাকরি জুটেছিল। সেইখানেই আলাপ অহির সঙ্গে। অহি অর্থ 'অ', অহিভূষণ মল্লিক, যিনি ছবিগুলো এঁকেছেন। আলাপের সুতো শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বের কাটিমে জড়িয়ে বসল। আছি আছি, বেশ আছি। খাচ্ছি দাচ্ছি চাকরি করছি। হঠাৎ একদিন না বলা না কওয়া মনিববন্ধু বদলি হলেন। এলেন এক নতুন 'বস্'। আগের মুনিব যাদের ভালো দেখেছিলেন ইনি তাদের কালো দেখলেন। ফলে আমার আর অহির চাকরিটি 'নট্' হল। জিন্দগীর ন'টে গাছটি এখানেই মুড়োতো আর আমার গল্পও ফুরোতো, কিন্তু না, খেল কিছু বাকি ছিল, তাই ফয়শালা চট্ করে হল না। দেখা হল সাগরময় ঘোষের সঙ্গে। দেখা করতে বললেন, 'দেশ' অফিসে। ফরমায়েস দিলেন লেখার, পরামর্শ দিলেন বিষয়ের। বললেন, জীবনের কিছু তাজা ছবি আমায় এনে দাও। নাম দিলেন রূপদর্শী। রূপদর্শীর জন্ম হল। কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই দেখা পেলাম আরেক চওড়া হৃদয়ের, কানাইলাল সরকারের। পাকা-পোক্ত আশ্রয় মিলল।

ব্যস্। তারপর কলম চলল ফুল ফোর্সে। সৈয়দ মুজতবা আলী দিলেন নাচিয়ে। বললেন, বা বেটা, লড় যাও। তো লড়ে গেলাম। প্যালা দিলেন অহিভূষণ। রূপদর্শীর নক্‌শা অহিভূষণ না থাকলে কানা হয়ে যেত। অশেষ ধৈর্য, অনেক যত্ন আর অপরিসীম শ্রম নিয়ে উনি লেখাগুলোকে খোলতাই করেছেন। আমি যদি জীবনকে লেখায় ফুটিয়ে থাকি (সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে) তো অহিভূষণ লেখাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। ওঁর কলম আমার থেকে জোরদার, প্রতি বার উনি আমাকে মেরে বেরিয়ে গেছেন।

তারপর আসেন আমার 'বড়দা', গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, মিত্রালয়ের মালিক। বললেন, দে, তোর নক্‌শা ছাপি। ছাপবে তো ছাপ। ব্যস্‌, ছাপা হয়ে গেল।

কিন্তু এ সব কিছুই হ'ত না, যদি দুঃসময়ে একজন অকাতরে না রেস্ত জুগিয়ে যেত। লেখক হবার বারোটা তখনই বেজে গিয়েছিল অভাবের তাড়নায় যখন গাংটকের কাছ বরাবর কাঠ চেরাই কলে কাজ নিয়ে চলে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম। যেতে দিলেনা 'চন্দু'। লিখে পাঠালে, এখানে এসো না, তোমার জায়গা কলকাতা, সেখানেই তোমার সিদ্ধি। যতদিন তোমার কিছু না হয়, ভয় কি, আমি তো আছি। আর বরাবর সে তার কথা রেখে গেছে।

এই নক্‌শা যখন সে একখানা হাতে পাবে, আপনারা কেউ তো জানেন না, পার্শেলটা যখন খুলবে, দেখবে আমার বই, সামনে নেই তবু তো ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তার মুখ। ধার-করা গাম্ভীর্য খসে পড়বে তার। ছেলেমানুষী উৎসাহে বইটার গন্ধ শুঁকবে, টেবিলে বসবে চিঠি লিখতে। লিখবে, বইটা তাহলে সত্যিই বেরুল! 'চন্দু'কে খুশি করতে পেয়েছি, তাতেই আমার পাওনা মিলে গেছে।

এবার 'দেশ' অফিসের আর দুটি লোকের কথা—সাগরবাবুর সহকারী জ্যোতিষবাবু আর অমর—এঁরা দুজনে যে সাহায্য করেছেন তার মাপ হয় না। এঁদের সাহায্য ছাড়া 'নক্‌শা' বেরই হতে পারত না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে যদি এঁরা খাটো না হয়ে যান তো তা করছি।

আর আমার বহুৎ কৃতজ্ঞতা আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি। তাঁরা যে দেশ পত্রিকার ব্লকগুলো ব্যবহার করতে দিয়েছেন সে জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আর আছেন শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদয়াল বসু। অশেষ স্নেহবশত ক্লেশ স্বীকার করে ইনি প্রুফ্‌ দেখে দিয়েছেন। সব ঋণ শোধ করা যায়, কিন্তু স্নেহের ঋণ কি শোধ হয়? না করা যায়? তাই তাঁর ঋণ স্মরণের খতেনে জমা রাখলাম। অলমিতি।

কলকাতা
ডিসেম্বর, ১৯৫২

বড়বাজারে একদিন

শুধু যে বিলাকৃমার্কেট দেশে ঢুকল আর লেনদেনের ইষ্ট ঠাকরুন অন্ধকারের অন্দরে বাসা বাঁধলেন, ঘটনাটা এমন নয়। অন্ধকারের সঙ্গে ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্মী ঠাকুরানীর অনেক দিনের। নিজে কেন, সাঙ্গোপাঙ্গো, নোকর নফর অব্দি আলোর কাছে কাঁচুমাচু। অর্থ-রূপে, গহনা-রূপে, চোখ বুজে তাঁর যত রূপেরই ধ্যান কর, সবেরই দেখবে আখেরী বসবাস পাল্লাবন্ধ গোদরেজের সিন্দুকে। অন্ধকারের বিছানায় হাত-পা মেলে তাদের খুশি খুশি অধিষ্ঠান। পেয়ারের বাহন পেচকটিও আলোহীন কালোয়াতিতে পাকা পোক্ত।

কাজেই বড়বাজার দুপুর দিবসে মনের হরষে যে রাত রাত হয়ে থাকবে, এ আর বেশি কথা কি?

বড়বাজার আর ব্যবসা, টাকার এ পিঠ আর ও-পিঠ। হাঁসের মুখে মোর্গা ডাক তবুও সম্ভব। কিন্তু বড়বাজার ঠাই-হদ্দ, অথচ তার মুখে ক্যায়া ভাও ক্যায়া ভাও শোনা যায় নি, এ কভু সম্ভবে না। ব্যবসাতে লক্ষ্মীর মনোপলি এক্তিয়ার। বড়বাজারের অলিগলিতে অব্দি তাঁর দৌড়াদৌড়ি। আলোর সঙ্গে তাঁর জন্মআড়ি। তাই বড়বাজারের বাড়িগুলো হাজার মাথা উপরে তুলে, নাকে নাক ঠেকিয়ে আলো-কে শাসিয়ে দিয়েছে, কেটে পড় ব্রাদার, ওনার দিকে নজরটি দিয়েছ কি সমুদয় তেজ বস্তাবন্দী হয়ে তেজপাতার পোস্তায় ওজনে উঠবে! আলো ব্যাচারা আর করে কি, ব্যাজার হয়ে তেজ কমালে। আর সেই ফুরসতে ঘাপটি মারা অন্ধকার উঁচু বাড়ির আঁচল ঢাকা গলিপথগুলোয় গুটি গুটি চরতে বেরুল!

বড়বাজারের গলিগুলোর ছিরি ছাঁদ বড় চমৎকার। সব রাস্তা বানিয়ে ফেলার পর ঝড়তি পড়তি মসলাপাতি নিয়েই বোধকরি কর্তারা এদিকে নজর দিয়েছিলেন। পথের মধ্যিখানে প্রমাণ সাইজ একটা লোককে দাঁড় করিয়ে তার দুটো কান যাতে ঠেকাঠেকি না করে অনায়াসে চলতে পারে সে বন্দোবস্তটুকু করতে অবিশ্যি তাঁদের ভুল হয় নি। কিন্তু তার বেশি আর এক ছটাকও নয়। তোড়জোড় করে আবৃত্তি শুরু করে মাঝখানে কথা ভুলে গিয়ে ছেলেরা যেমন হঠাৎ বসে পড়ে, এখানকার অনেকগুলো গলিরই হাল প্রায় সেই রকম। তোড়জোড় করে গলি শুরু হল, পথ ধরে এগিয়েও চললেন, হঠাৎ দেখলেন আপনার নাকটি ঠেকেছে কারো খিড়কির দরজায়।

গল্প শুনেছিলুম। এক অধ্যাপক বাসা নিয়েছিলেন গলির গলি এক অন্ধ গলির মধ্যে। তাঁর বাসাতেই গলির মুখে দাঁড়ি পড়েছে। গরমকাল। গুমোট গরমে প্রাণছাড়ি প্রাণছাড়ি অবস্থা। ভদ্রলোকের একেবারে পাগলের দশা। খালি বিড়বিড় বকে চলেছেন, হাওয়া আসছে না কেন, অ্যাঁ? হাওয়াটার আজ হল কি?

অধ্যাপকের ভাইপো মফস্বলের ছেলে। পরীক্ষার পড়া করতে কাকার বাড়ি আগমন। একে গরমে পুরো শিক্ষে, তার ওপর কাকার ভ্যাজর ভ্যাজর। আর কাঁহাতক সহ্য হয়।

ভাইপো খেঁখিয়ে উঠল, থামো থামো। বাসা তো নিয়েছ, হোমিওপ্যাথিকের পুরিয়ার মতো। আঠাশটি মোড়ক খুললে তবে চারটে গুলি, তাও চোখে মালুম হয় কি না হয়। গলির গলি তস্য গলির মধ্যে তো বাসা একখানা জোগাড় করেছ, তাও আবার ব্লাইণ্ড লেন,—আবার হাওয়া চাইছ? বলি ওদেরও তো লজ্জা শরম আছে?

কাকা বললেন, গর্দভ কাঁহে-কা! সায়েন্স পড়িসনি? বলি হাওয়াটা বড় রাস্তা দিয়ে যাবে তো? যেতে যেতে গলি পেলে ঢুকবে না? তবে?

ও গলিতে ঢুকে সে গলিতে ঢুকবে। সে গলির থেকে এ গলিতে ঢুকবে আর এ গলিতে ঢুকে বাছাধন যাবেন কোথায়? পথ তো বন্ধ। দেয়ালে এসে ঠেক খাবে। তারপর যাবে কোথায়? দেয়ালটা তো আর হাওয়াটাকে চুমুক দিয়ে শুষে ফেলবে না? তা হলে? তা হলে সে হাওয়া যাবে কোথায়! এ দেয়াল থেকে ঠেক খেয়ে ও দেয়ালে, তারপর ওখান থেকে ঠেক খেয়ে সেই দেয়ালে যাবে।

(এমনি করে ঠেক খাওয়াতে খাওয়াতে ভদ্রলোক হাওয়াটাকে নাস্তানাবুদ করে নিজের জানালার উল্টো দিকের দেয়ালে নিয়ে ঠেক খাইয়েছেন)।

সেই দেয়াল থেকে হাওয়াটা যাবে কোথায়? জানালাটা খোলা পেলে হুড়মুড় করে এদিক পানে আসবে না?

বলেই আঙুলটা ঘুরিয়ে নিজের জানালাটি দেখিয়ে দিলেন।

বড়বাজারে পা দিয়েই মনে হল—অধ্যাপকের বাড়িটার একটা হদিশ পেলুম। পরে ঠাহরটি সই করে বুঝলুম, ভুল! অধ্যাপকের ছিল হাওয়া পাবার আকাঙ্খা, কিন্তু এদের হল হাওয়া পাবার শঙ্কা। আখে মোচড় দিয়ে দিয়ে যেমন সব রসটুকু নিংড়ে নেয়, এরা তেমনি গলিতে মোচড় দিয়ে দিয়ে হাওয়া বার করে ফেলে দিয়েছে বাইরে। তাতেও পুরো ভরসা পায়নি, বাড়ির মাথায় ঝরোকার ঘোমটা তুলে দিয়েছে, পাছে ছিটেফোঁটাও হাওয়া ঢোকে। সাবধানের বিনাশ নেই। লক্ষ্মীও তো কর্পূরের মতোই সচলা, বাতাস লাগলে পাছে উবে যান। ফাঁক-ফোকর-বিহীন বাড়িগুলো দেখে মনে হল, এগুলো যেন এয়ারকণ্ডিশন করা ইনকুবিটার। লক্ষ্মীর ডিম ফুটিয়ে ছানা বানাবার কতকগুলো কল।

হ্যারিসন রোড, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, মহর্ষি দেবেন ঠাকুর রোড আর চিৎপুর নিয়ে এক চত্বর। তামামটাই বড়বাজার। এই তল্লাটে ঢুকে পড়লেই বাংলামুলুকের সঙ্গে সম্পর্ক কাট্‌ হয়ে গেল। বেশভূষা, চলন বলন, ঠাট

ঠমক, জাঁক জমক, সব ভিন্‌মুলুকী। পুরুষ লোকেরা ধুতি পরেন। এক পায়ের গোছ পর্যন্ত কাপড়ের ঝুল নামল তো হিসেব সই সই রাখতে কাপড় উঠল অন্য পায়ের হাঁটুর ওপর। মহিলারা মাথার ঘোমটার বিপুল বহর জোগাতেই অ্যাসা কাপড় খর্চা করেছেন যে, টান পড়ল অন্য দিকে।

চারটে সদর রাস্তা হাত ধরাধরি করে ঘিরে আছে বড়বাজারকে। বড়বাজারের তাই চারটে মুখ। চারটে মুখই দর্শনধারী। দিনের বেলায় মহাব্যস্ত। খালি দাঁড়িপাল্লার আর গজকাঠির মেহন্নৎ। পোস্তা আর রাজাকাটরা, লোহাপটি আর তুলাপটি, আর মেওয়া বাজার। হাজার হাজার লোকের নিত্য হাজিরা। আজকের দর কী? ক্যায়া ভাও? আলু ছাড় আর মসলা বেঁধে রাখ। সোনার বাজারে তেজ নেই। লোহার মন্দা কাটছে। নগদ আর চেক আর হুণ্ডি।

কিন্তু খাসতুপুরেও, বাইরেটা বড়বাজারের যতই কেনাবেচার কচকচি দিয়ে ভরা থাক না কেন, অন্দরটা আশ্চর্য শান্ত। সেখানে গেরস্তিয়ানারই দরবার। পোস্তা ছেড়ে একটু এগিয়ে এসো হ্যারিসন রোড বরাবর, অথবা শিকদারপাড়ার উঠোন মাড়িয়ে ঢুকে পড়ো বড়তলা স্ট্রীট কি বাঁশতলা লেনে।

কি দেখবে?

চলমান জনস্রোতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যা-লিবে-তাই-ছ-আনার পরিত্রাহি চীৎকার? কানে এক হাত

চাপা দিয়ে তেস্থুরে আওয়াজ অন্যের কানে লাঙল চষা? না। পর্বত প্রমাণ এক পাঞ্জাবী যুবক খাটুন মেরে বসে ফাউন্টেন পেন সারাচ্ছে? তাও না। এসব বড়বাজারের বাইরে, ভেতরের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্য।

আজ কি তিথি? আমলা একাদশী। বটে বটে? চলল এক মাড়োয়ারী মেয়ের স্পেশাল দল বেঁধে। ইট কাঠ আর কংক্রীটের কড়া চৌকির চোখ এড়িয়ে একটা সবুজ পার্ক কি করে যেন টিকে গেছে। গন্তব্য সেইখানেই। লাল আর হলদের বুটিদার চুমকি বসানো শাড়ি পরনে, আ-চিবুক ঘোমটা, হাতে থালা—থালায় সাজানো নানাবিধ ফল। আজ যে আমলা পূজার দিন। পার্কটাতে নানাবিধ গাছগাছালি পোষা। একটা আমলকি-গাছও। পার্কের মালীর সেটা চক্ষের মণি, সাতরাজার ধন। তোয়াজে রেখেছে আমলকি চারাটাকে। কারণ ওর পায়েই তো জুটছে কিছু। শুধু কলাটা মূলোটাই নয়, টাকা সিকিও হাজরে দেয়। বছরে তুবার আমলা পূজো। মেয়েরা আসেন, লাল হলদেয় ছোপানো স্তোর কলবা গাছে বাঁধেন, যখনকার যা ফল ফুলুরি গাছের গোড়ায় ঢেলে দেন, আধুলি টাকাও ধীরে ধীরে জমে ওঠে। মনে মনে মন্তর আবৃত্তি করতে করতে আমলকি চারা প্রদক্ষিণ করেন। প্রার্থনাও মামুলী, কুলকিনারা নেই।

লম্বা আর সরু রকে সার সার বকের মতো পা ঝুলিয়ে বসা একদল

পুরুষ পরম আলস্যে বসে বসে দিবাস্বপ্ন দেখছে। একজনের হাতে হয়ত একখানা খবরের কাগজ। বোম্বে বুলিয়নের খবরে চক্ষু এটেনশন।

রাস্তায় রাস্তায় ফলের বেসাতি। আর সবজির দোকান। দোকানে যত্ন করে সাজানো বেগুন আর বাঁধাকপি, আলু আর আমলকি, পেঁয়াজ আর পুদিনাপাতা, আরো কত। এক পাশে বসে আছে দোকানী। আসছে খরিদ্দার। মেয়েরাই বেশি। এরা ঘোমটানশীন কিন্তু পর্দানশীন নয়। ঘোমটার আড়ালে থেকে নিঃসঙ্কোচে কাজকর্ম গালগল্প সবই চালিয়ে নিচ্ছে।

আজ দেখলে কে বলবে, একদিন এই চত্বরটায় বাঙালী নামক একপ্রকার জীব বাস করত। ব্যবসাবাণিজ্য-প্রধান এই তল্লাট, তখনো

কলকাতার পত্তন হয়নি, সুতোনুটি গোবিন্দপুর মৌজার মধ্যে। শিকদারদের তখন বড়ই দপদপা। ধনে জনে ঘর সংসার উথলে উঠছে। স্বপ্ন পেয়ে বাড়ির কর্তা মাটি খুঁড়ে বের করলেন দেবী মূর্তি। মন্দির নাটমন্দির তৈরী হল। মায়ের নাম তারাসুন্দরী। অমাবস্যায় অমাবস্যায় নিয়ম পূজা। কত ধূমধাম ছিল। পাঁঠা বলি মোষ বলির রক্তে পথ অব্দি পিছল হয়ে থাকত। তারপর একদিন অচলা লক্ষ্মী সচলা হলেন। শিকদারদের অবস্থা পড়তে লাগল। বাড়িঘর বিক্রি হতে শুরু

হল। যাঁরা ছিলেন তারাসুন্দরীর পুরোহিত, তাঁরাই ধীরে ধীরে সেবাইত হয়ে উঠলেন। হাতফেরতা দেবী তারাসুন্দরী নিজের স্ত্রীধন সহ এখনো তাঁদের কব্জায়। তারাসুন্দরীর পুরোনো মন্দির আর কর্পোরেশনের তারাসুন্দরীর পার্কটুকু টিমটিম করে এখনো টিঁকে রয়েছে। মিনমিন করে তাই এখনো জানিয়ে দেয় তার অতীত ঐতিহ্যের কথা।

এ-গলি সে-গলি ঘুরপাক খাচ্ছিলুম। নানা জিনিষ নজরে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল ধারে কাছে হাজার মাইলের মধ্যে কোথাও বাংলা মুলুকের সুলুক-সন্ধান পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ! এমন সরু গলি-গুলো তো বারাণসীর। জর্দা-সুর্তির গন্ধে ম ম। বিশ্বেশ্বরের পেয়ারের ষণ্ডের মতোই এখানেও গণ্ডা-কয়েক বিচরণ করে। একটা বৃহৎ বাড়ির ভেতরে গেঞ্জির কল। ইন্টারলকে ফটাস্ ফটাস্ গেঞ্জি তৈরী হচ্ছে। বাইরের দিকটায় আরো কেরামত। ইস্কুল বসেছে বারান্দায়। লম্বায় হাত পঁচিশেক, চওড়ায় কুল্লে বিঘৎখানেক হল তো বড় ভাসা-ভাসি। ছাত্রছাত্রী একুনে শতেক খান। ঠাসাঠাসি বসে পাঠ তৈরী

করছে। চেল্লানির চোটে কানের পোকা বৃন্দাবনে এই যায় তো সেই যায়। নির্বিকার মাস্টার দিব্যি বাগিয়ে বসেছেন জলের ড্রামের ওপর। যার তেষ্টা পাচ্ছে, নিচু হয়ে কল টিপে জল খেয়ে নিচ্ছে। মাঝে

মাঝে মাস্টারজী হাঁক পাড়ছেন নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দেবার জন্যে।

ঘুরতে ঘুরতে হদ্দ হয়ে বসে পড়লুম এক বেঞ্চে। ওপরের বারান্দায় বুড়ি বসে বাদাম বাটছিল। কথায় কথায় জমে গেলুম।

তিরিশ বছর আগে বুড়ির মরদ বিকানীর থেকে কলকাতায় এসেছিল লোটাকম্বল সম্বল করে। তার চোখে দৌলতের স্বপ্ন। ক্ষেত-খামারে আর রোজগার কী? কলকাতায় চল, সেখানে পথে-ঘাটে পয়সা; সেখানে ধূলো ধরলে সোনা। বুড়ি তখন নতুন বৌ। কি আর করে। দু-কানি জমি ছিল, বেচে দিয়ে কলকাতার টিকিট কিনলে। বড়বাজারে এসে বাসা বাঁধলে। সেও তো তিরিশ সাল হয়ে গেল। তারপর থেকে দশ বছর তার মরদ বড়বাজারে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছে। যা ছিল জেওর-উওর সব বেচে-কিনেও পেট চলেনি। তারপর অভাবের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে। এক বেটা ছিল সেও মরেছে। তারপর বিশ বছর ধরে শুধু বাটনা বাটছে বুড়ি। বাদাম বাটছে, বর্ফি হবে। কলাই বেটেছে, বড়ি হবে। আলু, মুগ আরো হরেক চিজ বেটেছে, পাঁপর হবে। বুড়ি বাটনা বাটতে বাটতে একটু থামল। ওপর দিকে একবার চাইলে। সারি সারি উঁচু বাড়িগুলোর দিকেই নজর দিলে হয়ত। এমন একটা বাড়ির স্বপ্ন তিরিশ বছর আগেকার ছেলেমানুষ চোখে একদিন উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছিল। ফিকে হতে হতে আজো তা এক কোণে লেগে রয়েছে ছেঁড়া সূতোর আঁশের মতো।

হঠাৎ মনে হল বড়বাজারের সবটাই দুধ-ভাতের থৈ-থৈ সরোবর নয়, এ-রকম নিষ্ফল বুদ্বুদ বিরল নয়।

প্রথমে দুধ ঘোলা। দরিয়ার প্রথম নিশানা তাই। আর লম্বা হাতের কারিগর কেউ পোঁচে পোঁচে যখন দুদিকের পাড় মুছে ফেলেছে, পানির রঙ বদলাতে শুরু করেছে, ঘোলা কেটে সবুজ আর সবুজ থেকে কালী অবতার, তখন বুঝলে তুমি নিশ্চিত বার-দরিয়ার কোলের মধ্যে। বদর বদর বল মিঞা। খোদার ফজলে যাত্রা যেন ভালো হয়। জরু গোরুর কথা থাক, পড়ে থাক নারিকেল সুপারির হাতছানি। পীরের দোয়া শিরে বেঁধেছ। এখন হুঁশিয়ার হয়ে কালাপানি পাড়ি দাও।

এ তো গেল তাদের কথা, যারা জাহাজে উঠতে পেরেছে। বাপ-দাদার পয় ভালো, আসতে না আসতেই নোকরি মিলে গেছে। বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে, কালাপানি পাড়ি মেরে ভালোয় ভালোয় ডাঙায় ফিরে আসা আর কতখানি মেহনৎ! তার চেয়েও ঢের শক্ত ডাঙার থেকে জাহাজে চাপা। কলকাতার বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে তামাম মুলুক ঘুরে আসতে বড় জোর দেড় বছর লাগুক, সে তো কত হাজার হাজার মাইলের ধাক্কা। কিন্তু খিদিরপুরের এই ওয়াটগঞ্জ থেকে গঙ্গার কিনারে তক্তাঘাটের দূরত্ব আর কত হবে, বড় জোর হয়ত আধ মাইল, কিন্তু এইটুকু পথ পাড়ি জমানোর তদ্বির তদারকেই শরীরের ঘাম ঝরে লুঙ্গির গিঁটে পাকী আধপো নিমক জমে যায়, আর বছরের পঞ্জিকা থেকে চার পাঁচটা মাস যায় বেমালুম গরচা।

তক্তাঘাটে যে বিরাট বিল্ডিং—মেরিন হাউস, ওইখানেই নাবিকদের জীয়নকাঠি মরণকাঠি। এই বাড়িটায় ঢুকতে ওদের বক্ষ দোলে দুরু দুরু এখানে শিপিং অফিস, দেশী ভাষায় 'চাইন অফিস' চাইন অর্থ, সাইন অর্থাৎ কিনা সই। তামাম হিন্দুস্তানে এই 'চাইন অফিস' মাত্র

তিনটে। কলকাতা, মাদ্রাজ আর বোম্বাই বন্দরে। এই দপ্তরের যিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেই শিপিং মাস্টার মহোদয়ের স্থান এই নাবিকদের কাছে আল্লার একধাপ নিচেই। দুজন ডেপুটি, একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এবং আরো গাদাখানেক লোক নিয়ে ইনি সমস্ত কাজ ম্যানেজ করেন। আর কাজও খুব সোজা নয়, ঝামেলা বিস্তর।

জাহাজে লস্কর নেওয়া হবে, সাইন হবে মাল্লাদের, মারফৎ শিপিং মাস্টার। জাহাজ এসে ঘাটে ভিড়ল তো এক ঝামেলা সতের মামলায় দাঁড়াল। চুক্তি ছিল ন' মাসের, কাজ মেটাতে পারেনি, আসতে দেরি হয়েছে জাহাজের, হয়েছে এক বছর কি পনের মাস। ব্যস্, হিসেব করো কত পাওনা হয়েছে চুক্তি অনুসারে। কত বৃদ্ধি হয়েছে, কত অ্যাড্ভান্স নিয়েছে, মোট পাওনা কত। হিসেব একেবারে পায়ে পায়ে সুকুমার রায়ের হযবরল-এর কাকের নিয়ম ফলো করে। সাত-দুগুণে সব সময়েই চৌদ্দ হয় না! চুক্তিমতো প্রথম ন' মাসের মাস মাইনে আর চুক্তির বাইরের মাসিক বেতন একরকম নয়। কিছু বৃদ্ধি হয়। ন' মাস থেকে বার মাসে যা বৃদ্ধি, বার থেকে পনের মাসের বৃদ্ধি তার চাইতে বেশি। সে সব ফয়সালা করবে কে? শিপিং মাস্টার। পাওনাগণ্ডা পয়সাপাইটি অবধি মিটলে, ছিম্যান (অর্থাৎ সিম্যান. মানে নাবিক) যদি সন্তুষ্ট চিত্তে ঘাড় নেড়ে কোম্পানির খাতায়

টিপ ছাপ দেয় তবেই কোম্পানির স্বস্তি। আর যতক্ষণ তা না হচ্ছে, খুঁতখুতুনি না মিটছে ছিম্যানের, হিসেব বুঝ হচ্ছে না, খাতায় টিপ ছাপ দিতে গাঁইগুঁই করছে, 'চাইনপ্' (সাইন-অফ) না হচ্ছে, ততক্ষণ কোম্পানির পালাবার পথ নেই, শিপিং মাস্টার আছে পিছে।

শিপিং অফিস সরকারী অফিস, শিপিং মাস্টার সরকারের লোক। সন উনিশ-শো সাঁইত্রিশে যে ইণ্ডিয়ান সিমেন্স অ্যাক্ট তৈরী হয়েছে তার প্রতিটি দফা মেনে চলা হচ্ছে কিনা, কে দেখবেন? শিপিং মাস্টার। জাহাজে লোক ভর্তি করলেই হল না। কতদিনের জন্যে নিচ্ছ এদের, যে বন্দর থেকে নিয়ে গেলে, এদের সেখানেই আবার বহাল তবিয়তে ফেরৎ দিয়ে যাবে, জাহাজে যতদিন থাকবে এদের খানাপিনার ভাবনা তোমার, চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের বেতন দিতে হবে। এরও আবার রীতি প্রকৃতি আছে; এক বিরাট খাতা আছে কাপ্তানের কাছে—লগ্ বুক। প্রতি খুঁটিনাটি সেই লগ্ বুকে তুলে রাখে কাপ্তান। তাই, কোনো জাহাজ বাইরে যাবে, সিম্যান নেবার সাব্যস্ত হল, কাপ্তান গুটি গুটি হাজির হলেন শিপিং অফিসে। লোকজন বাছা হল তাদের রেকর্ড দেখে। ডাক্তারি হয়ে গেল। টাকা-পয়সা অ্যাডভান্স দিয়ে

এবার সেরেফ 'চাইন' করা। লগ্‌বুকে পয়লা আদামী সাইন করবেন জাহাজের কাপ্তান। তিনিই তামাম জাহাজখানার মালিক। মাস্টার। কোম্পানি সব্বার আগে তাঁর সঙ্গে লেখাপড়া করে নেন। তিনি ঠিক হলেই আর সবাই আপসে-আপ্‌ জুটবেন। আগে কাপ্তানই ছিলেন জাহাজীদের পুরস্কার-পয়জারের মালিক। সিম্যানদের বেতন থেকে সাজা অবধি সব কিছু বিলি বন্দোবস্ত তিনিই করতেন। কোম্পানির ঘর থেকে টাকা নিয়ে, যা মাইনে তার চেয়ে কম দিয়ে বাকি টাকা কাপ্তানের ট্যাকস্থ হয়নি যে তা নয়, হয়েছে এককালে। তবে কিনা এখন বেজায় কড়াকড়ি। কাপ্তানের সরাসরি ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। মাইনে-পত্রের রেট্‌ কোম্পানিই বেঁধে দেয়, আর জাহাজীদের ওপর কর্তৃত্ব চালালেও গুনা-ঘাটের জন্যে হাতে মাথা কাটবার দিন 'গন্‌'। রুল উঁচিয়ে ডাঙায় বসে আছেন শিপিং মাস্টার। তাঁর কাছে নালিশ কর, ব্যবস্থা তিনিই করবেন। ছোটখাট অপরাধের জন্যে অবিশ্যি তুমি সাজা দিতে পার। ডিসিপ্লিন ভাঙলে, ডিউটিতে গাফিলতি করলে, মাতোয়ালা হয়ে হাঙ্গামা বাধালে, একদিন কি বড় জোর দু'দিনের বেতন কাটতে পার। তবে এর বেশি আর তোমার কাপ্তেনি চলবে না।

প্যাসেঞ্জার-জাহাজে যেমন কেলাস ভাগ, ফাস্ট কেলাস, সেকেন্‌ কেলাস, ডেক, জাহাজীদের মধ্যেও তেমনি, তবে তিনটে নয়, দুটো। অফ্‌সর আর সিম্যান, ইংলিশে বলে অফিসার আর রেটিংস্‌। জাহাজে আবার এক দো তিন ডিপার্ট। ডেক, ইঞ্জিন আর সেলুন। কাপ্তান তো সবার ওপর। তারপরে ডেক ডিপার্টে থাকে-থাক নেমে গেছেন ফার্স্ট অফিসার, সেকেণ্ড অফিসার, থার্ড অফিসার, ফোর্থ অফিসার। এদের বলে 'মেট'। সিম্যানদের হেড—সারেঙ। এর অধীনে ফার্স্ট টিণ্ডাল, সেকেণ্ড টিণ্ডাল, তারপরেই লস্কররা। সারেঙ কাপ্তানের কাছ থেকে হুকুম আনবে, পত্রপাঠ চালান করবে টিণ্ডালকে, টিণ্ডাল কাজ আদায় করে নেবে।

জাহাজ বাঁধতে হবে, জেটিব এসেছে, হুকুম গেল। মোটা কাছি জাহাজ থেকে নেমে জেটির খুঁটোয় সোহাগের পাক দিতে লাগল। এক পাক, দু' পাক, পাঁচ পাক, সাত পাক। জাহাজ ভেড়ানো কঠিন কাজ মিঞা—হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার। কাছির পাক ছিঁড়বে তো নাও আর এ পারে নাই,, ভিড়বে গে জীবনের হে-ই পারে, একেবারে জাহান্নামের সদর ঘাটে। তাই বলি হুঁশিয়ার। একটা করে পাক দাও, একটু করে জাহাজ হাফিজ করো, আলগা দাও, আলগোছে বেঁধে ফেল জেটির লোহার খুঁটোয়।

শুধু কি জাহাজ বাঁধা, আর জাহাজ খোলা কাজ ডেক-লস্করদের? জাহাজের ডেক ধোবে কে? জাহাজ রঙ করবে কে? ঢেউ-এর চাবুকে ছিটহাট টুটা-ফুটা রিফু-মেরামতি কাজ কার? এ সবই ডেক ডিপার্টের। মাল-জাহাজে ঝামেলা তবু কিছু কম, কিন্তু প্যাসেঞ্জার-জাহাজে তাল সামলাতে নিজের গতর ডকে তুলতে হয়।

নিজের হাল নিতান্ত বেচাল হলেও জাহাজের হালে কড়ামুঠির বাঁধন যেন শিথিল না হয়, নচেৎ অচিরে বানচাল। তিনটি লোক পালা করে হালটি ধরে বসে থাকে, সকাল দুপুর রাত্রি। এর আর রবিবার শনিবার নেই। এই হালধরা যে নাবিক, এদের বলে কোয়ার্টার মাষ্টার, সাদা বাংলায় সুখানি!

আরেকটা ডিউটি আছে এ ছাড়া, পহরী-ডিউটি। মাস্তুলে বসে পাহারা দেওয়া। চোখে শানিয়ে রাখা অক্লান্ত সতর্কতা। দূরে কি কোনো জাহাজ দেখলে? ছোট ডিঙি মতোন কী ভাসছে ওটা? নড়ছে চড়ছে যেন কে? আ-হোই। দরিয়ার বুকে আর্ত মানুষ। সাহায্য দাও, তুলে নাও। সঙ্কেত গেল মাস্তুল-পহরীর কাছ থেকে। সড়্ সড়্ নামল জালিবোট একখানা। বেঁচে গেল গোটা কয় মানুষের জীবন। দু'ঘণ্টা দু'ঘণ্টা এদের ডিউটি। বার জন যদি লোক থাকে তো ছ'জন ছ'জন

ভাগ হয়। ছ'জন যাবার পথের পহরী, বাকি ছয় ফিরতি পথের। এই ছ'জন আবার রাতকে কেটে ছ'টুকরো করে, টুকরো প্রতি তু'ঘণ্টা, প্রতি-জনের পাহারা দেবার পালা।

ডেক-ডিপার্ট, তারপর ইঞ্জিনঘর। বড়কর্তা চিফ্‌ ইঞ্জিনিয়র, তারপর ধাপের ধাপ সেকেন্‌, থার্ড, ফোর্থ, ফিফ্‌থ্‌ ইঞ্জিনিয়র, কোনো কোনো জাহাজে সিক্‌স্‌থ সেভেন্‌থও থাকে। এঁরা হলেন অফ্‌সর। লস্কর হল—ফায়ারম্যান, ডঙ্কিম্যান, অয়েলার, আইসম্যানরা। বয়লারে কয়লা মারো। ইঞ্জিন চালু রাখো, তেল লাগাও কজায়, মাল তোলবার ডঙ্কি ইঞ্জিন চালাও, বরফ মেশিন ঠিক রাখো। কাজের কি আদি অন্ত আছে? মানুষের খোদকারি যেমন তাজ্জব, তার খেদমত করতে করতে তেমনি আবার প্রাণান্ত।

সেলুন ডিপার্টে শুধু খানাপিনার ব্যাপার। অবশ্য ডেক আর ইঞ্জিনের ডিপার্টমেণ্টেরই রসুইঘর, ভাণ্ডার ভাণ্ডারী সব আলাদা আছে। তবে আবার সেলুন কেন? বা: প্যাসেঞ্জারদের খানাপিনা নেই নাকি? আর প্যাসেঞ্জারজাহাজ যদি নাই হয়, মাল-জাহাজ কি মানোয়ারে অফ্‌সরদের খানা কোথায় পাকায়? সেলুনে। এখানে সবার উপরে চিফ ষ্টূয়ার্ড, তার নিচে বাটলার, তার নিচে ষ্টূয়ার্ড, তারপর ভাণ্ডারীরা। ভাণ্ডারী হল জাহাজী ভাষা, ইংলিশে বলে কুক্‌ আর মায়ের ভাষায় রসুইকর।

এ ছাড়া কাপ্তেনের জন্যে কাপ্তেন-বয় আছে। সে কাপ্তেনের খাস খিদমৎগার। লস্কর মহলে এ আদমীর পজিশন ওর নতুন উর্দির মতোই টাইট। সবার সঙ্গে কথা বললে প্রেষ্টিজকে তো আর সব সময় টঙে রাখা যায় না, তাই যার তার সঙ্গে কথা বলে না। আছে তু'চারজন দিলজানের ইয়ার, তাদের কাছেই যা কিছু ঠোঁট-ফাঁক, ঠসক-রসকও তাদের সঙ্গেই। কাপ্তানের সঙ্গে সেপ্টে আছে, তাই তার ঘর-বারের

অনেক খবর জানে। ঠোঁট খুলেছে কি রঙদার সব খবর দাঁতের বাসা ছেড়ে পাখা মেলে পিলপিল বেরুতে শুরু করবে। কাপ্তানের কোন খবর তার অজানা? সে তাঁর বিবিকে অব্দি দেখেছে। আর কাপ্তানের বিবি কি একটা যে হিসেব রাখবে? বন্দরে বন্দরে হরেক বিবি জিয়ানো। যাকগে যাক, কেচ্ছা-কথা ফালতু বাত ছেড়ে দাও। যাও, এই আনকোরা নতুন বোতলটি ঝেড়ে দিয়ে এসো দিকিন। আসল মাল, তায় কোনো সন্দেহ নেই, আল্লার কিরে। দামটা বেরাদর বেশ চড়িয়ে নিও!

হালফিল লেনদেনা যা কিছু এক আধ পোসা, তা এই সেলুন ডিপার্টে। যুদ্ধের সময় অবিশ্যি চোরাগোপ্তা সব মিঞাই কিছু কিছু উপ্‌রি কামান কামিয়ে নিয়েছে, কিন্তু এখন সেলুনই যা ফোলা ফোলা আর সবই চোবসা বেলুন।

আর আছেন একজন কি বড় জোর দুজন রেডিও অফিসার, প্যাসে-ঞ্জারবাহী হলে একজন ডাক্তার, আর প্রতি জাহাজেই একজন করে রাইটার, মানে কেরানী। এই নিয়েই জাহাজের স্বজন পরিজন। এদের মেহনৎ, নিয়মানুবর্তিতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতাই জাহাজকে অকূল থেকে কূলে নিয়ে যায়। নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেয় মাল আর জান।

অফিসারদের অবস্থা তবুও ভালো। কিছুদিন আগে পর্যন্তও চাকুরির স্থায়িত্ব ছিল না, এখন তবু খানিকটা আশা হয়েছে। আর হয়েছে ইউ-নিয়নের দৌলতে। অফিসারদের সকলেই টেকনিক্যাল ষ্টাফ। বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারলে বিশেষ বিশেষ পোষ্টে ভর্তি হতে পারে। ভারত সরকারের পরিবহন দপ্তরের অধীনে এইসব পরীক্ষার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত আছে। যিনি মেট হবেন, তাঁকে পরীক্ষা পাশ করে

ফার্ষ্ট মেটের সার্টিফিকেট নিতে হবে। ফার্ষ্ট অফিসারকেই মেট বলে। তেমনি সেকেন, থার্ড, ফোর্থ মেটের টিকিট না থাকে চাকরির বেলা' ঢুঁ ঢুঁ হয়ে যাবে। ইঞ্জিনিয়রদের বেলা ইস্তক কাপ্তানের বেলাতেও সেই একই রুল। এর আর ভুলচুক নেই।

জাহাজের কাজ কারোরই স্থায়ী নয়। যতক্ষণ তুমি জাহাজে ততক্ষণ তুমি সুয়োরানীর বেটা। কোম্পানি তোমার খাওয়া পরার জিম্মাদার। জাহাজ বন্দরে ফিরলে সিম্যানদের 'সাইন অফ' করতে যা দেরি। ব্যস, আর তোমার দিকে নজর নেই! কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি খতম। এবার সিধে পথ দেখ। কোম্পানির সঙ্গে বাধ্যবাধকতা চুকে গেছে। এখন তুমি বাড়ি গিয়ে হালই চষো আর মালই বও তাতে কোম্পানির কি? তবে হ্যাঁ, ঘুরে ফিরে যদি আস, দেখা হয় যদি এই শিপিং অফিসের সারবন্দী লাইনে, যদি ফিট থাক আর যদি আমার মর্জি হয় তো নিতে পারি। সেও আমার ইচ্ছে, তোমার জোর নেই কিছু।

জাহাজীদের নসিবে এই অনিশ্চিত খোদাই হয়ে বসে গেছে। ভারতীয় লস্করদের 'গুড্ সেলর' বলে নামডাক আছে। তা সত্ত্বেও এরা শ'য়ে শ'য়ে বেকার। কতজন আসছে আর কত যে যাচ্ছে তার হিসেব গাঁথা নেই। তবে অনুমান, বন্দর কলকাতাতেই দু'লক্ষ সেলর আছে।

এদের মধ্যে দেশী বিদেশী জাহাজ মিলিয়ে মেরে-কেটে ষাট হাজার জনের চাকরি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাদবাকি আর ক'জন? তারা তো শঙ্করা। নিজেদের শোবার জায়গা হলে তবে তো তাদের ডাকা। আর দেশী জাহাজই বা ক'টা? পঁয়ত্রিশটে হয় তো খুব বেশি।

দিনের পর দিন এরা তাই ভিড় করে তক্তাঘাটের সাইন অফিসে। হাজার গণ্ডা বিড়ালের মুখের সামনে একটা মাত্র শিকে ঝুলছে।

তক্তাঘাটে আমিও ঘুরেছি। লাইন বেঁধে ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি শ'য়ে শ'য়ে। শতচ্ছিন্ন কামিজ, ছেঁড়া লুঙ্গি, ধূলিধূসরিত দেহ, ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। কিছুই সম্বল নেই। তবু দাঁড়িয়ে আছে আকুল আগ্রহে হাতে তাদের একটা চিরকুট—সি ডি সি (কন্টিনিউআস ডিস্‌চার্জ সার্টি-ফিকেট), যাকে ওরা বলে নলি। এই নলিটিই এদের সব। নাবিকদের দক্ষতার, অভিজ্ঞতার স্মারক। কাপ্তান আসবেন। এই সার্টিফিকেট তখন মূক ভাষায় ব্যক্ত করবে নাবিকটির গুণগেরামের সংবাদ। মনে হল গোহাটায় এসেছি। মানুষগুলোকে মনে হল খুঁটোয় বাঁধা বিক্রির গোরু। গা টিপে, গর্দান চাপড়ে, দাঁত দেখে পছন্দ হবে, তখন পাবে জাহাজে ওঠবার আশ্বাস। কিন্তু আশ্বাস পেলেই তো আর জাহাজে ওঠা যায় না। ডাক্তারি করাতে হবে না? ডাক্তার বুঝি ইবলিশেরই দোসর। মুকিয়ে বসে আছেন শুধু আন্‌ফিট করবার জন্যে; ছুতো একটা পেতে না পেতেই খস্‌খস্ লেখা হয়ে গেল টিকিটের ওপর—টেম্পোরারী আনফিট। চোখের ওপর ঝড়াক করে কালো পর্দা পড়ে গেল। কালো 'আন্ধার' জাঁতা দিয়ে চেপে বসল বুকে। ন'মাস যাবৎ চাকরি নেই। দেশ থেকে এসেছে মাস ছয়েক। সেখানে বেটী বেটা বিবি হাঁ করে পথ চেয়ে আছে। সাইন হলে অ্যাডভান্স মিলবে, টাকা কিছু পাঠাবে কারো হাত দিয়ে। কিন্তু ছ'টি মাস কাঁধের

ঘাম গঙ্গার বাঁধে ফেলে ফেলে যদিও বা ডাক্তারিতে পৌঁচেছিল, কলমের এক খোঁচায় দিলে পেছিয়ে আরো দু' মাস। ডাক্তার! অন্যের বুকে কল বসাও। তাই বুঝি তোমার কল্‌জেয় দরদ নেই। এখন কোথায় থাকি? কি খাই? যা ছিল পুঁজিপাটা সব তো খতম।

জিজ্ঞেস করেছিলুম; এতই যদি কষ্ট তবে আসেন কেন এই কাজে? অন্য কাজ করলেই তো পারেন।

জবাব দিয়েছিল, পারি কই? দরিয়ার মায়ায় যারা পড়েছে, গোরে যাবার আগে সে কি পারে তার টান কাটাতে? আমার সার্ভিস সাতাশ বছরের। চারবার চেষ্টা করেছি চাকরি ছেড়ে দেবার, কিন্তু পারছি কই? বার-দরিয়া পাড়ি দিয়ে দুনিয়ার তসবির যে দেখেছে একবার, সে কি-করে মুঠোভর গ্রামের উঠোনে কলজে ভরে বাতাস নেবে। রাশিয়া যাইনি। কিন্তু আর বেবাক্ জায়গা ঘুরেছি। দেশে দেশে আমার দোস্ত ছড়ানো, অন্তত তিন বচ্ছরে একবার তাদের মুখ না দেখলে যে হাঁফ ধরে বুকে।

আর তা ছাড়া, আব্দুল কাদের বললে, ঝগড়াটে বিবি দেখেননি? রাতদিন কিলোকিলি চুলোচুলিতে লবেজান করে ছাড়ে, কিন্তু সেই বিবির মহব্বৎ ও বড় কড়া। এড়ানো শক্ত। কালাপানিও সেই জাতের। জাহাজে ওঠবার আগেই যা কষ্ট, বিষম কষ্ট, কিন্তু জাহাজে একবার উঠতে পারলে, আর কথা কি। লোনা বাতাসে তাকত বেড়ে দু'নো হয়। পানিতে মাছের আর জাহাজে ছিম্যানের অবস্থা হল এক।

সুখানি-চরিত

বাপজান যদি ফৌত হল তো গার্জেয়ান গেল। চাচা কি আর যারা, তারা তো ভাতপানির কেউ নয়, লাথ মারবার পয়গম্বর। উঠতে হাত চলে তাদের, বসতে লাথ। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়। বাপ মরেছে এক মাসও হয়নি, চাচার মেহেরবানিতে গা-গতর ঢিলে ঢলঢলে হল, মাথায় আমার বাবরি ছিল, তাবৎ চুল গেল চাচার বার-বাড়ির উঠোনে। জান-প্রাণের মমতা করলে আর একদিনও এখানে থাকা নয়। তাই একদিন ফজের-নেমাজের শেষে, তিতবিরক্ত মনটায় 'হাত্তেরি দুনিয়া খোদা তেরা ভালা করে, বলে পিঠ চাপড়ে সটকান দিলুম। আর রেল কোম্পানিকে কুটুম বানিয়ে সিধে বন্দর কলকতা।

বয়েস আর কত হবে তখন।

আব্দুল সুখানি একটু থেমে হিসেব করতে লাগল।

এখন আমার বয়েস হয়েছে ছয়চল্লিশ, বত্রিশ সন দরিয়ার সার্ভিস, মাঝখানের আট বছর অবিশ্যি বাদ, কামকাজ করি নাই কিছু।

সুখানি আব্দুল হানিফের সঙ্গে পরিচয়টা আমার পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। বন্ধুর অসুখ। দেখতে গিয়েছিলুম। তখনো লেক হাসপাতালের দিব্যি দবদবা। সরকারি নেকনজর এড়িয়ে লেক হাসপাতাল দিব্যি চেক-নাই ছাড়ছে। খুব বেশি দিনের কথা নয়। তখনো বেলাতে লেবর সরকার গদি আঁকড়ে। এটলী সাহেব হিমসিম খাচ্ছেন টোরী দলের তেড়ি-মেড়িতে। জেনারেল ইলেকশন হবো হবো হচ্ছে। আর ইরানের তেলের মামলার হ্যাপা সামলাতে এটলী আর তাঁর ভাই বেরাদরেরা প্রায় ক্ষেপে যাবার দাখিল। ঠিক এমন সময় মিশর দিলে গোদের উপর বিষফোড়া চাপিয়ে। জনমত ইংরেজদের নুটিশ দিলে, বাপের সুপুত্তুর হওয়ার জন্য-

12403 LIBRA

ভূমে পাড়ি জমাও, আমরা আর নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকতে চাইনে। কিন্তু চাঁট ছুঁড়লে ছুট লাগাবে ইংরেজ এমন বান্দা নয়। পেটের ধান্দায় এককালে তাকে ত্রিভুবন চষে বেড়াতে হয়েছে। সাত সাত্তে উনপঞ্চাশ ঘাটের পানির ময়লায় তার পেটে চড়া পড়েছে। কারো তড়পানিতে ভড়কে মুক্ত-টাই হবার পাত্রই সে কিনা! বাধলো লড়াই, ছড়িয়ে পড়লো সুয়েজের ধারে ধারে। খবুরে-কাগুজে উত্তেজনা গরম জিলিপির মতো হাতে হাতে পাতে ফিরতে লাগল।

হাতে আমাদের ইংরেজী দৈনিক আর মুখে আমাদের কথা, যেন তপ্তখোলার খৈ। মশগুল হয়ে তর্ক করছিলুম বন্ধুর বেডে বসে। আশ-পাশে দেখব ফুরসৎ কই? হঠাৎ পাশের বেডের রোগীটি জিগ্যেস করলে, বাবুজী, কেনালের কোন্ দিকটায় লড়াই চলছে?

এতক্ষণ সমান সমান চলছিলুম। সবে বন্ধুটিকে কান্নি মেরেছি, এবার ফাঁকা পেয়ে জোর ছোটাবো তর্কের হাওয়া গাড়ি। হোঁচট খেয়ে ব্রেক কসলুম। পাশের বিছানায় চেয়ে একখানা মেজাজ আমার ফেটে সাতখান হয় আর কি! বিরক্তি চেপে বললুম, সুয়েজখালে লড়াই হচ্ছে।

বললে, সেটা তো জানি। কিন্তু স্থানটা কোথায়?

লম্বা ঢ্যাঙাপানা লোকটা। কথাবার্তায় গাইগেরামের স্পষ্ট টান। হাইকোর্ট দেখাতে চাইলে যে দেশের লোক খচে ব্যোম হয়, মালুম হল সেই দিশী। ওর বাপদাদার চৌদ্দপুরুষের কেউ কেতাবের মলাটে হাত ঠেকিয়েছে যদি তো আমার নামে কুত্তা পুষতে রাজি আছি। আর সেই লোক কিনা এমনভাবে জিগ্যেস করছে সুয়েজের কথা—'স্থানটা কোথায়'—যেন সুয়েজটা ওর বড়দির শ্বশুরবাড়ি!

আমি কিছু বলবার আগেই আমতা আমতা করে বললে, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, ঠিক আন্দাজ পাচ্ছিনে কোথায়। অথচ দেখুন, সাত সাতবার সুয়েজ পার হয়েছি।

রান্না-রসুই করেন কি? তাহলে আমার তখনকার হাল বুঝতে পারবেন। যেন কড়াইভর্তি পালংপাতা—তেলে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুবসে হল এট্‌টুস্‌খানি। আমরা পড়ালিখা লোক, আমাদের হাম্বড়াই সব সময়ে মহেন্দ্র দত্তর ছাতার মতো চিতিয়ে থাকে, বিপাকে না পড়লে বড় একটা গুটোয় না। আব্দুল হানিফের এক টিপুনিতে, গুটানো তো ভারি কাজ, ছাতা একেবারে পাকিয়ে পাকিয়ে মুড়ে ওপরে রবারের আংটা পরিয়ে দিলুম।

কৌতূহলী হলুম। একটু একটু করে ওর দিকে এগুতে লাগলুম, তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে দুজনে চা সিগারেট খেলুম। ফিরে যখন আসি তখন দেখি কোন্ অজান্তে দোস্তির দস্তানা এঁটে ফেলেছি।

আব্দুল নিজের কথাই বলছিল।

কলকাতায় এসে আর দিশেবিশে পাইনে। এযে ইমারতের অকূল দরিয়া। খোঁজ করে করে তো খিদিরপুর পৌঁছালাম। দেশ গ্রামের নানা জনা তো থাকে সেখানে। দশে মিলে চেষ্টা করলে হিল্লে একটা লেগে যাবে। কিন্তু ভরসার গিঁট আর টাইট রইল না। দিন কতকের মধ্যেই রশি হল ঢিল। আন্ধার দেখলাম চোখে। শেষকালে জানখান যখন নীলামে উঠব উঠব, আল্লার

দোয়ায় নোকরি মিলল এক হোটেলে। মশলাপেশার কাজ। খাওয়া-দাওয়া, আর বছরে এক লুঙ্গি। বিসমিল্লা, কী তকলিফ গেছে একদিন! ফুরসৎ নাই। মশলা বাটা শেষ হল তো বর্তনবাটি ধোও, সেটা যদি

শেষ করলে তো ময়দা শানতে লাগো, তো তন্দুরে আগুন লাগাও, তো দস্তরখান বিছাও, তো খানা দাও। তামাম রাতদিনে, রাতে শুধু চার ঘণ্টা ঘুম। এমন চলেছে দু বছর। এ কাম আর ভালো লাগল না। হোটেলে খানা খেতে আসত এক সারেঙ। একটা ইষ্টিম লঞ্চে মাল বয়, গুদাড়া পারও করে। তার হাতে-পায়ে ধরে কাম জোটালাম। ডাঙ্গার মানুষ সেই যে পানিতে নামলাম, আর আজ ইস্তক কামের জন্যে ডাঙ্গায় উঠি নাই। বত্রিশ সন পানিতেই কাটালাম, মাঝখানে খালি আট সন বাদ। পরথম কাম আমার টোয়েন-বয়ের, রশির নিচে লোহা বান্ধা—খাড়ির মধ্যে পানি মাপ করি। এক বাঁও মেলে না, দুইয়ে বাঁও মেলে না, তিনে বাঁও মেলে না, চারে বাঁও মেলে! তো চারের পথে লঞ্চ চলবে বে-আফৎ। তিন সন আমার লঞ্চে কাটল। না বেতন না কিচ্ছু। তখন কিন্তু আমি হাল ধরাও শিখছি। সারেঙ দুষমনি শুরু করল। রূপেয়া পয়সা একটাও দেয় না। বেতন যে মেলে তা আমি জানতাম না। আমরা পাঁচ জন ছিলাম। একদিন সারেঙ একখানা খাতা এনে বললে, টিপ ছাপ দাও।

কিসের টিপ?

সারেঙ বললে, নোকরি পোক্তের।

দিয়ে দিলাম টিপ ছাপ। সারেঙ তিনটে রূপেয়া দিলে। বেতন। সেই পরথম কামাই করলাম আমি। সারেঙকে ঠাউরালাম পীর। রহমান আমার পেয়ারের দোস্ত, লেখাপড়া জানে। সে আমার বেওকুফি খুশি দেখে হাসতে লাগল।

বললে, তোর মাইনে হয়েছে পনের রূপেয়া, তুই শালা তিন রূপেয়া পেয়েই ফূর্তিতে লাফাচ্ছিস?

কি! আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পনের রূপেয়া! শোভান্ আল্লা, সে যে অনেক! কই? আর রূপেয়া কই?

কেন, সারেঙের জেবে।

কেন সারেঙের জেবে কেন ?

এই তো দস্তুর। খালাসীর বেতন প্রথম মাসে সারেঙ ইচ্ছে করে যা দেবে তাই, দ্বিতীয় মাসে হাফ, পরের মাস থেকে সিকিভাগ কেটে নেবে সারেঙ কমিশন। তার ওপর কথা বলবার কেউ নেই। সারেঙের বিচারের আপীল হয় না। ট্যাণ্ডাইম্যাণ্ডাই করেছ কি লঞ্চ থেকে 'নিকালো শালা' বলে তাড়িয়ে দেবে। নালিশ করলে কোম্পানি তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া পুরো টাকা নিয়েছ বলে টিপ ছাপ দিয়েছ যে। খাতা কলমে আইনের ফাঁক সেরে রেখেছে সারেঙ মিঞা। এসবের উপর গাঁইগুঁই করলেই জুতির ঠোক্কর। তার চেয়ে যদি চাকরি রাখবার মোনাসিব হয় তো হজম কর জুলুম, আর 'সালাম বড়মিঞা' বলে ছিলিমে তামুক সেজে সারেঙকে এগিয়ে দাও।

যতদিন নোকরি ততদিনই সারেঙ মিঞাকে বকরি জোগালাম। লঞ্চে বাস করে সারেঙের সঙ্গে বিবাদ সাজে না। আমরা খালখাড়ি পারাপার করি। মাঝে মাঝে আশপাশ দিয়ে বড় বড় জাহাজ ভোঁপা বাজিয়ে যায় আসে। খাল নদীর জলের ঢেউ দিলে গিয়ে আথাল-পাথাল লাগায়। যদি ওই জাহাজে না ভাসলাম, যদি কালাপানি পাড়ি না দিলাম তো এ জিন্দগী বরবাদ। কাম কি আর বৃথা খাড়ির জলে টোয়েন নামিয়ে।

মনের কথা মনে রাখি, আর ছুটিছাটা মিললে খিদিরপুরে গিয়ে বড় জাহাজের সারেঙ টিণ্ডালদের খোসামোদ খিদমত করি। জাহাজে ওঠা বিষম ঝকমারি। বহু মেহন্নতের পর এক বার সুযোগ মিলল।

রেঙ্গুন যায় যে জাহাজ, তিন রোজের রাস্তা, সেই জাহাজের টোপার হতে যদি রাজি থাকো তো ছাখো, বললে সেই জাহাজের হেড টিণ্ডাল, বলে কয়ে সারেঙকে রাজি করাতে পারি।

তবে দু মাসের বেতন সারেঙকে আর এক মাসের দিতে হবে টিণ্ডালকে। সাতাশ আটাশ সন আগেকার কথা। তখন চাইন অফিস টফিসের হাঙ্গামা ছিল না। সারেঙ টিণ্ডালই ছিল পুরস্কার পয়জারের রিস্তাদার। ইচ্ছা করলে লস্করদের মাথা হাতে কাটতে পারত। এখন আর সে দিন নাই কারো। সব সরকারী অফিসের হাওলা।

দু-পাঁচ কথা ভাবলাম। টোপারের কাজ জাহাজের সব চাইতে নিচু কাজ। টোপার মানে মেথর। তবু চিন্তা ভাবনা অনেক করে হাঁ দিলাম। ছয় মাস করলাম সেই কাম। তিন মাসের বেতন ওদের দিলাম আর বাকি তিন মাসের পেলাম আমি। আল্লা জানে ঠিক ঠিক ন্যায্য টাকা পেয়েছি কি না।

আমাদের কাজে জানটা বড় কথা নয়। জান তো এগিয়েই আছে দু-কদম কবরের দিকে যেদিন মাটি ছেড়েছি। তুফান উঠল তো জান গেল, কলকব্জার ব্যাপার, তলফুটো হল তো জান গেল। জান যে যাবেই তা নয়, তবে এত যাব-যাব হয় যে সেদিকে আর নজর দেওয়া বেকার। তাই জাহাজীদের জানটা বড় নয়, মান হল সব। কেউ আমাকে ভীরু বলবে, কি কেউ বলবে আকামা, সেটা বড় শরমের।

কতবার জাহাজ বদল করলাম, কতবার ডিপাট বদল করলাম, কিন্তু

জাহাজের কাজ আর ছাড়তে পারলাম না। বত্রিশ সন সার্ভিস আমার পানিতে। মাঝে আট সন কাম করি নাই।

এতক্ষণে ফুরসৎ মিলল। জিগ্যেস করলুম, যুদ্ধের সময় কি কাজ করতেন?

আব্দুল সুখানি বললে, এখনো যা করি। এই কোয়াটার মাষ্টারের জাহাজের হাল ধরে বসে থাকি। কাপ্তান হুকুম দেয়। চার্টমতো জাহাজের মুখ ভেড়াই। লড়াইএর সময় আমি এক মানোয়ারে ছিলাম। বে অফ বেঙ্গলে টহল দিতাম। আরাকানের কাছে জাপানীরা টর্পিডো করল। জাহাজে কি যে একটা হল ওলোট পালোট বোঝাতে পারব না। যখন খেয়াল হল, দেখি জালিবোটে দরিয়ায় ভাসছি। উঠলাম আরেক মানোয়ারে। সেটাও টর্পিডো হল। একদিনেই দু-দুবার জান থাকলে তো মারাই যেতাম সেদিন। এত সব দেখেই তো মনে হয়েছে আমাদের জান নাই। লড়াই যখন থামল, তখন আমি হংকংএ। চীনামুলুকের যা দুর্দশা একটা দেখলাম কহতব্য নয়। খাবার নাই, পোষাক নাই। আমরা লুকিয়ে চুরিয়ে কাপড়-তফন নিয়ে যেতাম। দুপয়সা যা কামাই তখনই করেছি।

বিদেশের কথা বলতে বড় ভালো লাগে। দুনিয়াটা যেন বড় একখানা গাঁও, আর বেবাক দেশগুলো পাড়া। এক এক দেশ এক রকম। আমার সব চাইতে ভালো লাগে অষ্ট্রেলিয়া। এমন খাবার সুখ আর কোনো দেশে নাই। আঙ্গুরের পাউণ্ড ছয় পেনি, ছয় আনা আমাদের। আপেল ডজন এক আনা। দুধ, মাখনের আর হিসৃটিস নাই। আর দেখতে ভালো ফ্রান্স। আওরাৎ মরদ খুবই খুবসুরৎ। আর নিয়মকানুন ভালো বেলাতের। স্কটল্যাণ্ডে একবার গিয়েছিলাম। গ্লাসগোয় জাহাজ ভিড়লে আমরা দুজন ছুটি নিয়ে ঘুরতে গেলাম ভেতরে, দেশটা দেখব বেশ করে। অনেক দূরে চলে গেলাম। অনেক রাত

পর্যন্ত ফুর্তিফার্তি করলাম। ফিরবার সময় দেখি গাড়ি নাই। এখন এই বিদেশে কোথায় যাই ?

সাঙাৎ আমার বীজ ঘাঘু। বললে, আরে পরোয়া কি ? চল এই রাস্তার ধারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকি, যা করবার পুলিশে করবে।

করলাম তাই। পুলিশ এল। ওই দেশের পুলিশগুলো সুন্দর মানুষ। বিদেশী দেখলে খাতিরযত্নে অস্থির করে তোলে। আমাদের দুজনকে থানায় নিয়ে গেল।

বললাম, দূরে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছি, জাহাজে ফিরতে চাই। জাহাজ আছে গ্লাসগোয়।

শুনে সে রাত্রে আমাদের লক্-আপে রেখে দিল। সে কী চমৎকার বন্দোবস্ত। সিঙ্গিল খাট। কম্বল গদি। এক কাপ কফি, দুটুক্রো মাখন-রুটি, আর দশটা সিগারেট দিয়ে তালা আটকে চলে গেল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ঘুম ভাঙলে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। চা এল আর দুটুক্রো মাখন-রুটি, আর দশটা সিগারেট। নামপাত্তা লিখে নিয়ে গ্লাসগোর ভাড়া দিয়ে আমাদের দুজনকে গুডবাই করলে।

একবার সিড্‌নির বাইরে বেড়াতে গেছি। ঝম ঝম বৃষ্টি শুরু হল। দৌড়ে গিয়ে উঠলাম এক বাড়ির বারান্দায়। মস্ত কাচের জানালা। ভেতরে এক বুড়ো কাগজ পড়ছিল। আমাকে ইশারায় ডাকলেন। ভেতরে ঢুকতেই বললেন, বস। কোথাকার লোক তুমি ? বললাম, ইণ্ডিয়ার। বললেন, ইণ্ডিয়া তো আর নেই। এখন তো হিন্দুস্থান পাকিস্থান। খুব লড়াই হচ্ছে সেখানে। তা মামলাটা কি ? তুমি কোন্‌পিঠের—হিন্দুস্থানের না পাকিস্থানের ? মরমে মরে গেলাম। জবাব জোগাল না মুখে। কি কেচ্ছা বলুন তো !

হিন্দুস্থান পাকিস্থানের ফয়সালা পাঁচিল তুলে করতে গিয়ে জান প্রাণ নীলামে উঠল যে। বন্দর কলকাতার বেশিরভাগ সেলর

পাকিস্তানী। এমন গরিব আর কেউ নাই আমাদের মতো। ছয় মাস নয় মাস কাম তো ছয় মাস নয় মাস বেকার। আমরা নোকরির খাতিরে কলকাতায় আসি। বিবি বেটা দেশে শুকায়। এখন নোকরি জুটলেও বিবি বেটার উপাস ঘুচাবো কেমন করে? টাকা তো পাঠানো যাবে না। মনি-অর্ডার চলে না। টাকা নিয়ে দেশে যাওয়া যায় না। কি অবস্থা বলুন তো?

জিগ্যেস করলাম, ছ'মাস এক বছর বেকার, তো থাকেন কোথায়, খান কোথায়?

বললে, সে কথা শুনলে পাথরের চোখে পানি আসবে। কতকগুলো বোর্ডিং হাউস আছে। সেখানেই থাকি। একখান বিছানা পাতা যায়, এমন জায়গার ভাড়া মাসে দু' টাকা। খাওয়া? যদি মেহেরবান কোনো হোটেলওয়ালা থাকে তো বাকিতে জোগায়, পরে ডবল দাম কেটে নেয় বেতন পেলে। আর নয়ত নিজেই পাকসাক করে খাই। বেশিরভাগ সময়েই খেতে পাইনে। জাহাজে তো সে ভাবনা নাই। খানা পোশাক মিলবেই। সেখানে আমার পজিশনও আছে একটা। কিন্তু এখানে, এই ডাঙ্গায় আমি কে? পানিতে আমি সুখানি, সেখানে আমি সুখখাই। আর ডাঙ্গায় আমি শুকানি, ভুখে আর বেকারিতে শুকাই। অনেকবার ভেবেছি এ কাম ছেড়ে দেব। একবার দিয়েও ছিলাম। আট বছর আসি নাই। কিন্তু আর পারলাম না। দুনিয়ার টানে আসতেই হল ফের।

আব্দুল সুখানি চুপ করল। একটু থেমে বললে, আমরা এই ছিম্যানরা বাত্তির পোকা। পুড়ব, তবু উড়ে বাত্তিতেই পড়ব। এর আর কাটছাড় নাই।

বহু কথা শুনেছিলুম আব্দুল সুখানির কাছ থেকে। সব লিখলে মহাভারত। যা বলছি, সবটুকু ওর মুখে শোনা, আমার মাথায় তা দিয়ে

বেরুত না একটুও। আরো শোনবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে দেখি তার ছুটি হয়ে গেছে। কোথায় আছে জানিনে। ওর সন্ধানে খিদিরপুর, মোমিনপুর, তালতলা তোলপাড় করেছি। ওকে আর পাইনি। হয়ত জাহাজের স্টিয়ারিং ধরে কাপ্তানের নির্দেশে পারাপার করছে, অতলান্ত, কি প্রশান্ত মহাসাগর। হয়ত এখনো হন্যে হয়ে ঘুরছে ডক্তো-ঘাটের শিপিং অফিসে চাকরির সন্ধানে। হয়ত বা ছেলে মেয়ে বৌ-এর মধ্যে ভগ্নমনোরথ এই সুখানি অনাহারে আর ব্যাধির কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পুরোনো স্মৃতির কৌটো খুলে উপে যাওয়া সুগন্ধটুকুর ঘ্রাণ নিচ্ছে, জানিনে।

জু বাগান

এক

মেঝেতে ছক কেটে, গুটি সাজিয়ে, খেলা খেলা বাঘবন্দী নয়, সত্যিকার বন্দী বাঘকে তদ্বিরে তোয়াজে তাজা রাখা। একি চাড্ডিখানি কথা ?

আর চিড়িয়াখানায় শুধু কি এক বাঘই ? সিংহ নেই ? গণ্ডার নেই ? উল্লুক নেই ? ভাল্লুক নেই ? হাতী, উট, জিরাফ্, জেব্রা নেই ?

চিড়িয়াখানায় যদি চিড়িয়াই না থাকল, তবে আর কী দেখতে যাওয়া ? কিসের তরে কষ্ট করে চাওয়া ? রকম রকম জানোয়ার, রকম-রকম পাখী, রকমরকম সরীসৃপে যে চিড়িয়াখানার অন্দর যত গিসগিস, কুলীন কুলে সে তত নৈকুষ্যি। খেচরে ভূচরে জলচরে টাপুটুপু না হলেও কলকাতার জু নেহাৎ 'তুশ্চু'ও নয়। এশিয়ার মধ্যে তো ফার্স্ট ই, দুনিয়ার হাটেও এর 'প্রেস্‌টিজ-পজিশন' ধর্তব্যের মধ্যেই।

চিড়িয়াখানার চাইতে জু কথাটা আমার ভালো লাগে। চিড়িয়াখানা কথাটা কেমন যেন কম্যুনাল-কম্যুনাল। আমার মনে হয়, জানোয়ার-দেরও এতে বিশেষ আপত্তি। অবশ্যি ওদের মনের ইচ্ছা জানবার ফুরসৎ পাইনি। আর পশুশালা কথাটা তো কেবল কেতাবের পাতাতেই জায়গা-জমির মৌরসী করে নিয়েছে। তাছাড়া চিড়িয়াখানায় যদি জানোয়ারদের আপত্তি তো পশুশালায় চিড়িয়ারাই বা সায় দেবে কেন ? কিন্তু আমি বলি, অত কষাকষিতে কাম কি বাপু, জুলজিক্যাল গার্ডেনস নামটাই তো খাসা। অনেক বেশি খোলতাই, আর কারো গায়ে ফোস্কাও পড়বে না। অতএব নামখান যদি মুখে আটকে যায়, উচ্চারণে যদি তক্‌লিফ্ হয়, তো ছোট্টখাট্ট 'জু'টাকেই আটপৌর করে নাও।

শহর কলকাতার এই যে জু এখন আলিপুরে, যে জায়গায় জমজমাট, আগে হোথায় ছিল বস্তি। সামনেই বেলভেডিয়ারে লাটবাড়ির রোল-বোলা! আর তারই সামনে কিনা ভাঙাচোরা নোংরার ডিপো! খানকতক খোলার ঘর ট্যাম ট্যাম করছে। চেরাগের তলেই অন্ধকার! বস্তি উঠিয়ে পত্তন হল জু-এর। সে সন ১৮৭৬ সালের কথা। তার অনেক আগে থেকেই বাতচিৎ চলছিল একটা জু বানাবার। ডাঃ ফেয়ার বলে এক জেণ্টেলম্যান বস্তির কাঠখড় পোড়াতে চেষ্টা করছিলেন ১৮৬৭ সাল থেকে, কিন্তু ধোঁয়া ছাড়া তাঁর চেষ্টায় আগুন আর বেরুলো না। কাজেই তাঁর প্রচেষ্টা ধামা-চাপা পড়ল! সন ১৮৭৩-এ স্যার রিচার্ড টেম্পল এলেন বাংলার লাট বাহাদুর হয়ে। আর তাঁরই উৎসাহে আবার ধোয়ায় ফুঁ পড়ল। এবার ফুঁক দিলেন এক জর্মন—মিঃ এল শ্বেন্ড্-লার। পত্তন হল কলকাতা জু-এর। সন ১৮৭৬-এ। পঁয়তাল্লিশ একর জায়গা জুড়ে আজকের এই জু-বাগানখান। যদ্যপি সরকার বাহাদুর উৎসাহ আর রেস্ত দুই-ই জুগিয়ে এসেছেন, তথাপি জু-বাগানের খাশ খরচা জুটেছে পাবলিকের পকেট থেকে।

এত বড় নয়, তবু শহর কলকাতায় এর আগেও জু-বাগান ছিল! মল্লিকদের বাড়ি, রামমোহন রায়ের বাড়িতে। দু তিনটে বাঘ, দু-পাঁচটা পাখী নিয়ে ছোটখাটো মতোন জু তো কতই ছিল। একটু বড়সড়ও দু-একটা ছিল। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে শ্যামবাজার ছেড়ে একটু এগিয়ে গেলেই একটা রাস্তা ডানহাতি মোড় নিয়ে টক করে দমদমের দিকে ছুট মেরেছে। এই মোড়টায় এখন আছে একটা কোতোয়ালি। ১১৮ বচ্ছর আগে এইখানটায় এক বাঙালীর চিড়িয়াখানা ছিল। পোস্তার রাজা সুখময় রায়ের পূর্বপুরুষ রাজা বদ্যিনাথ রায় ছিলেন চিড়িয়াখানাটার মালিক। মোড়টার নাম এখনো চিড়িয়াখানার মোড়!

আরেকটা চিড়িয়ার মোড় আছে ব্যারাকপুরে। ওখানেও একটা জু-বাগান ছিল। সেটা ভেঙেই আলিপুরেরটা হয়েছে।

ইংলণ্ডের রাজ-ফ্যামিলিতে পুরুষরা যদ্দিন বাঁচেন, মেয়েরা তার ছাড়া। যদি যোগেযাগে মেয়েরা একবার গদিতে উঠতে পারলেন তো ব্যস্, ক্যাপটেন হাজারে নামলেন ব্যাট করতে; ধিকিস ধিকিস্ চলল খেলা, আউট হবার নামগন্ধও নেই। প্রিন্সের বারটা বাজল। সাজ-পোশাক পরে বসেই থাক, নাক ডাকাও, তোমার খেল শুরু হতে হতে দাড়ি-গোঁফ পেকে খরখরে হয়ে যাবে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে সপ্তম এডওয়ার্ডের হল এই দুর্দশা। যাট বচ্ছর রাজত্ব করে যখন চোখ দুটো বুজলেন মহারাণী, ততদিনে ছেলের চোখেও ছানি পড়ো পড়ো, ঢুলু ঢুলু হয়ে এসেছে বয়সের ভারে। মা জেঁকে বসেছেন, প্রিন্স দেখলেন, সেঞ্চুরির আগে তাঁর নট্ নড়নচড়ন নট্, কিচ্ছু, কি আর করেন, রাজ্যখানার পাড়া বেড়াতে বের হলেন। ১৮৭৬ সালের জানুয়ারির এক তারিখে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর কলকাতায় এসে হাজির। সেই উপলক্ষে সেইদিন প্রথম জু-বাগানের দরজা খুলল পাবলিকের কাছে। সে দরজা আজো খোলা, সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যের অন্ধকার পর্যন্ত।

আলিপুর জু-বাগানের মোটামুটি তিনটে ভাগ। একটা পাখীদের, একটা পশুদের, আর একটা সরীসৃপদের। আর জলের তলে যাদের বাস, তাদের ব্যবস্থা একেয়ারিয়ম কলকাতায় নেই। আগে তামাম হিন্দুস্থানেই ছিল না, তবে মাদ্রাজ বোম্বাইতে এখন হয়েছে।

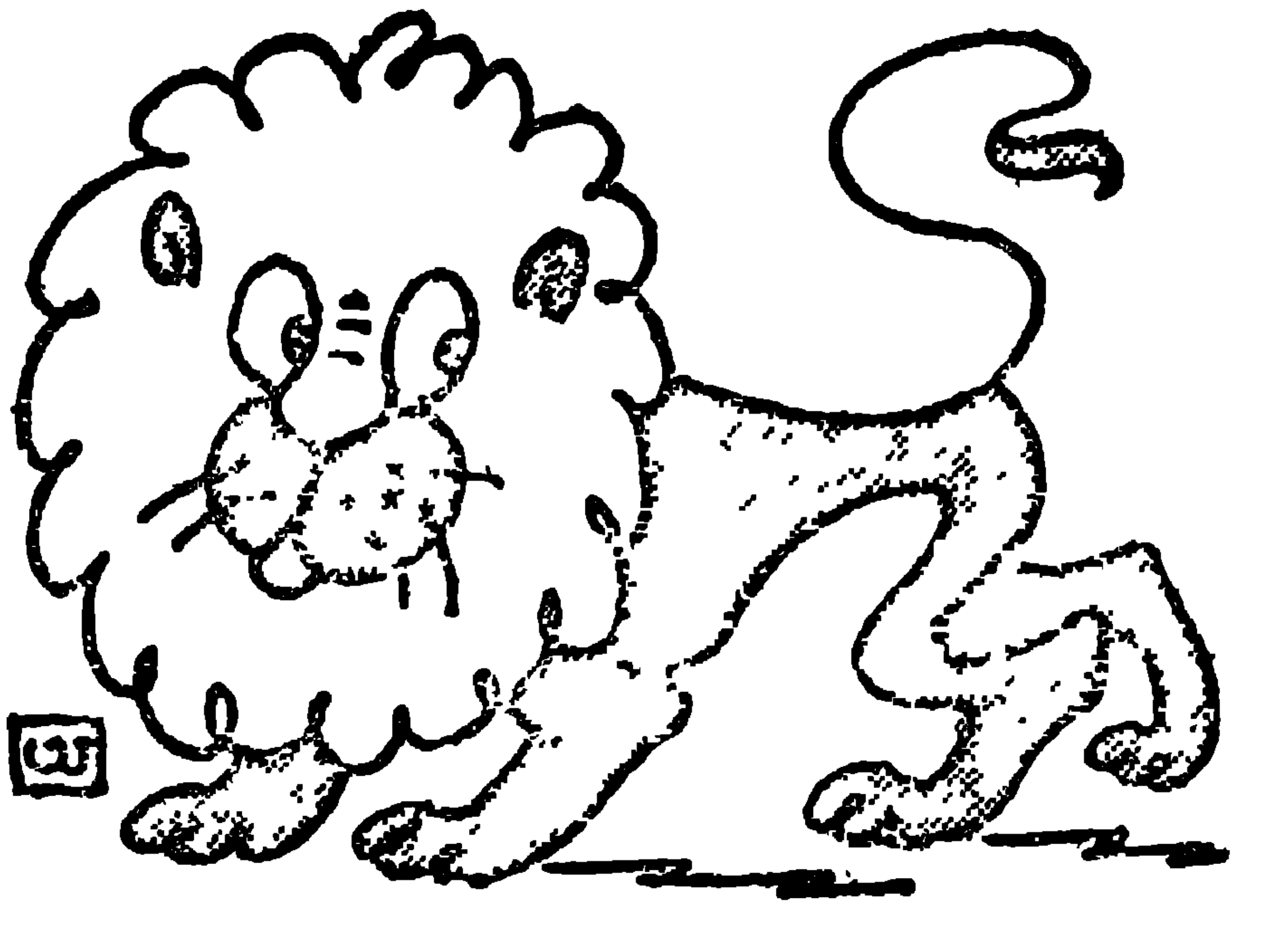

খাঁচায়-ভরা বাঘ-সিংহ দেখতে আমার ভাল লাগে না। এ যেন

দুরন্ত মেয়ে, হঠাৎ বিয়ে হয়ে দজ্জাল শাশুড়ীর কড়া গার্জেয়ানিতে প'ড়েছে। চলন-বলন শান্তশিষ্ট, গর্জনটা অবধি যেন বন্ধক দিয়ে ফেলেছে। দেখলে বড্ড মায়া হয়।

সব চাইতে শখের প্রাণ পাখীর। খাঁচায় পুরেছো তো পুরেছো, আমার ঘণ্টা করেছো, এখন ঠিকমতো আমার রসদ জোগাও। খবরদার, কোনক্রমেই যেন আমার নাচন-কোঁদন, কিচির-মিচির বন্ধ না হয় বাপু।

আমাদের আর কি? দু-আনা পয়সা দিলুম, ভেতরে ঢুকলুম, ঘণ্টাতিনেক, বড়জোর দিনমানটাই ঘোরাঘুরি করলুম জু-বাগানে। খুশি হলে তারিফ দিলুম, খারাপ লাগলে 'হাত্তোরি, এই দেখতে আসে আবার মানষে' বলে কেটে পড়লুম। কিন্তু যারা প্রতিনিয়ত হেপাজত করছে এই সব ভূচর, খেচর, জলচর, উভচরদের, তারাই বুঝছে দাঁতের যন্ত্রণায় রাত পোহাতে বাকি কত। একটা গল্প মনে পড়ল। এক ভদ্রলোক ডিম কিনছিলেন। কিছুতেই আর পছন্দ হয় না। বললেন, ডিমগুলো বড্ড ছোট হে। দোকানী জবাব দিয়েছিল, কর্তা, আপনি তো কইলেন ছুটো, কিন্তু যে পাড়ছে হে-ই বুঝছে যন্ত্রণা কেমুন। যারা নিরন্তর এই জীব-জানোয়ারদের তদ্বির-খিদমদ করছে, 'যন্ত্রণাটা কেমুন' বোঝে শুধু তারাই।

তাদের কাজের দফা হরেক, রীতি-প্রকৃতিও রকম-বেরকমের। শুধু তো ধরে এনে খাঁচায় পুরে রাখলেই হল না। তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে কড়া নজর চাই। সব চাইতে হাঙ্গামা এদের খাওয়াতে। নানারকম পশু-পক্ষী নিয়ে কারবার। নানারকম আবার তাদের জাত। কাজেই ধাত বুঝে পথ্যি জোগাতে না পারলেই সব গুবলেট্।

পাখীরা বনে থাকে, কি খায় না-খায়, সারা দিনেই বা কতটুকু খায়, তারাই জানে। আর জানেন জু-বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তাঁকে সবই জানতে হয়: যে পাখীটা আনা হল, সেটা কোন্ দেশের, সেই দেশটা

কেমন, গরম বেশি না ঠাণ্ডা বেশি, বৃষ্টি কেমন হয়, পাখীটি কি-জাতীয়, কি খায়, কেমনতরো বাসায় থাকে; কোনো পাখী শুধু পোকা-মাকড় খায়, কোনো পাখী শস্য খায়, কোনো পাখী ঘাসের দানা খায়, কোনো পাখী ফল খায়, কোনোটা বা মাংস খায়; সাপ, ছুঁচো, ইঁদুর, ব্যাঙ, ফড়িং —তুনিয়ার জীব যত, তার খাদক তত। সে সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা দরকার। অনেক পাখী আবার দুষ্প্রাপ্য। গহন বনে থাকে, কি খায় কে জানে? জানা সম্ভবও নয়। তাই সে পাখীর ভাই-বেরাদর যদি কেউ থাকে, খোঁজ নাও তাদের খাদ্য কি। সেই খাদ্য খাওয়াও এঁকে। ষোল আনা যদি না মেলাতে পার, দশ আনা মেলাও। কোন্ পাখী আবার বাচ্চাকালে পোকা-মাকড় খায়, বড় হলে নিরামিষ ধরে, সে সব সন্ধান পুরো রাখা চাই।

কাকাতুয়া কি তোতা পাখীরা খায় বাদাম, বীজ, ফল, বিভিন্ন রকমের ঘাসের দানা, মেজের দানা, সূর্যমুখী ফুলের বীজ, ওটের দানা, নানা ধরনের পাকা ফল। কিন্তু এই পাখীগুলোকে পোষ মানালে গরম তুধে রুটির কি বিস্কুটের টুকরো ভিজিয়ে দিলে দিব্যি খেয়ে নেয়।

পায়রা-জাতীয় পাখীদের পুষতে কোনো হাঙ্গামা নেই। ঘুঘু কথাটা শুনতে সুবিধের নয়, কিন্তু এরাই যন্ত্রণা কম দেয়। আহারে-বিহারে একেবারে সুবোধ বালক গোপাল। যাহা পায়, প্রায় তাহাই খায়।

আবার একজাতীয় পাখী আছে, যারা কখনো পোকা-মাকড়, কখনো বা ফল-ফুলুরি—যখন যা প্রচুর পায়, খায়। কাজেই যিনি এদের তদ্বির -তদারক করেন, এসব বিষয়ে যাবতীয় খবরাখবর তাঁকে বুড়ো আঙুলের নখে নিয়ে বসতে হয়।

জু-বাগানে পাখীদের সাধারণত দিনে তুবার খেতে দেওয়া হয়। জামাইকে আর কী আদর করা হয়! পাখীকে জামাই-আদরে রাখা হয়েছে শুনলে পাখীরা ফায়ার হয়ে উঠবে। কিন্তু জামাইকে পাখীর

আদরে রাখলে জামাই যে দুনো খুশি হবে, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

খাবার জোগাবার বেলাতেই যে শুধু এত যত্ন তা নয়, সব ব্যাপারেই

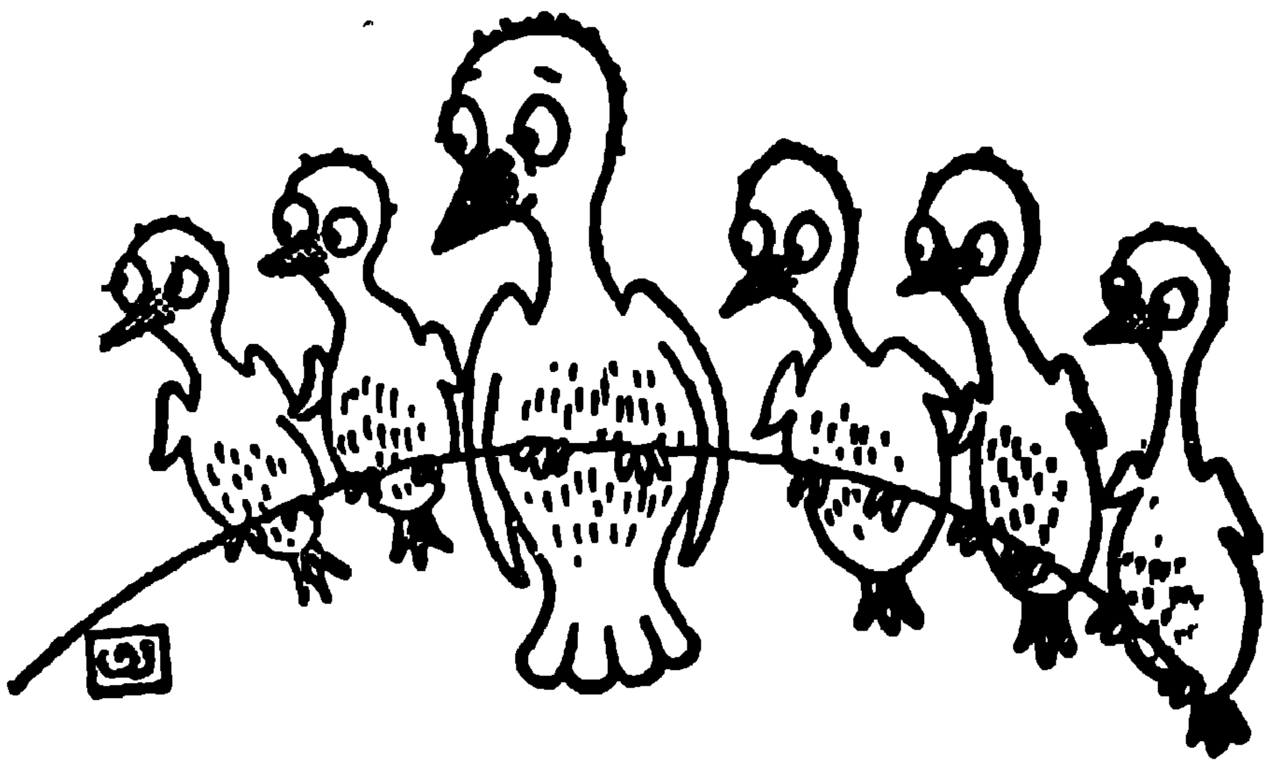

এই রকম। পাখীর থাকবার জায়গাটিও অশেষ যত্ন নিয়ে বানাতে হয়। অনেকখানি জায়-গাকে লোহার খুঁটি আর মজবুত তারের জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। নয়ত ফাঁক পেলেই পঁয়-যট্টটি যে মারবে না এমন গ্যারান্টি কে দেবে। প্রত্যেকটা ঘেরের মধ্যে একটা করে ছাদ-আঁটা ঘরের মতো থাকে। ঝড়-বৃষ্টি-বাদল, কি শীতাতপ থেকে জান বাঁচাতে গেলে ঢোকো ওর মধ্যে।

এই চিড়িয়াখানায় বহু পাখী ডিম পাড়ে। বহু বাচ্চা হয়। এমনি করেই জু-বাগানের পরিবার বৃদ্ধিচক্র গড়তে থাকে। ডিম পাড়বার প্রকার-পদ্ধতিও বেড়ে মজাদার। এই সব সামলাতেও তত্ত্বাবধায়ক মশায়ের প্রাণটি ঠোঁটের ডগে এসে পড়ে। পাখীর বাসা বাঁধবার সুযোগ করে না দিলে তারা বহাল তবিয়তে থাকতে চাইবে কেন? রকম রকম বাসা বানাতে হিমসিম খেয়ে যায় ছুতোরের পো। যেমন-তেমন বাসা বাঁধলে তো চলবে না। যেমন বাসাটি এরা বনে থাকলে বানাতো, অবিকল তেমনটি হওয়া চাই। খড়, কুটো, পালক, খাঁচার মধ্যে সাপ্লাই দিলে অনেকে নিজের বাসা নিজেই গড়ে। অনেকে আবার গুড্ ফর নাথিং। যেমন তোতারা। খাবার বেলায় আঁটিশুটি, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। নিজের বাসাটুকু, তাও বানিয়ে নিতে পারে না। যতদিন বাইরে থাকেন স্বাধীনভাবে, ততদিন ডিম পেড়ে আসেন পাহাড়ের খাঁজে। তার জন্যে তো আর আস্ত পাহাড় একটা জু-বাগানে

উপড়ে আনা যায় না। কাজেই অন্য ব্যবস্থা করতে হয়। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, যাতে ডিম পাড়বার সময়ে তোতা পাহাড় না হোক পাহাড়ের আস্বাদটা অন্তত পায়। কাঠঠোকরা, ঠকর ঠকর না করলে তার ঠোঁট শুলুনি বন্ধ হয় না। অতএব তার জন্যে গাছের গুঁড়ি চাই। ছাতের আড়াল না পেলে যে পাখীর ঘুম হয় না, সে-পাখীর জন্যে আড়াল চাই। পেলিকান, হাঁস, রাজহাঁসদের জল না হলে প্রাণ যায় প্রাণ যায়, অতএব তাদের জন্যে খাল কেটে জলের বন্দোবস্ত।

এ তো গেল পোষ-মানা পাখীদের কথা, যাদের বারো মাস বন্দী করে রাখতে হয়। এরা ছাড়া আর একদল আগন্তুক পাখী আছে। তাদের অবিশ্যি সব সময় দেখা যায় না। শীতকালে এঁরা এসে জোটেন জু-বাগানের ঝিলে। তখন সেখানে পাখীতে পাখীতে ভরে যায়। মেলা-মচ্ছব বসে যায় একটা। কোথায় সেই হিন্দুকুশ পর্বতের পারের দেশ, কোথায় বা সাইবেরিয়া, সেখানে হি-হি শীতের আক্রমণে টিঁকতে পারে না এই পাখীর দল। শীতের শুরু হতে না হতেই ঝাঁক বেঁধে রওনা দেয় গরম দেশের দিকে। একটি দল এসে হাজির হয় জু-বাগানের ঝিলে। কতদিন ধরে যে আসছে, কে বলবে। একটি দলই বার-বার আসে কি না, পরখ করবার জন্যে একবার কতকগুলো পাখী ধরে তাদের পায়ে আংটা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। পরের বছর দেখা গেল, আংটাদার পাখীগুলো ঠিক এসে হাজির হয়েছে। শুধু যে কলকাতাতেই আসে তা নয়, এই যাযাবর পাখীরা নানা দেশে গিয়ে হাজির হয়।

গল্প-কথা নয়। একটা দেশের পার্লামেন্টে এই নিয়ে তুমুল তর্ক বেধে গেছে। বিরোধী দল জোর সওয়াল তুলেছেন ঃ সাইবেরিয়ার পাখী আর চীনা মুলুকের পাখী যেন খবরদার তাঁদের দেশে না ঢোকে। ও দুটো কম্যুনিষ্ট দেশ। সরকার পক্ষ বলেছেন, তাতে কি। ওদেশের

নীতির সঙ্গে মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু ওদেশের পাখীর সঙ্গে আমাদের কি দুষমনি? বিরোধী পক্ষ তাই শুনে তুমুল সোরগোল তুলেছেন। এই রকম ম্যাদামারা সরকার বলেই না দেশের আজ এই অবস্থা। এত হেনস্থা আমাদের। কে জানে, সরকারের সঙ্গে হয়ত কম্যুনিষ্টদের যোগাযোগ আছে কিছু। তাঁরা জিগীর তুললেন, পাখী আসা বন্ধ করো। শীতকালের শুরুতে হাড়-ডিগডিগে পাখীগুলো পেটে এক রাজ্যের খিদে নিয়ে আমাদের দেশে ঢুকবে, তারপর ভালোমন্দ আচ্ছা করে চর্ব্যচূষ্য সাঁটিয়ে চর্বি চকচক নিজের দেশে পাড়ি মারুক, আর কম্যুনিষ্টরা সেগুলো ধরে ধরে খেয়ে কোঁদল-কাঁদল হয়ে আমাদেরই ঝাড়ের বাঁশ কাটুক।

যাহোক, যাযাবর পাখীর জিম্মাদার কেউ নয়। খুশিমতো আসে, খুশিমতো যায়। কিন্তু পোষা পাখীগুলোর বেলায় যেন পান থেকে চূণ না খসে। দুটো পাখী মারা গেছে? কেন? শীগ্রি ডাক্তারবাবুকে খবর দাও। পোষ্ট মর্টেম করুন, দেখুন, কেন মারা গেল হঠাৎ। বুড়ো হয়েছিল। স্বাভাবিক মৃত্যু। যাক। না কি মড়ক লাগল? সর্বনাশ! দেখুন দেখুন। রোগী পাখী আলাদা করে রাখো। হাসপাতালে নিয়ে যাও। সবাইকে মড়ক প্রতিরোধক ইঞ্জেকসন দাও। ঘর পরিষ্কার রাখো। বাইরের কেউ যেন ভেতরে না ঢোকে সর্দার, লক্ষ্য রেখো।

জু-বাগানের মধ্যেই ডাক্তারখানা। সকলেরই দিনরাতের ডিউটি। শনিবার রবিবার নেই। খিদমদ্গারেরা নিজের ছেলেমেয়েকেও এত যত্ন করে কিনা সন্দেহ।

শুধু পাখীর বেলায় নয়। জন্তুজানোয়ারদের বেলাতেও এই একই রকম হুঁশিয়ারি। জানোয়ার হিসেবে থাকবার জায়গার তারতম্য হয়। বড় বড় ইটের দেওয়াল দেওয়া আর মোটা শক্ত লোহার রডের খাঁচায় থাকেন বাঘ, সিংহ, হায়না, ভাল্লুক—যত হিংস্র আর মাংসভোজীর দল।

ভাল্লুক মাংস খায় না। ভাত খায়, আর গুড়। পাখীদের খাওয়া দিনে দুবার। পশুদের দিনে একবার, হস্তীর একদিন ফাঁক, আর সরীসৃপদের হপ্তায় একদিন খেতে দেয়। প্রতিদিন ভোর হতে না হতেই খাঁচা পরিষ্কার, জল বদলানো শুরু হয়। কি পখী, কি পশু, কি সরীসৃপ, জু-বাগানের বাসিন্দাদের জলের কোনো কষ্ট নেই। প্রত্যেকের মুখের কাছেই পাইপ দিয়ে জল আসে। বড় বড় বাঘ-সিংহকে সের-পনের মাংস দেওয়া হয়। ছোটদের সের-পাঁচেক।

তৃণভোজীনের মধ্যে সবচেয়ে মাইডিয়ার হাতী। কাঁধে চড়ো, পিঠে চড়ো, রা-টি নেই। জিরাফ বেচারার বেশ মুশকিল। আঁকশি-পানা গলাটাকে দিয়ে যে একটু কাজ করে নেবে তার উপায় কোথায়। কাছা-কাছি পছন্দসই এমন গাছ নেই যার মগডাল থেকে এক খাবলা কচি পাতা মুখে পুরে সোয়াদটা ঝালিয়ে নেবে। কি আর করে, তাই থেকে থেকে গলাটা বাড়িয়ে চাঁদ-সূর্যিকে এক ঢুঁ দিতে মন চায়।

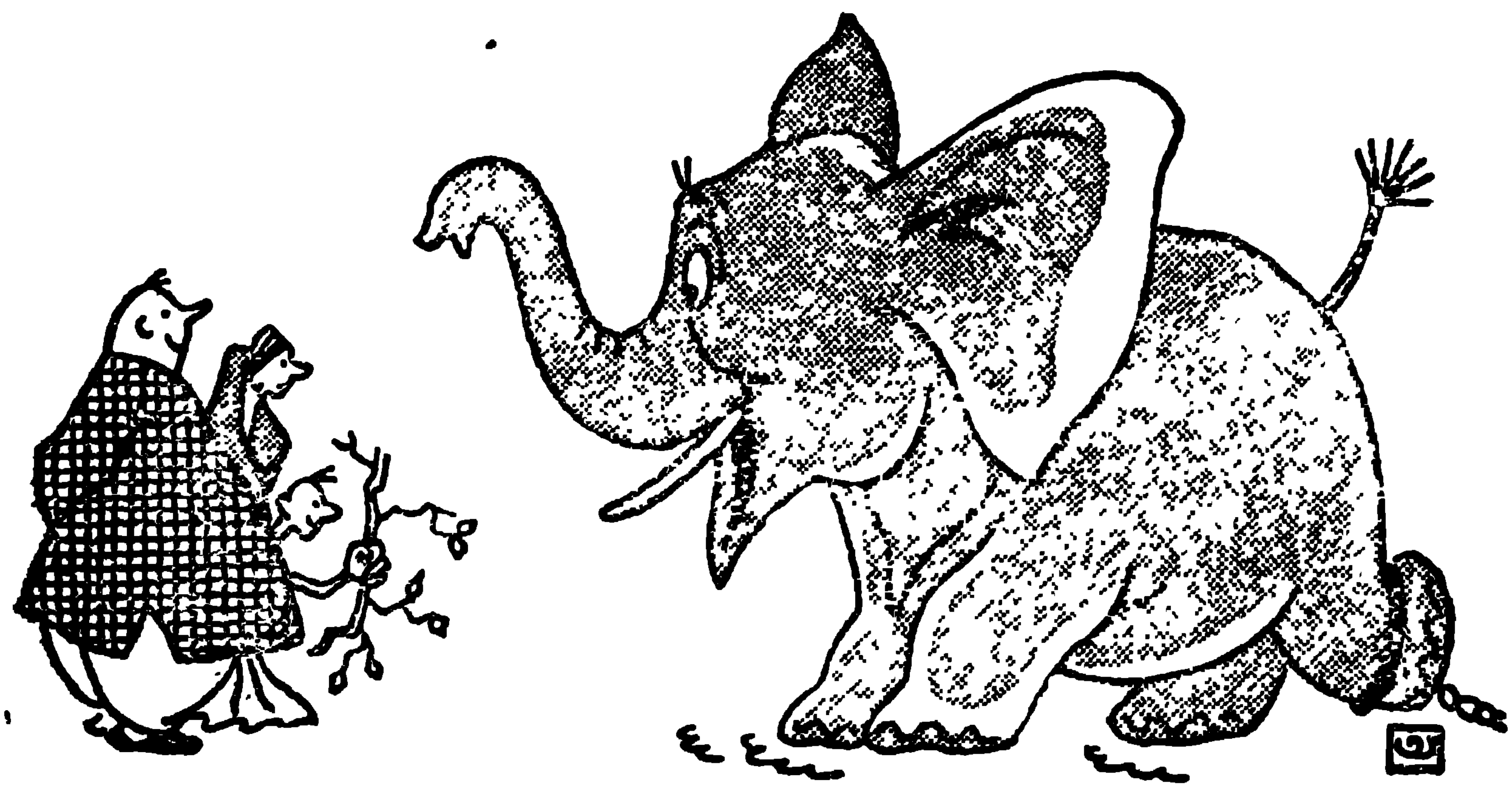

দুই গুলিখোর জু-বাগানে ঘুরছে। জিরাফ দেখে একজন শুধোলো, জিরাফের গলাটা অত লম্বা কেন? বন্ধুটি জবাব দিলে, বুদ্ধু কাঁহেকা,

এই বাংলা কথাটা বুঝলিনে। দেখছিসনে ধড় থেকে মাথাটা কত দূরে। ওই মাথার নাগাল পাবার জন্যে গলাটা লম্বা হয়েছে।

পশুপক্ষী তবু যাহোক ভালোই আছে একরকম জু-বাগানে। গত বছর জাপান থেকে একজোড়া স্যালামাণ্ডার এসেছিল। মারা গেছে। শীতের জীব গরম দেশে টেঁকানো শক্ত। আলাদা ঘর তৈরি করে, বরফের চাঙড় জমিয়ে, খসখস দিয়ে ঘিরে হাজারো চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না। এবারে আমেরিকা থেকে এসেছে দুটো পুমা আর উট-জাতীয় লামা। জু-সংসার একরকম ভরভরন্ত বটে, কিন্তু সব চাইতে কাহিল হচ্ছে রেপটাইল হাউস—অর্থাৎ সরীসৃপ-ভবন। যুদ্ধের আগে কেমন জমজমাট ছিল—আর এখন? যেন ছেড়ে আসা গ্রাম। ঘরগুলো খাঁ খাঁ। গোটা দুই ময়াল, গোটা কয়েক গোখরো আর কেউটে, দাঁড়াশ আর লাউডগা, বালি-সাপ আর বোড়া। আর চৌবাচ্চায় ট্যাম ট্যাম করছে এক কুমীর।

যুদ্ধের সময় জু-বাগানের আর কিছু ছিল না। সব সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। যাকে-তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল জন্তু-জানোয়ার। পাছে জাপানী হামলা হয়, পাছে বোম পড়ে চিড়িয়াখানায় তাই এই ব্যবস্থা। মিলিটারীর তাঁবু হয়েছিল ভিতরে। সব ভেঙেচুরে তচনচ। যুদ্ধের পর জু-বাগানের উন্নতি হয়েছে অসাধারণ। দেখে তাজ্জব হয়ে গেছি। এখন তো আর সেই ন্যাড়া খাড়া মাঠ নেই। মরশুমী ফুলে আলো হয়ে আছে ভেতরটা। যাঁর কৃতিত্বে এই জু-বাগানের থ্যাঁতলানো মুখে হাসি ফুটেছে তিনি এখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লাহিড়ী।

এই যাঃ, এত কথা বললুম, অথচ হিপোর কথাটাই বাদ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ওঃ, জন্তু তো নয়, একখানা যন্তর। যেতো জাইগাণ্টিক, তেত্তো বদসুরৎ। উট সম্পর্কে এক গল্প শুনেছিলুম। বিধাতা জন্তু জানোয়ার সব আপন খেয়ালে বানাবার পর হাঁফ জিরিয়ে নিচ্ছেন।

দেখলেন সামনে দিয়ে উট যাচ্ছে। ওই বদখৎ চেহারা দেখে বিধাতার মনে দয়া হল। ডাক দিয়ে বললেন, ওহে উট, এদিকে এস, তোমার গড়ন-পিটন একটু শুধরে দিই। উট দার্শনিক উত্তর একখানা ঝেড়ে দিলে, মালিক, যব্‌ বন্‌ চুকা হ্যায় তব ঠিক হ্যায়। তা ঠিক তো বটেই। হিপোর পাশে উট তো কার্তিকটির পো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম। এমন সময় হিপো ছোট্ট একটু হাই তুললে। ব্বাপ্‌স্‌, কি হাঁ! যেন বিশ্বরূপ দেখিয়ে ছাড়লে।

তাহলে একটা শোনা গল্প বলি। ভদ্রলোক বলছিলেনঃ দেশে একবার কুমীরের উৎপাত হল। সে কুমীর নয় তো, যেন দুশো-মণি একখানা ভাওলা নৌকো। উৎপাতে দেশে গাঁয়ে টেঁকা হল অসম্ভব। এর গরু খায়, ওর জরু খায়। কুমীরের অত্যাচারে দেশ ফাঁকা হয়ে গেল। পূজোর সময় কলকাতা থেকে যাচ্ছিলেন এক ভদ্রলোক। সঙ্গে স্ত্রী। একনৌকো জিনিস। আর বৌ-এর গা-ভর্তি গহনা। লেজের ঝাপটায় নৌকো উলটিয়ে বৌটিকে কুমীর গহনাসমেত টপাস করে মুখে পুরে দিলে। তখন আমার টনক নড়ল। কুমীর আর যা করুক সোনা হজম করতে পারবে না। আমি এবার কুমীরটি মারলেই বেবাক সোনাটি আমার। চললুম কলকাতা। জাহাজ-বাঁধা কাছি আর একটা নোঙর কিনে গ্রামে ফিরলুম দুদিন পরে। বাড়িতে পা দিয়েই শুনি, এক সাঁওতাল মেয়ে বেগুন বেচতে ঝুড়ি মাথায় হাটে যাচ্ছিল, কুমীর ঝুড়ি সুদ্ধ তাকে গিলে খেয়েছে। আর দেরি করলুম না। কাছিতে নোঙর বেঁধে আর নোঙরে এক বড় ছাগল গেঁথে নদীতে ফেলে দিলুম, আর শ' আড়াই লোক কাছি ধরে বসে রইলুম। যাঁহাতক ছাগল গেলা, আর আমরা কাছিতে দিলুম টান। টেনে কুমীরকে তো ডাঙায় তুললুম। করাতী ডেকে কুমীর চেরা হল। পেটটা দুফাঁক করে দেখি, কি আশ্চর্য কাণ্ড! সাঁওতাল মাগীটা গহনাগুলো পরে বসে বসে বেগুন বেচছে! ভদ্রলোক

খুব জমিয়ে নিয়েছিলেন। সবাই থ মেরে গেছে। একজন অবিশ্বাসী সেখানে উপস্থিত ছিল। বললে, বাপধন, গুল মারবার আর জায়গা পাওনি? মাগীটা কুমীরের পেটে বেগুন বেচছিল! কুমীরের পেটে সে খদ্দের পেলে কোথায়? ভদ্রলোক বললেন, আরে ওই দেখেই তো আমার চক্ষু চড়কগাছে। খদ্দের দেখবার ফুরসৎ পেলাম কোথায়?

ভদ্রলোক কুমীরই দেখেছিলেন, হিপো দেখেননি। তাহলে আর প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতেন না। খদ্দের তো খদ্দের, হিপো হাঁ করলে তামাম নিউ মার্কেটটা ঢুকেও এক বিঘৎ জায়গা থাকে। বিশ্বাস না হয়, একদিন জু-বাগানে গিয়ে হিপোকে হাসিয়ে দেখবেন।

ঃ দুই ঃ

কলকাতার দেহে ক'দিন ধরে চড়া জ্বর চাগাল দিয়েছে। তাপ চড়েছে তড়াক করে একশ পাঁচে। ঘরে থাকলে শরীর জ্বালা, বাইরে গেলে পালা-পালা। ভাবলুম, কি আর করা, যাই জু-বাগানে। বন্ধু বললেন, তোমার পুলকের পায়রা আর মক্ মক্ করবার সময় পেলে না হে? তেড়িয়া গরমে যখন পিতৃনাম জপ করছি, দুনিয়া ভেজে ঝাঁঝরঝাঁই, তখন তুমি কিনা হটর হটর জু-বাগান যাচ্ছ! বেটক্করে রোদ্দুর লাগলে ফকাঁসটি যে ঢিলে হয়ে যাবে।

কিন্তু আমার মন না মতি। ইচ্ছের পালে বাতাসটি লাগতে যা দেরি, দেহতরী তরতরিয়ে গন্তব্যের ঘাট পানে ছোটে।

দুটি আনা পেন্নামী দিয়ে ঘোরন-দরজার পাক এড়িয়ে জু-বাগানে ঢুকলুম। তারপর বাঘ-সিঙ্গির ধার মাড়ালুম না, পাখী পখ্খুলি, সাপ ব্যাঙ, হিপো হস্তীর বস্তিপানে পা মাড়ালুম না, সটান গিয়ে হাজির

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে। একবার ভাবলুম, একে ভদ্রলোক সরকারী অফিসার, তায় বাঙালী, আমল পাওয়া দুষ্কর .হবে। দু'কথা কইবার আগেই না তাঁর মেজাজ আবার ফটাস্ ফটাস্ চাঁট ছুড়তে শুরু করে! যদি বলে বসেন, চিড়িয়াখানা দেখতে এসেছেন, তা এখানে কেন—চালাকি করবার জায়গা পাননি? ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাব কি যাব না মনে মনে এই ভ্যাস্তারা ভাঁজলুম কিছুক্ষণ, তারপর সঙ্কোচকে ট্যাঁকে গুঁজে টক করে ভেতরে ঢুকে পড়লুম।

ভদ্রলোকের সামনে ফাইলে ফাইলে গাজনের মেলা, কানে মুখে ফোন, আর চোখে 'কে মশায় আপনি।' মুখের ফুরসৎ নেই—ফোন, হাতের জিরেন নেই—সই, ঘাড়টাকে কাজে লাগালেন। নাড়িয়ে ইশারা করলেন, 'বস্তাজ্ঞা হোক।' বসলুম। বসেই রইলুম আধ ঘণ্টাটাক। ভদ্রলোকের আর কসুর কি? মিনিট দশেক গজর গজর করে আসাম সরকারের ট্রেড্ কমিশনার ফোনটি ওদিকে রাখলেন তো অমনি ক্রিং। কে? না, জাপানী জাহাজ আকামাশিমারুর কাপ্তান হুকোকিকরিয়ার টেনেজাকসে। কি বিত্তান্ত? আর বলেন কেন! কাল দশটায় কন্‌ফারেন্স বসবে, তার নেমন্তন্ন। কিয়োটোর জু-বাগানে একটা হাতীর বাচ্চা যাবে। আসাম থেকে বাচ্চা এসে পড়ে আছে আলিপুরের জু-বাগানে। এবারে এটা চালান দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। জাহাজও পাওয়া গেছে। আকামাশিমারু। কাপ্তানও রাজি। সবই ঠিকঠাক, মাঝখান থেকে বাগড়া দিলেন জাপান সরকারের এজেণ্ট। বললেন, হাতী যাক, কিন্তু মাহুত যাবার বন্দোবস্ত করা যাবে না। একটা লোককে এখান থেকে পাঠানো মানেই তার যাতায়াতের রাহাখরচ, খাইখরচ, এদ্দিনের বেতন—বিস্তর টাকার মামলা। কিয়োটো জু ছোট্ট, খর্চার চাকায় দেবার মতো এত তেল তার জুটবে না। কাজেই মাহুত ছাড়াই হাতী পাঠানো হোক। তা কি করে হয়? একটা জ্যান্ত জিনিস এভাবে গার্জেয়ান ছাড়া এতদিনের রাস্তা

ছেড়ে দেওয়া যায় কি প্রকারে? খেলা খেলা নয়, খোদাতালার কল-কব্জার ব্যাপার মশাই। শেষে একটা কিছু উনিশ-বিশ হয়ে জানটি পুট্স করে পাংচার হয়ে যাক। সে জিম্মা কে নেবেন, আপনি? হাতীকে খেদায় ভরে বন্দী করা আর খেদমত করে তাজা রাখা সমান কষ্ট। তাছাড়া একেবারে অন্‌খা জায়গায় যাচ্ছে, তাকে ধীরে সুস্থে বশে আনতে হবে তো, অভিজ্ঞ মাহুত না হলে কে করবে সে সব? কাপ্তান যদি এ সব ঝক্কি নিতে পারে তো ভালো, ল্যাঠা চুকে গেল। তাই তো কন্‌ফারেন্স চাই। কাল সকালে জাহাজে আসবেন দশটা নাগাট।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লোকটি কাজের, আর বেশ আলাপী। আর তাঁর কাজেরও মাপ পরিমাপ নেই।

বললেন, কাজের বহরটি একবার দেখছেন তো। চাপের চোটে দেহের বাটাম ফাট ফাট। শরীরের নাম মহাশয় তাই চলে যাচ্ছে, মেশিন হলে মাসে একবার গ্যারাজ পাঠাতে হত। সেই ভোর পাঁচটায় কাজ শুরু হয় আর শেষ হতে হতে অন্ধকার। বাইরের কাজ, ভেতরের কাজ। বসুন না একটু, দেখবেন'খন।

বসে ছিলেন দু'জন ইট-সুর্কির কারবারী। শুরু হল তাদের সঙ্গে দর-কষাকষি।

মশাই, এটা পাবলিক প্রতিষ্ঠান, সাধারণের জিনিস, শখের বস্তু। দরে অমন গিঁঠ দিয়ে বসে থাকলে কি চলে? আলগা করুন কিছু। একটাকা কমলে একটাকাই কমল। সকলের স্নেহযত্ন না থাকলে কি এ বস্তু টেঁকানো যায়? কি বলব মশাই দেশের লোকের কথা, ঘুরে-টুরে বেড়ান—নিজ চক্ষেই প্রমাণ পাবেন, সুন্দর করে কোনো কিছু রাখবার উপায় আছে? এই যে দেখচেন ফুলবাগান গড়ে উঠেছে, মুহূর্তে অসাবধান হই, ছিঁড়ে-খুঁড়ে ছত্রাখান হয়ে যাবে। অথচ এই করতে কত খর্চা হয় বলুন দিকিনি। এদিকে ওদিকে নজর দেব তার উপায় কি?

ঠিক এমনি কথা শুনেছিলুম এক দারোয়ানের মুখে।

বললে, বলব কি বাবু, আমার বয়েসটা তো আর কম হল না, কিন্তু সেদিন যা দেখলাম, এত বচ্ছর বয়সে তা দেখা তো দূরের কথা, ভাবনা পর্যন্ত করিনি। ফুল দিয়ে অম্বল রাঁধতে শুনেচেন কখনো? গ্রাম থেকে এসেচে, ব্যাটাছেলে মেয়েছেলেতে নয় দশটা, সারাদিন ঘুরলো-ঘারলো, দুপুর বেলা ফিস্টিউস্টি করচে—আরে বাপ, দেখি কি, কোত্থেকে ফুল ছিঁড়েচে একগাদা। হেই হেই করে উঠলাম। তা বললে, তা এইচি তোমাদের থানে সেই এতদূর থিকে। বাজার হাট আর কুথায় পাব ধন, তাই দুটো ফুল তুলিচি, একটু অম্বল রাঁধব।

শতেকখানেক পার্মানেণ্ট স্টাফ আছে জু-বাগানে। আর কিছু টেম্পোরারী হ্যাণ্ড। সক্কলের ওপরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। বাবারও যেমন বাবা থাকে, তেমনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর আছেন এক পরিচালনা-কমিটি। বাগানখানার দিকে তাঁর যত্ন খুব। তেমনি তাঁর অধীনের লোকগুলোর। সারাদিনমান কাজ হচ্ছে। ভোর পাঁচটা থেকে ঝাড়পোঁছ, আটটা নাগাদ খাওয়ানো। সাড়ে দশটায় হাজরে দিয়ে ঘরে ফেরো। এসো আবার ঠিক আড়াইটেয়। তিনটে নাগাত মাংসাশীদের খাবার দান। তারপর ছুটকো-ছাটকা কাজ পাঁচটা অবধি। তারপর, হাজরে লিখিয়ে কোয়াটারে গিয়ে ঢোকো। রাত্রে যাদের পাহারা ডিউটি, তাদের ভোর পর্যন্ত থাকতে হয়। মজুরদের জিম্মাদার হচ্ছে কয়েকজন সর্দার। কাজকামের অন্ধিসন্ধি তারাই জানে, আর বেবাকটি তো চক্ষু থাকতেও কানা। যে দিকে চালাবে, তারা সেইদিকেই যাবে।

এ কাজ কি ভালো লাগে? জিগ্যেস করেছিলুম একজনকে। লাগবে না কেন? আজ সাতাশ বচ্ছর এ কাজ করছি। আগে তো আরো কষ্ট ছিল। মাইনে কম, খাটুনি বেশি, ছুটিছাটার নামগন্ধও ছিল না। জীবনভর চাকুরি করে ছুটি নেবার সময় যা দু-এক মাসের বেতন

বকশিশ পেতাম। এখন তো ভালো। একমাস ছুটি পাই আমরা। মাইনে-ভি বেড়েছে। সুপ্রিণ্টেণ্ট বাবু লোক ভালো আছেন। হপ্তায় একদিন ছুটির জন্য চেষ্টা করছি এখন।

কথাবার্তা কইছি, এমন সময় চিল্লাচিল্লা। একজনকে ধরে এক সর্দার আচ্ছা করে কড়কাচ্ছে।

তোমাকে না বলিছি, বাঘের কলটার মুখ বসাতে, তা করেছ? কি, মুখ নেই? ইস্টোরে গেইছিলে? নেই কলের মুখ? ইস্টোরবাবু এই কথা বল্লেন? ইস্টোরবাবুর কাছে যাওইনি, তো খোঁজটা দিলে কে? ও কী জানে যে ওর কাছে গিয়েছ। তুমার বউএর ক'টা ছেলে তার খবর কি ইস্টিশান মাস্টার রাখবে হে? খালি ফাঁকিবাজি। সকাল থেকে এ পর্যন্ত মাত্র দুটো কলে কাজ করেছ? বলি এটা কাজের জায়গা, না তোমার শ্বশুরবাড়ি? এই তো সেদিন জরিমানা দিলে, আক্কেলের ডিম তাতেও ফুটলো না। যাও, কাজ কর গিয়ে। ফের যদি ঘুমুতে দেখি তো বড়বাবুকে রিপোর্ট করে দেব।

লোকটির কাঁচুমাচু মুখ দেখে খুব কষ্ট হল। এক ফাঁকে গিয়ে আলাপ করলুম। বাড়ি ওর মেদিনীপুর।

বললুম, কাজ-কামে ফাঁকি দাও কেন? দেখ তো খামকা গালমন্দ খেলে। বোধহয় আমার কথায় লজ্জা পেল।

বললে, আর কখনো হবে না বাবু, দেখে নিও।

বেশিক্ষণ নয়, আধঘণ্টার মধ্যেই পেয়ে গেলাম ওকে। গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে ঘুমের কোলে ঢুলু ঢুলু। মুখে আনকোরা তৃপ্তি। একটু আগেই যে এমন একখানা গাল খেল তা কে বলবে ওকে দেখে। বরং মনে হল ও যেন ঘুমপাড়ানী ছড়া শুনছিল এতক্ষণ।

আলাপ হল ঘুরতে ঘুরতেই। যে ছোক্‌রা বাঘের খাঁচা পরিষ্কার করে, খাবার খাওয়ায়।

জিগ্যেস করলুম, খাঁচায় যে ঢোকো, ডর লাগে না ?

ছোকরার মুখে-চোখে কথা। বললে, আল্লায় জান দিছে, হেফাজৎ করবে হে-ই। আমার এত কিয়ের চিন্তা। ভয় করত পরথম পরথম। যে সে জানোয়ার নয়, খোদ টাইগার। শিকের মধ্যে আছে তাই কি ? মন কি বুঝ মানে। টাইগার এক হাঁকাড় মারে আর জান একেবারে হাওয়ার সাথে মিশাল খায়। তারপর ক্রমে ক্রমে ডর ভাঙল। তবে সব সময় হুঁশিয়ার থাকি। হুঁশিয়ারির কমতি হলেই বিপদ। একদিন তো ধরছিল একটারে খাঁচার ভিতরে। আল্লার মতলব নাই জান নিবার, তাই বাঁচি গিছে। দোষ ছিল তার। আমি উপরে উঠছি, দরজার চাবি ঘুরামু, আর হে আছে নিচাৎ। হে ইশারা দিলে আমি দরজার চাবি ঘুরাই। একখানা ঘর সাফা করি বেওকুফটা এদিক হেদিক দেখে নাই ভাল করি, ইশারা দিছে তুশরা দরজা খুলবার। আমিও দরজা খুলছি আর ঝাপাইয়া ধরছে হেরে। হে তো এক চিক্কির। প্যান্থারটা আছিল নূতন। ভয় পাইয়া দিছে এক দৌড়। আমি তো ভাবি এই মৌকা। দিছি দরজা ফালাইয়া।' হাসপাতালে আছিল দিন কতক, আবার কামে লাগছে।

খোশগল্পের অনেক মজা। খুটখাট অনেক বিষয় জানা যায়। জু-বাগানে বাঘের বাচ্চা তবুও বাঁচানো গেছে কিন্তু সিংহের বাচ্চা সম্ভব হয়নি। একে তো ওরা বাচ্চা দেয়ই না। যদিও বা কালেভদ্রে হল তো সঙ্গে সঙ্গে বের করে না আনতে পারলে ওরাই বাচ্চাটুকু গলায় ফেলে দু'গেলাস জল গিলে পিত্তি রক্ষা করে। কলকাতায় জু-বাগানে সিংহের বাচ্চা আজ পর্যন্তও রাখা যায়নি।

একবার এক আজব জানোয়ারের কথা পড়েছিলুম। জন্তুটির নাম টিগলায়ন। টাইগারের টিগ, আর লায়ন। বাঘিনীর সঙ্গে সিংহের ভেজাল ঘটিয়ে এই প্রচণ্ড কাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল জর্মনির এক

জু-বাগানে। তা এ আর বেশি কথা কি, ওর চাইতেও মারাত্মক মারাত্মক ভেজালে কাণ্ড আমাদের মুলুকে হামেশাই ঘটে থাকে। পাথুরে-ময়দা আর মিনারেল ঘি-এর চাইতে বেশি তাজ্জব আর আছে কি? নিতান্ত জু-বাগানে ওগুলো দেখানো যায় না, তাই।

জন্তু-জানোয়ার জোগাড় করা এক মহা ফৈজৎ। প্রথমে তো জোগাড় করা শক্ত, তারপরে দুনো শক্ত বাঁচিয়ে রাখা। নগদ টাকা খসাতে গেলে জু-বাগানের শিক্‌গুলো অব্দি মচ্ মচ্ করে উঠবে অ্যাসা দাম বেড়ে গেছে জানোয়ারদের। যুদ্ধের আগে যে গরিলা পাঁচ ছ' হাজার টাকায় পাওয়া যেত, সেগুলোর এখন নগদ মূল্য তিরিশ হাজার। কাজেই পারতপক্ষে নগদ টাকা খসাবার চেষ্টা করা আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। সকলেরই তাক বদলাইএর দিকে। তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলে ঝোলাতে অবশ্যই রাজি যদি আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলেকে জুড়তে রাজি থাকো।

আর তাতেই কি সব সমস্যা জলবৎ হয়? এই তো হাতীর বদলে জাপান থেকে পাওয়া গেল জায়ান্ট সালামাণ্ডার। কী তার তত্ত্ব-তোয়াজ! খসখসের ঘর করে, বরফের বিছানায় তাকে রাখা হল গুরুর খাতিরে। ওর জন্যেই এক অলাদা খিদমদ্‌গার জী-হুজুরে দিনে রাতে খাড়া। ডেলি চৌদ্দ টাকা খরচ। হলে হবে কি, আসলে মাল যে জাপানী, টেঁকসই আর কত হবে। এক আণ্ডিল টাকা গজব করে দেশের সুনামটি বজায় রেখে দেড় বছর পার হতে না হতেই স্বগ্‌গে গিয়ে ট্যাক্সো গুনলে। এই জু-বাগানে পোলার-বিয়ারও আনা হয়েছিল একবার। গরমে টেঁসে গেছে।

জায়ান্ট সালামাণ্ডার, পোলার বিয়ার, টিগ-লায়ন অবশ্যই আজব চীজ্। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা পয়মন্ত। কিন্তু জু-বাগানের সব চেয়ে যা আজব চীজ্ তা সর্ব দেশে আছে কিনা তা জানিনে, তবে এখানে হামেশা

বিরাজমান, অথচ তার জন্যে এক আধলা খর্চা নেই কর্তাদের। যখনই জু-বাগানে যাবেন, তখনই দেখবেন এদের। এগুলো হল জা-নর। জানোয়ারে আর নরে মিলমিশ খেয়েই এদের পয়দা। সত্যি বলতে কি, আমি যাই এদেরই দেখতে। আর দেখা পেলে সঙ্গ ছাড়িনে।

বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে দেখবেন একটুক্ষণ। খাঁচার সামনে বেজায় ভিড়। সব জা-নর জুটেছে সেখানে। কাঠি ঢুকিয়ে খোঁচা মারছে, চোখ টিপ করে ঢিল ছুঁড়ছে, যদি চোখে একটা লাগাতে পারল তো অসহ্য যন্ত্রণায় বাঘটা কঁকিয়ে উঠল, দরদরধারে রক্ত পড়তে লাগল, আর তখন এই জা-নরদের দলে কী উল্লাস, কী ফূর্তি !

বলে উঠল, উঃ কী রোয়াব লিচ্ছে মাইরি, দে সিগ্রেটটা ছুঁড়ে।

বলেই জ্বলন্ত সিগ্রেটটি সত্যি সত্যিই গায়ের ওপরে ছুঁড়ে দিল।

তারপর, চ' শালা ওদিকে চ' বলে 'লে লো মজা ছুনিয়াকি' গানটি কূলকুচি করতে করতে আরেকধারে চলল।

যাচ্ছিলুম ওদের সঙ্গেই। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম হাতীর ওখানে। হোথায় তখন লম্বা লাইন। চার চার আনা পয়সা দাও আর এক এক পাক ঘোরো। একদল পিঠ থেকে নামল, একদল উঠল আর বাদবাকি হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে রইল নিচেই।

বোধহয় গ্রাম থেকেই এসেছে। বাপ আর মেয়ে।

মেয়ে বায়না ধরেছে, হাতী চড়বো বাবা।

পয়সা নাই রে বিটী।

মেয়ে শুনছে না। শুধু বলছে, হাতী চড়বো।

পয়সা পাব কুথায় ? চার আনা তো গেটে লিয়ে লিলেক। ঘরকে যাব নাই ?

কচি মেয়ে হাতীর মায়ায় পড়েছে, বাপ বেচারীর মহা হেনস্থা। ট্যাঁক

আর কাছার খুঁট মিলিয়েও পয়সা জমল না। তখন দিলে মেয়ের পিঠে সিধে চড়।

বললে, মা-টা মরে তুর বাড় হয়েছে। চল ঘরে, তুকে দেখাব।

চলে এলুম ওখান থেকে। বিকেল হয়ে আসছে। জু-বাগানে ভিড় বাড়ছে। চায়ের রেস্টুরেন্টের কাছ বরাবর 'আন্‌রেডি' হবার জায়গা। একধারটায় ভদ্রলোকদের, অন্য ধারটায় সাইনবোর্ড ঝুলছে—মহিলা। সেখানটায় বেধে গেছে তুমুল। সদ্য গ্রাম থেকে আসা মেয়েপুরুষের একটি দল। সবাই মিলে মহিলা দেখবে। তারস্বরে ঝগড়া চলেছে।

দারোয়ান কত্তাকে ধমকাচ্ছে, ওখানে ঢুকছ কেন? ওধার যাও।

কত্তাও ছাড়বে কেন। বড় মুখ করে নিয়ে এসেছে দলবল। কালীতলা গেল, মরা সোসাইটি গেল, কেউ কিছু বলল না, আর উনি এলেন কে এক লাটসাহেবের ছাতার বাঁট হে, হেথা যেও না, হোথা যেও না, দেখতে যখন এইছি সব দেখব।

অতিকষ্টে ঠাণ্ডা করলুম, ওদিকে যেতে মানা করছে ভালোর জন্যই। হোথায় থাকে এক আজব জীব। ধরলে আর ছাড়বে না।

তাই শুনে সবাই বললে, ফ্যাসাদে কী কাম। চল চল উদিকে চল।

চলে আসব, ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়লুম। হন্তদন্ত সর্দার বলছে, সাহেব, ময়ূর তো ডিমে বসছে না। কিছুতেই পারলাম না, কত চেষ্টা করলাম, কিছুতেই ডিমে বসছে না।

সে কি! যে করেই পার—বসাও। ময়ূরের ও নমুনা রেয়ার, পাওয়াই যায় না। এত কষ্ট করে ডিম পাড়ালুম, শেষে কি সব বরবাদ হবে।

একজন বললে, হুজুর, ও বসবে না, কুর্কী মুর্গী আনুন।

ঠিক কথা, আন্‌, কুর্কী এনে ডিমে বসা, ময়ূরের ছা আমার চাইই।

শুনতে শুনতে চলে এলাম বাইরে।

একদম বাঁধকে

স্বর্গে ঈশ্বর আর মর্ত্যে মাতাপিতা। সেই ঈশ্বরের কেরামতিতে আর বাপমায়ের হাতযশে জন্ম যখন নিলেনই, তখন তাঁদের দেওয়া হস্তপদ ঠিকঠাক কাজে না লাগিয়ে কলকব্জার ঘাড়ে নিজের পরমায়ু সঁপে দেওয়া কেন?

এই যে আস্ত আস্ত হাতপাগুলো রয়েছে, তা কি পরিপাটি করে মুড়ে রাখবার জন্যে? আমি মশায় পারতপক্ষে বাসে-ট্রামে উঠতে চাইনে। নিতান্ত কলকাতার শহর, আর আপিস কাছারি ঠিক সময়ে করতে হয়, হাজরের ইদিক-সিদিক একটু হলেই নামের পাশে লাল টুক-টুকে একটি ঢ্যারা কনেবউ-এর মতো ঘোমটা টেনে বসবেন বড়সায়েবের নজরের সঙ্গে শুভদৃষ্টি করতে, তারপর চারিচক্ষে মিলনটি হয়েছে কি ব্যস্, গেটের বাইরে যাবার জন্যে রাখলেন পা-খানা বাড়িয়ে। তাই মশাই এত তাড়াহুড়ো। সীটে জায়গা নেই তো ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়াই। ভিতর ভর্তি তো ফুটবোর্ডে ঝুলি। প্রাণ যাক ক্ষতি নেই, দেহখানা যেন দশটার মধ্যে অফিসে গিয়ে হাজির হয়। শুধু কি অফিস-টাইমেই এমন, কোন্ সময়টুকু কলকাতা শহরের বাসে ভিড় নেই, ঠেলাঠেলি নেই?

ভদ্রলেকে বলছিলেন, কি বলবো মশাই, আগে এমনটি ছিল না, এই আটদশ বছরে বাসে ট্রামে চলাচল করে মেণ্টালিটিই হয়ে গেছে এ-রকম। বাসে-চড়া মানুষ আর বাইরের মানুষ এক নয়। বাড়িতে যান, চেয়ার যদি একখানা থাকে তো সেটিই আপনাকে এগিয়ে দিয়ে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব, নেই নেই করেও এ ভদ্দরতাই এখনো বজায় রেখেছি। কিন্তু বাসে উঠলেই আর আমি গৌরী ভশ্চায থাকিনে, সেখানে তুমি যদি মিলিটারী তো এই রোগা প্যাংলা দেহ নিয়ে আম্মো মিলিটারী।

তুমি যদি চিয়াং কাইশেক তো আমি মাও সে তুং। বিনাযুদ্ধে লেডিজ সীটও ছাড়ছি নি ধন। বলব কি মশাই, এই সেদিন একটি সীট খালি হয়েছে, দুজনের টেক্কা ফেরাই-এ মেরে দেহটা সীটে ঠেকিয়েছি, একটু কেমন কেমন লাগল, তলায় তো গদী গদী বোধ হচ্ছে না, ঠাহর করে দেখি একজোড়া হাঁটু! পিছনের বেড়া টপকে ওই সময়টুকুর মধ্যেই বাঁশগাড়ি হয়ে গেছে সীটটিতে। এ তো হামেশার ব্যাপার। নিতান্ত নিরুপায় তাই সুস্থ শরীরকে দুঃস্থ করি, অন্তিমকে অ্যাডভান্স করি।

ট্রামে-বাসে চড়াও মশাই অশেষ দিগদারি। ভিড়ে ভিড়াক্কার, তিলটি ফেললেও তা আর নিচ অব্দি পৌঁছয় না, সামনের লোকটির ঘাম-

নোনা পাঞ্জাবী পেরিয়ে এর নাক তার শিরদাঁড়ায় সাঁতার কাটে। এমন সময় একজনের শখ ফুর ফুর করে উঠল, সিগ্রেটে দু'টান ঝাড়তে না পারলে প্রাণ-পাখী বুঝি খাঁচা-ছাড়া হয় হয়। শুরু হল সিগ্রেট টানা। বরাতের দ্যাক্সো যদি মিটিয়ে না থাকেন তো হয়ে গেল, দু-ধোপের পাঞ্জাবী আপনার বারো-টার কোঠায় জায়গা নিলে। কিছু বলতে যান ঠোঁট থেকে নামবেও না সিগারেটটি, দুতিনবার ফাঁকা আওয়াজ করবে, স্যরি।

কথায় কথা ওঠে। অনেক অনুনয় করে বললুম, দাদা, বড্ড ভিড়, সিগ্রেটটি নিভিয়ে ফেলুন।

নির্ঘাৎ 'সাম'বাজারের 'সসী' বাবুই হবেন। কথার সুবাসে গোটা বাসটি আমোদিত হয়ে উঠল।

আহা, মধুময় তামরস রে!—সিগ্রেট মিনিমাঙনা মেলে না মোসাই, ধারে কিনলেও 'সুধতে' কড়ি লাগে।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল সুরু হয়ে গেল, যেন একপা বাড়িয়ে গেট্ সেট্ রেডি হয়ে ছিল, গো বলতেই মুখের বাঁধন খুলে ফেলে কথারা দিলে দৌড়ঃ

কে হে বাঁকা চাঁদ, মুখ বাড়িয়ে বল দিকিনি ফের?

কৌন হ্যায় রে কোড়িবালা, জেরা সুরৎ তো দেখাও!

এটা সিগ্রেট খাবার জায়গা নয়, মারো গোলি!

কে আবার মৌকা পেয়ে মুখে আঙুল পুরে শিটি মারলে—সউই সৃউই সৃউই।

গণ্ডগোল থামল না। যে চাকায় বাস চলে সেটাই যখন গোলাকার তখন আর গোল থামাবার চেষ্টা করাই বৃথা। থামল না বটে, তবে রং পাল্টালো। এক ভদ্রলোক বাসে উঠলেন। দদ্দরে ঘামে গা গতর সপসপে, মুখখানা রাঙা, যেন চলন্তিকার মলাট। উঠেই কণ্ডাক্টারকে এই মারেন তো সেই মারেন!

বাস চালাতা হ্যায় না ইয়ার্কি করতা হ্যায়, উল্লুক জংলী ভূত কোথাকার! দেখুন দিকি মশাই, সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি ষ্টপেজে। হাত দেখাচ্ছি তা আর কিছুতেই থামে না। থামছে কি না ষ্টপেজ ছেড়ে সেই দূরে। ছুটতে ছুটতে সর্দিগর্মি হয়ে গেল। তুম লোগ কী পায়া বাতলাও তো, ষ্টপেজমে গাড়ি থামাতা নেহি তো সাইনবোর্ডটা টাঙায়া কি ফক্কুড়ি করতে!

এ তো রোজই দেখছি। ষ্টেট-বাস আর ট্রামে অন্তত এ ঝামেলা নেই। ষ্টপেজটিতে ঠিক থামে। লোকজন নাবা-ওঠার ব্যাপারে ওদের দৃষ্টির চাঁছি ছিটে-ফোটা এদিক-সেদিক গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু প্রাইভেট বাস! বাস রে, যাতায়াতের ব্যাপারে সে তো স্বাধীন জেনানা। কোথায় থামবে, কোথায় থামবে না সে তার আপরুচি।

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ মশাই, এ অব্যবস্থা, এই অরাজকতা কি কেউ দেখবার নেই? কাঁহাতক আর সহ্য করা যায় বলুন তো।

কি বলব? অনেক দিন নিজেও ভেবেছি, কিন্তু কাকে বললে যে সুরাহা হবে, ভেবে পাইনে। বাসের মালিকরা পয়সা পেয়েই খালাস, তাঁদের যে একটা দায়িত্ব আছে, তাঁরা যে জানপ্রাণের জিম্মাদার এই বাংলা কথাটা তাঁরা বোঝেন না? এঁদের নিয়েই বাস সিণ্ডিকেট। একটিন আলকাতরাই একশ টিন হয়ে বসেছে ওখানে। কলকাতার মতো শহরে দিনদুপুরে এমন একটা পাকা কেলেঙ্কারি, তা কারো লক্ষ্য নেই। কণ্ডাক্টারগুলোর দিকে একবার নজর করেছেন? ময়লা চিট পোশাক, কাছে এল কি দুর্গন্ধে পেটের নাড়ি নিউ এম্পায়ারে কথকনেত্য করবার জন্যে পা বাড়ায়। আর দুএকজনের পোশাকের যা বাহার তা দেখে পাশে বসা ইস্তিরিও ছোট ভাইয়ের বউ হয়ে দাঁড়ায়। সব্ব অঙ্গে একখানা মাত্তর কামিজ হাঁটুতে এসে চিমটি কাটছে। তা ছাড়া আর বাহির ভিতরে কি আছে না আছে ও-ই জানে আর ওর ঈশ্বর জানেন। দিব্যি দিনের পর দিন পয়সা নিয়ে টিকিট দিয়ে চলেছে কণ্ডাক্টরের পো। আর প্যাসেঞ্জাররাও এমন সব সুপুত্তর, তা দেখে' না রাম না গঙ্গা। সরকারী তরফের কেউ কি নেই? মোটর

ভেকিল? তিনি তো বাস দেখে, আর লাইসেন্স দিয়ে কড়ি গুনেই খালাস।

পরামর্শ দিলুম, পুলিশ কমিশনারকে যদি জানানো যায় বিষয়টা—কথা আর শেষ করতে দিলেন না ভদ্রলোক।

বলে উঠলেন, পুলিশ কমিশনার! তাহলে একটা গল্প বলি শুনুন। আমাদের এক চাকর ছিল। সে যখন প্রথম এল কাজ করতে, মা শুধুলেন, হ্যাঁরে, কে আছে তোর? সে একগাল হেসে বললে, এজ্ঞে আছে তো সবাই, এমুন কি বাপমাও আছে একখান। তবে আবার নাইও।

কি রকম, একবার বলছিস বাপমা আছে, আবার বলছিস নেই, বলি বিষয়টা কি রে?

ও বললে, মাঠাকরুন, মিছা বলি নাই গো। একখান বাপ আর একখান মা তো আগে হতে ছিল। যার থিকে আমার পয়দা। তারপর বাপখান তো গেল মরি। আর মাও আরেকখান বিয়া করল। তো সে আমার বাপ হল কিনা? তারপর গেল আমার মা-খান মরি। আর বাপ আবার করল আরেকখান বিয়া। তো বাপের এই বৌ, আমার মা-ই তো হবে। তাহলেই দেখেন, বাপও আছে মাও আছে, আবার বাপও নাই মাও নাই।

তখন হিসেবটা বুঝতে একটু দেরি হয়েছিল। এখন দেখি আমাদের পুলিশ কমিশনারেরও সেই বিত্তান্ত। আছেন বটে, আবার নাইও বটে। আর তা ছাড়া, তিনি কি বাসে চড়েন? তবে? খামোকা তাঁর সময় নষ্ট করে ফয়দা কি। অবিশ্যি তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা বাসে চাপেন, তবে একে-বারে পিওর ফোকটিয়ায়। কাজেই কণ্ডাক্টার ড্রাইভার যাচ্ছেতাই করলেও গতরটা খাটান না। অতিকষ্টে চাকরি যখন বাগিয়েছি পুলিশ ডিপার্টে তখন আখের একটু গোছগাছ করতে হবে বই কি? পাবলিকের পক্ষে

বিধিব্যবস্থা করলে কি টু-পাইস আসবে ? কাজেই মোক্ষম অবস্থা হচ্ছে চেপে যাওয়া।

কিন্তু বাসে চেপে যাওয়া কি একটুখানি কথা। যদি বা তগদিরের জলে ঢেউ দিয়ে পানার জঙ্গল একটুখানি সরালেন, একেবারে পাশের লোকটি উঠে পড়লেন, নিকটবর্তী আর কেউ নেই, সুযোগ পেয়ে আপনি বসলেন। স্বস্তির নিশ্বাসটা বেরুবার জন্যে নাকের ফুটোর শেষ বরাবর এসেছে, এমন সময় 'বাবুজী, লেডিজ হ্যায়!' আঃ, মেজাজখানা তখন যেন হাউই হয়ে ওঠে।

লেডিজ বিত্তান্ত এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, চলতে ফিরতে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে। চার বচ্ছর লড়াই করে সদ্য বাড়ি ফিরলে সৈনিকদের অবস্থা যা হয়, টায়ারের দুম্-ফটাস শুনে তারা যেমন খানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে, ভাবলে বুঝি বোমা ফাটল, তেমনি পথ দিয়ে পায়দল চলতে চলতেও যদি দৈবাৎ পেছন থেকে শুনি—জানানা—অমনি চমকে উঠে সরে দাঁড়াই। মুরগীর ডিমে ময়ূরের ছানা লাখেও একটা হয় না, তবে পাশে তিনজনের মতো জায়গা থাকলে লেডিজ সীটে লাখে একটি মহিলাকে 'বসুন' বলতে দেখেছি। তবে এমন মহিলা 'লাকে' একটি মেলে।

এই ব্যাপারটা আমরা আর কিছুতেই সামলাতে পারছিনে। মেয়েদের সংখ্যা আফিস কাছারিতে বেড়েছে। তাঁদেরও হাজরে সেই দশটায়। কাজেই তখন বাসে চড়াটা তাঁদের শখের প্রাণ নয়। কিন্তু সে কথা কে বোঝে ? অফিসটাইমে গাড়িতে লেডি উঠল, তো ভিমরুলের চাকে যেন লেডিকেনি পড়ল।

চাদ্দিক থেকে উঁচু নিচু সব স্তরে—অ্যাই সেরেছে। বলিহারি যাই শখের!

জায়গা নেই একটি ফোঁটা, এর মধ্যে আবার লেডিজ তুলছ কেন, ও কণ্ডাক্টর।

সব এই বেটাদের শয়তানী। সরাসর চালিয়ে যাবি, তা নয়, আবার গাদাচ্ছে দেখুন।

ওহে সর সর, জায়গা দাও আসতে, সীটটা ছেড়ে দিন মশাই, মেয়েছেলে।

যিনি সীটে বসে ছিলেন, তিনি উঠলেন। মুখখানা হয়ে উঠল আরক। আর দশ বিশ জোড়া চক্ষু হোথায় গিয়ে আটকা পড়ল। অনেক সময় এমন সমস্ত মন্তব্য ওঠে গাড়িতে ভদ্দরলোকেরাই করেন, যা শুনে পিত্তি অবধি ঘাই মেরে ওঠে। পাশে সীট থাকলেও তা খালি থাকে। যদিও বা কোন মহিলা চোখ কান বুজে কাউকে বসতে বললেন, আর সে টপ করে বসে পড়ল তো বাধল আরেক জ্বালা। ভদ্রমহিলা সারাক্ষণ এমনভাবে বসে রইলেন, যেন তাঁর হাতে কলেরার ইঞ্জেক্‌শনের ছুঁচ ঢোকানো হয়েছে। এই আড়ষ্টতা কাটাতে না পারলে এই অহেতুক বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা দূর হবে না, বাংলা কথা। তবু মহিলা দেখলে গাড়ি থামে এই যা মঙ্গল। নয়তো আমার ধারণা হতো গাড়ি শুধু চলিবার নিমিত্তই, আর যাহা থামিয়া থাকে তাহাকে কহে বাড়ী।

আগেই বলেছি, ষ্টেট-বাস আর ট্রাম ছাড়া একদম বাঁধার রেওয়াজ পারতপক্ষে প্রাইভেট বাসগুলোর নেই। তারা যেখানে সেখানে থামে, যত খুশি লোক নেয়, হাতে একটা সুটকেশ থাকলে 'মাল্‌কা টিকিট লাগেগা' বলে জবরদস্তি করে। তাদের ব্যবহার রুক্ষ, আচার আচরণ

অসভ্য, তবে দক্ষতায় এরা খুব দড়। দরকারের সময় গাড়ি দাঁড়ায় না। কিন্তু অদরকারে মিনিটের পর মিনিট অপেক্ষা করে। শেয়ালদার এ মোড়টায় অনেকক্ষণ ঘাপটি মেরে থাকবার পর যদি বা সেটা পেরুলো তো ও মোড়ে আবার 'ফিন্ রাম সে গিনা' করে।

কাঁঠাল খাবার পাল্লা হচ্ছে। খাজা কাঁঠালের একশটা কোয়া খেতে হবে। দশ বিশ কোয়া খেয়েই সবার পেটে হাউসফুল। কিন্তু এক কাবুলীর আর ডাইনে বাঁয়ে চাওয়া নেই। গোটা নব্বুই যখন সাবাড় করেছে, তখন মনোমালিন্য হল। কাবুলী বলে নব্বুই, অন্যে বলে উননব্বুই। দু'তিনবার নব্বুই উননব্বুই করবার পর কাবুলী গেল বেজায় চটে। দুটো বড় কাঁঠাল এলিয়ে নিয়ে বললে, কুছ্ পরোয়া নেই ফিন্ রাম সে গিনা করো। ফের ফিরতি এক থেকে গোন। এ বিত্তান্তও তাই। তবে এ সব কসুরও মাফ হয়ে যায়, ওদের কেরামতি দেখে।

ভোর পাঁচটায় ওরা বাসে চড়ে, আর বাস থেকে নামতে নামতে রাত একটা। এই আপ ডাউন যাতায়াত, এর মধ্যেই ওদের নাওয়া-খাওয়া। দু'ঘণ্টা বাসে চাপলেই দেহের বাঁধন ফর্দাফাঁই। আর এ-তো কুড়ি ঘণ্টার ধাক্কা। ওদের আড্ডায় আড্ডায় ঘুরেছি দিনকতক। দেখেছি, কী অমানুষিক পরিশ্রম করে।

আগে বাসের কারবারে বাঙালী ছিলই না বলতে গেলে। এখন ড্রাইভার কণ্ডাক্টার তবু হয়েছে কিছু। কিন্তু বাঙালীই কি আর অবাঙালীই কি, অবস্থা সবাইকারই এক। মাইনে-কড়ি প্রায় কেউই পায় না। সব কমিশন। ড্রাইভাররা টাকায় দু আনা, আর কণ্ডাক্টার টাকায় এক আনা। সামনের দরজায় যে থাকে কোম্পানি তাকে দেয় রোজ তিন টাকা। তার মধ্যে আবার লেট অ্যাড্ভান্স ফাইন আছে। আগে এলেও জরিমানা, পরে এলেও। আগে অ্যাড্ভান্স পরে লেট। মিনিটে আট আনা। অগের বাস লেট করলে পরের বাস পয়সা পাবে।

পরের বাস অ্যাড্‌ভান্স এলে আগের বাস পাবে সে ফাইনের কড়ি। দরজা আগলে বসে আছে টাইমকীপার। তার কাছে ফাটিফুটি চলবে না। চল নিয়ম মতে। যত ফাইন তার অর্ধেক দেবে ড্রাইভার, আর অর্ধেক কণ্ডাক্‌টার।

আড্ডায় বসে কথাবার্তা বলছিলুম। যা রোজগার তাতে কি সংসার চলে? কণ্ডাক্‌টারটাকে জিজ্ঞাসা করলুম।

বললে, ড্রাইভারদের আর কষ্ট কি? খাটতে পারলেই পয়সা। ওদের তো কাজের অভাব নেই। রোজই কাজ পায়।

তার মানে? তোমরা কি রোজ কাজ পাও না?

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, মাসে পনর দিন কি দশ দিন কাজ পেলেও তো আর দুঃখ থাকে না। তাও পাই কই? তবে ড্রাইভারদের সুখ আছে তবুও। কী বল সর্দারজী?

সর্দারজী মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, কত রোজগার হয় আপনার?

বুড়ো বললে, ঠিক তো না-কিছু আছে—চারশ তিনশ হোবে মাহিনামে।

কে কে আছে?

কেন, বউ আর দুই বাচ্চা; এক বেটা, এক বেটি।

কণ্ডাক্‌টার ধমক দিলে, শোন কথা, আর একটা আছে না বড়? বছর এগারো বয়েস?

সর্দারজী জবাব দিলে, আরে উল্লু, উ তো সকুল্‌মে পড়তা হ্যায়। আরে উল্লুক, ও তো ইস্কুলে পড়ে।

শুনুন স্যার, কথাটা একবার শুনুন। নিজের বেটার হিসেব রাখতে পারে না, শ'য়ে শ'য়ে টাকা কামাচ্ছে!

বললুম, তোমার কি লাইসেন্স আছে?

আছে না? এই দেখুন না। ফটো সাঁটানো আছে। পরীক্ষা পাশ করলে তবে লাইসেন্স দেয়। প্রথমে তেত্রিশ টাকা মতন লাগে; পরে বচ্ছরে এক টাকা।

জিজ্ঞাসা করলুম, পরীক্ষাটা কি?

বললে, রুটের পরীক্ষা। কলকাতায় ক'টা রাস্তা। আমার রুটে কি কি রাস্তা, কোন্ রাস্তা কোথা থেকে বেরিয়েছে। কোথায় কোথায় থানা আছে, পোষ্ট-অফিস আছে, সিনেমা আছে, বড় বড় ক্লাব আছে। এই সব। তারপর ভাড়া। কতদূর পর্যন্ত কত ভাড়া। এই সব জিজ্ঞাসার ঠিক ঠিক জবাব দিলে তবে কণ্ডাক্টারির লাইসেন্স পাওয়া যায়। আমি শিখেছি আশ্চর্যি কোম্পানিতে। জৈদ্কা ওদেরও ট্রেনিং স্কুল আছে। আগে তো ভেবেছিলাম, লাইসেন্স নিলে ফয়দা হবে খুব। কিন্তু এখন দেখি ভ্যালু নাই কিছু। যতগুলো লোক কাজ করি আমরা, প্রায় অত লোকই বসে থাকি। এই দেখুন না।

সত্যিই দেখলুম, একগাদা লোক কাজের আশায় বসে আছে।

ও বললে, পাঁচটায় এসেছে, আবার এখনি বাড়ী চলে যাবে। আমি ছয়দিন বসে থাকবার পর গতকাল কাজ পেয়েছিলাম। আজ আবার বেকার। কতদিন এমন থাকব তাও জানিনে। কাল বিক্রি হয়েছিল একশ তিরিশ টাকা। আমি পেয়েছি সাড়ে সাত টাকা; এক টাকা সামনের লোকটাকে দিয়েছি, আর বার আনা ফাইন। ড্রাইভার পেয়েছে পনের টাকা; ফাইন দিয়েছে বারো আনা। আর সব টাকা ওর আছে। আজ চার বচ্ছর এইভাবে কাজ করছি। আমরা মোটর ভেকিলে কত লেখালেখি করেছি। আমাদের হাফ ডিউটি ক'রে মাইনে বেঁধে দেওয়া হোক্। তা'হলে তো সব্বাই চাকরি পাই। আশী টাকাই দিক না মাস মাস, তাও ভাল। সবাই মিলে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পৃথিবী টাকার বশ বুঝলেন না, বাবুরা কিছু গুঁজে দিতেই সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

আর একজনের কথা বলি, অ্যাকসিডেণ্টে পড়ে ছুটো আঙুল উড়ে গেছে তার। অসুখে ভুগলো তিন মাস। মালিক আধা পয়সাও দেয় নাই। আরও একজন চব্বিশ বছর কণ্ডাক্টারি করেছে। ওয়েবিলে চব্বিশ বছরের দস্তখত আছে তার। কিন্তু সে যখন মারা গেল, কিছুই দিল না মালিক। তা কি বলেন আপনি, এইটা কি মানুষের জীবন? কাজে গল্তি করি, ষ্টপেজে যদি একটা মানুষ থাকে, আর বেশি মানুষ থাকে যদি বাইরে তো বাইরেই দাঁড়া করাই। ষ্টপেজ ধুয়ে কি জল খাব? জানি আজ কাজ পেয়েছি, আজই রোজগার, যত পারি রোজগার করি, কাল থেকে তো বেকার। কত দিনের জন্য কে জানে? তা আমাদের কাছে আর মানুষের ব্যবহার পাবেন কি ক'রে? আমাদের জীবনটাও তো এই বাসের মত চলে। একদম বাঁধতে ভরসা পাই না। কখনো একদম যে দিন বাঁধব, সে দিন আর এই ছুনিয়াতে নাই স্যার, একদম গোরে।

ছায়া, শুধু ছায়া

ভদ্রলোক বললেন ঃ

বাপের পকেট ফক্কা করে সিনেমা দেখতে শিখেছি। আর দেখছি কবে থেকে ? ইজেরের রশি যে বয়সে বারংবার কষাকষি কত্তে হত, সেই তখন থেকে। অভ্যেসটা দাঁড়াল পুরুষ্টু রকম। আর সে অভ্যেসের ঘুন্‌সিও আবার এমন টনকো যে, ছেলে মরে ফৌত হলেও তার কোমরের ঘুন্‌সি ছেড়ে না। সিনেমা দেখি। পর্দার গায়ে রং বেরং-এর ছুকরীরা সব হাওয়া কেটে বেড়ায়। আমার মনে পুলকের দক্ষিণবাতাস চাগাল দিয়ে পর্দার গায়ে ঢু মারতে চায়।

কফি হাউসেই প্রথম আলাপ ভদ্রলোকের সঙ্গে। মাঝ-বয়েসী, উঁচু কপাল, পাতলা ছিমছাম গড়ন পেটন। ভাগ্যের পুলিশ সদাসর্বদা বেটন উঁচিয়ে খাড়া, মুখের ফূর্তি তাই যেন আড়াল থেকে কলা দেখাচ্ছে। কফির কাপে চুমুক দিয়ে মুখের ঘোলা মুছে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, এই লাইনে চৌদ্দ বছর আছি। নিতান্ত কম কিছু দেখিনি মশাই। পর্দার মায়া হাতছানি দিয়ে এ পথে টেনে এনেছিল, রঙের সে পলকা সুতো কবে ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে। এ ব্যবসার চাদ্দিকেই মশাই জোচ্চুরি, শাদা বাংলায় 'ফোরটুয়েন্টি'র কারবার চলেছে, বিশেষ করে প্রোডাকশন্ লাইনে। মাথার ওপরে সব আছেন হরিদাস পাল এক-একজন। প্রোডিউসার, ডিরেক্টর। পাকিস্থানের জমিজমা বেচে হাজার পঁচিশেক হাতে এসেছে কি তিনি প্রোডিউসার। বাপের ওকালতী আমলের ফুলপ্যাণ্ট আর বন্ধুর হাওয়াই শার্ট অঙ্গে ঠেকাতে শিখেছেন, একবার ধার-ধোর করে এক টিন 'গোল্ড ফ্লেক' কি 'প্লেয়ার্স থ্রি' হাতে করতে পারলেন তো তিনি ডিরেক্টর। ব্যস্, আর কি, জমে উঠল একটা 'নব চিত্র জলাঞ্জলি'

লিমিটেড। তাপ্পির টোপ যদি না গিলল প্রোডিউসার তো তার জন্যে আরো কড়া রকমের বন্দোবস্ত। আগে প্রোডিউসার না পাকড়ে, একটা খুবসুরৎ হিরোয়িন জোগাড় করো। পুরোনো ঘাঘুতে কাজ আদায় হয় ভালো, তবে কড়ি গুনতে ট্যাঁক গড়ের ময়দান হবার সম্ভাবনাই বেশি। কাজেই তল্লাস করো নবাগতার। তারপর প্রোডিউসার বাবুকে কাবু করতে আর ক' মিনিটের ওয়াস্তা। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক এই 'ফোরটুয়েন্টি'র পার্টনার তো আমাকেও হতে হয়েছে, তার কি প্রায়শ্চিত্ত, তাই ভাবছি শুধু।

কাঁচা বয়েসের আইডিয়ালিজম্, হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা, সিনেমার মতো এমন একটা টাইট যন্তর হাতে পেলে ভেবেছিলুম, কি না করা যাবে, সদ্য তখন এম এ পাশ করেছি বুঝলেন, মনের চিনিটোরা আমটায় সদ্য তখন রং ধরেছে, পর্দার অলো হাতছানি দিলে, সে বড় শক্ত টান মশাই, আইডিয়ালিজমের টান প্রেমের টানের বাড়া, সব ছেড়ে টলিউডের গুদামে বন্দী হলাম। কি, না ডিরেক্‌টার হব।

ভদ্রলোক হাসলেন। বয় এসে খালি কফির পেয়ালা উঠিয়ে নিয়ে গেল। টেবিলে রেখে গেল বিল। ভদ্রলোক বিলটি দেখে আবার ম্লান হাসলেন। বললেন, বিল যদি আমাকে শুধতে হয় তবে

স্থর মুশকিলে পড়ে যাব। পকেটে পাঁচ টাকার একটা নোটই সম্বল। বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে চার মাস পর ডিরেক্টার সাহেবকে পাকড়াও করলুম আজ। স্ক্রিপ্ট্ লিখে দিয়েছিলুম, বছর পার হতে চলল। বলেছিলেন, শ' পাঁচেক টাকা দেবেন। তা দেখুন, সে ছবি তোলা হল, সগৌরবে দু'তিন হপ্তা চলল, প্রোডিউসার ঘাল হয়ে কাশীবাসে ছুটলেন, এখনো তিন ফিগারে পৌঁছুলাম না।

বলতে বলতে ভদ্রলোক নোটবুক বের করে বললেন, এই দেখুন, আজকের পাঁচ টাকা নিয়ে, সাত ইনস্টলমেণ্টে মোট তিরানব্বুই টাকা সাড়ে এগারো আনা পেয়েছি। আজ গিয়ে দেখি ডিরেক্টার সাহেব ফেত্তা দিয়ে বউ-এর ময়লা শাড়ি পরে বিড়ি ফুঁকছেন। বুঝলুম বক্রী টাকা পরমেশ্বরে সমর্পণ করতে হবে। বলুন তো কি করি? ব্যাটাচ্ছেলে কি কি কম গেঁড়িয়েছে? প্রোডিউসার যা টাকা ঢালে, তার সিকি ভাগ তো ওর পকেটেই যাত্রা করে। কিন্তু রাখতে তো পারে না আধলাও। দিনকতক খুব রোয়াব, ট্যাক্সি চড়ছে, ডিনার খাচ্ছে, স্যুট চাপাচ্ছে, দু চারদিন বেশ তামড়াই-মামড়াই চালালে, তারপর যাঁহা রস গুটোনো, ব্যস্, ফের যে কলু সেই কলু। বউ-এর কাপড়ে ফেত্তা দিয়ে খাকী ফোঁকো। মাঝখান থেকে খেটে খেটে আমরা ক'জন নাক দিয়ে নল ছেঁচে ফেললুম। আর মারলে কিনা আমাদেরই গায়ের রক্ত জল করা পয়সা। ডিরেক্টরের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হওয়ার মতো ছ্যাঁচড়া কাজ দুনিয়ায় আর দুটো নেই। ডিরেক্টরের খিঁচুনি, অ্যাক্টারের খিঁচুনি, ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, ইস্তক কুলি পোর্টারেরা অব্দি চান্স পায় তো চাঁট ছুঁড়ে মারে। অথচ দেখুন, অধিকাংশ ছবিই দাঁড় করিয়ে দেয় এরা—এই অ্যাসিস্ট্যাণ্টদের দল। দু' একজন ছাড়া বেশির ভাগ ডিরেক্টরই তো মেরে দিলে বড় ভাগটি নিয়ে বাড়ি ফেরেন।

তবে আরো কিছু বলি, শুনুন। কি রকম যে হাওয়া চলছে একবার

বুঝতে পারবেন শুনলে। মাঝখানে 'ব্ল্যাক মানি'র হিড়িক উঠল। সে রেওয়াজ এখনো চলছে। ছবি একটা তৈরী করে যান না রিলিজ করাতে, কেমন বাপের ব্যাটা আপনি বোঝা যাবে একবার। হাউসে ছবি লাগাবেন তো প্রথমেই ঠনাঠন টাকা বাজান মালিকের কাছে। যে ডিস্ট্রিবিউটার নিজেই ছবিঘরের মালিক, তার তো ল্যাঠাই নেই কোনো। কুপোকাৎ হন তাঁরাই যাঁদের হাউস নেই। ছবি রিলিজের ব্যাপারে গড়গড়িয়ে গাড্ডায় পড়েন। তাঁদের নাকের জলে চোখের জলে চৌরঙ্গীতে হাঁটুপানি দাঁড়িয়ে যায়। মালিককে গিয়ে বলুন ছবির কথা। দেখবেন, কেমন চক্ষুটি উল্টে বলবেন, রিলিজ ডেট চাই? পাগল নাকি! এ বছর আর হবে না মশাই। হিন্দী ছবির বুকিং আছে বিস্তর। কি ছবি? কার ছবি? আছেন কে কে? সব নতুন? না মশাই ওসব রিস্‌কের মধ্যে নেই। একেই বাংলা ছবি চলে না। কি থাকে আপনাদের ছবিতে মশাই? শুধু ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি দিয়ে কি ছবি চলে? আজ-কালকার দর্শকরা আর সে-রকম নেই, যথেষ্ট প্রোগ্রেসিভ হয়েছে। এখন তারা হৃদপিণ্ডের খোরাক চায়। গাঁট-খরচা করে যে যাবে, তাদের খোরাকের কি বন্দোবস্তো রেখেছেন? আছে হোটেলের নাচ গান? সে রকম নাচিয়েই বা কই বাংলাদেশে। কুচ্ছিৎ পিপে দিয়ে কি লোক টানা যায়। দেখুন দিকি বোম্বের ছবি। আঃ কি সব আমদানি! একেবারে মার দনাদ্দন পাবলিক খুন—দেখলেই নয়ন সাত্থক হয়ে যায়। আর কী মিউজিক সে সব ছবিতে! যেন গরম হালুয়া, ঢালতে না ঢালতেই চোঁ করে উধাও। এ সব ছবি দেখিয়েও সুখ। অন্য ছবির ঝামেলা না থাকলে সোম্বচ্ছরই চালানো যায়। তবে হ্যাঁ, এসেছেন যখন, বাংলা ছবি নিয়ে, আর আমিও বাঙালী, ব্যবসাদারই হই আর যাই হই, অ্যাজ্ এ বাঙালী আমাকে বাংলার কালচারের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে বই কি! আচ্ছা, আনুন দু হাজার টাকা, দিই একটা 'রান্' আপনার ছবির।

দু হাজার টাকা! অত টাকা কোথা পাব মশাই? আর তা ছাড়া, দু হাজার টাকা কেন? পার্সেণ্টেজই তো নিচ্ছেন খুব চড়া।

পার্সেণ্টেজের কথা ছাড়ুন, ওটা তো লিখিত পড়িত। ওটা আবার এর মধ্যে টানছেন কেন? এটা আলাদা, 'প্রোটেক্শন মানি'—এ তো সবাই দিচ্ছে আজকাল। আর আপনি এলেন কোন্ গুরুপুত্তুর যে, গাঁই গুঁই করছেন বড়! কোমরে যদি জোর নেই তো নাচতে শখ কেন? পথ দেখুন মশাই, তাহলে।

'ব্ল্যাক মানি'র এই চেহারা এখনো আছে। যুদ্ধের মধ্যে সর্বদিকেই চাগিয়ে উঠেছিল 'ব্ল্যাক মানি'র মাথা। যুদ্ধের আমল ফাঁপা নোটের আমল। ছবি তৈরির হিড়িক উঠল। কাঁচা ফিলিম কণ্ট্রোল করলে গভর্নমেণ্ট, নইলে 'ব্ল্যাকে' ফিলিম ঝেড়ে কেউ লাল হত আর সিনেমার ব্যবসাটিও লালবাতি জ্বালাবার তাক করত। যা হোক, তখন ডিম্যাণ্ড দেখে আর্টিস্টরাও দাম বাড়ালে, এক সঙ্গে দুখানা ছবিতে কাজ নিয়ে। বড় বড় স্টারদের কথা কি, মেজো সেজো তারকারা অব্দি মুখ ঘুরিয়ে বললে, বিলাক মানি লাও, তবে গাড়িতে উঠব। ইণ্ডাস্ট্রি কি আর সাধে মরে মশাই, চতুর্দিকে এই দশা। শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথায় বাঁধিবি তাগা? অবিশ্যি যাঁরা সত্যিকার আর্টিস্ট, সত্যিই উঁচু দরের, এমন 'ফোর টুয়েণ্টি'তে তাঁরা নেই। একবার কি মজা হল জানেন, দুজন আর্টিস্টকে এক ডিরেক্টার তাঁর ছবির জন্যে কনট্রাক্ট করলেন। প্রোডিউসারের কাছ থেকে দু হাজার করে 'ব্ল্যাক মানি' দিতে হবে বলে তাঁদের নাম করে চার হাজার টাকা নিলেন। ছবির কাজ আধাআধি হয়েছে। আর্টিস্টরা ঠিক সময়ে হাজরে দিতে পারছেন না, তাঁরা অন্য ছবিতেও কাজ নিয়েছেন। ছবির দেরি পড়ছে। প্রোডিউসার তো ফায়ার।

একদিন দেখা হতেই চেপে ধরলেন আর্টিস্টদের, কি ভেবেছেন

আপনারা, 'ব্ল্যাক মানি' দেব, সব চেয়ে চড়া রেট্ দেব, তবু কাজটা ঠিকমতো পাব না, বলি আমার টাকা কি খোলামকুচি?

ব্ল্যাক মানি!

আর্টিস্টরা আকাশ থেকে হেঁট মুণ্ডে শর্ট কাটে মাটিতে পড়লেন।

অপমান্যি করবার আর জায়গা পেলে না!

হিরোয়িন ফোঁস করে এক ছোবল মেরে বলে উঠলেন, 'বিলাক মানি' দিয়েছেন আমাদের! ইয়ার্কি করবার আর পাত্তর পেলে না মুখপোড়া। এতদিন ধরে 'একটিনি' করে আসতেছি, অলেহ্য কাজ একদিনও করিচি বলুক দিকি কে বলবে? এই রইল তোমার পাট। আমি চললুম।

আর দ্বিতীয় কথাটি নয়, গট গট করে গেটমুখো। ফিলিমের নাম ঘৃতাচী দেবী, এমনি নাম কে জানে কী! ছুটলুম পিছু পিছু। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে তো ফ্লোরে তুললুম। কিন্তু এদিকে হিরো গোঁসা করে হাওয়া দিয়েছেন বাড়ির দিকে। অভিযোগ একই। ইনসাল্ট করা হয়েছে। প্রোডিউসার তাড়া লাগলেন ডিরেক্টারকে।

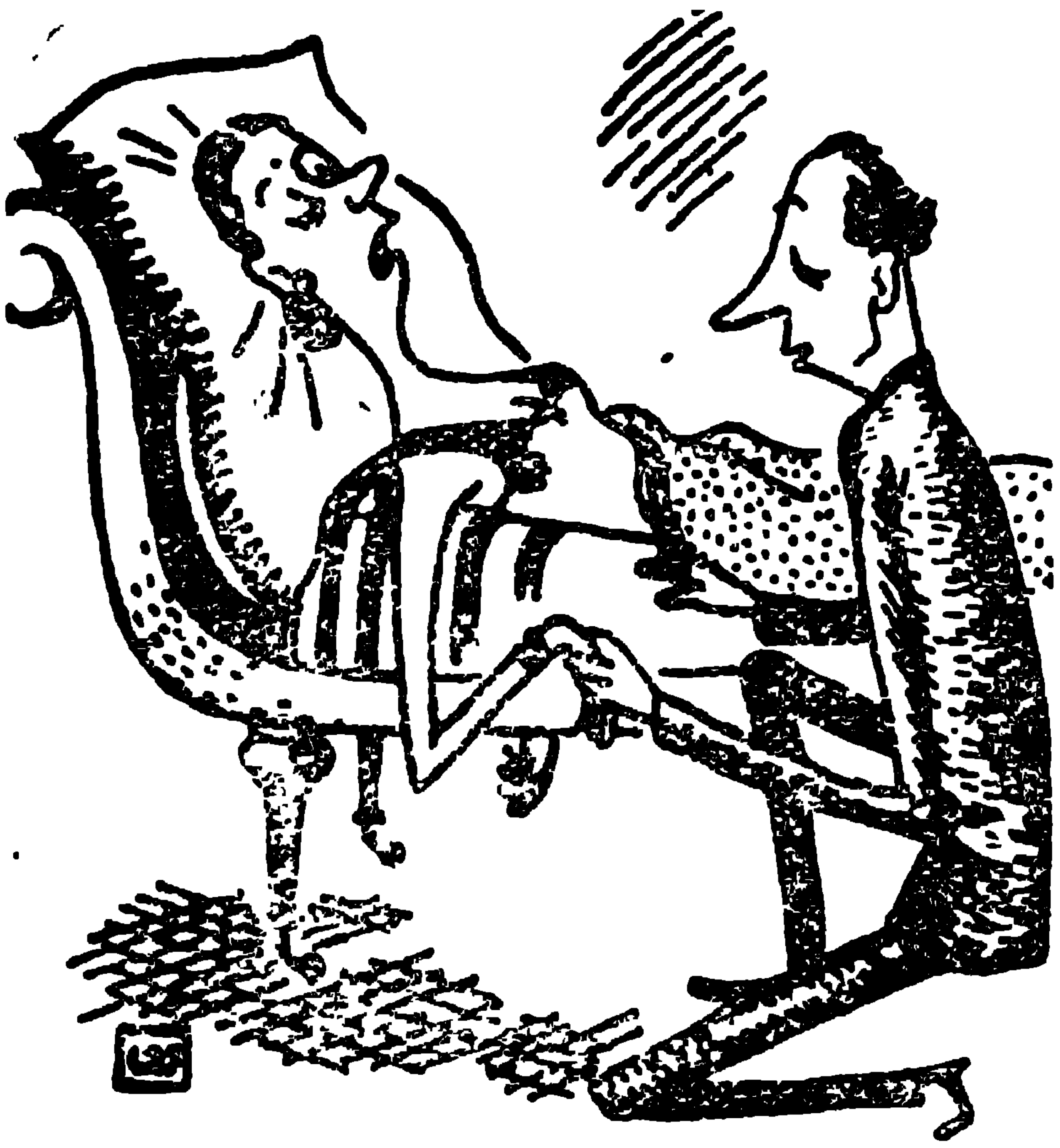

ডিরেক্টার একটু হেসে বললেন, বাই জোভ্, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। টাকাটা ওঁরা চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমি ওটা ট্যাক্‌ট্‌ফুলি ম্যানেজ করে নিয়েছি। টাকাটা আমার কাছেই ছিল, তবে উপস্থিত খরচা হয়ে গেছে। নেভার মাইণ্ড্, ওটা অ্যাডজাস্ট করে নিলেই হবে'খন।

ডিরেক্টারকে এখন কিছু বলা আর সম্ভব নয়। পঞ্চাশ হাজারে ছবি করে দেবে ভুজুং দিয়ে নামিয়েছিল প্রোডিউসারকে, আশী হাজার অলরেডি খরচা হয়ে গেছে, ছবি উঠেছে অর্ধেক। প্রোডিউসারের চাটি-বাটি বন্ধক পড়েছে। ডিরেক্টার অভয় দিয়ে বলেছেন, ভয় নেই, একজন ফাইনান্শিয়ার জোগাড় করুন। আর হাজার চল্লিশেক হলেই ছবি কমপ্লিট হয়ে যাবে। তবে যা ছবি হচ্ছে না একখানা, একেবারে শিওর হিট। দু'মাসে টাকা উঠে আসবে।

ছবি শেষ পর্যন্ত উঠল ঠিকই। প্রোডিউসার বউ-এর গহনা-গাঁটি বন্ধক দিয়ে টাকাও জোগাড় করলেন। কিন্তু যে পথ দিয়ে টাকারা গিয়েছিল, সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা। ভদ্রলোক সর্বস্বান্ত হয়ে এখন দেখি ঠিকেদারি করছেন।

চুরি জোচ্চুরি যে কত রকম বে-রকমের হয়, এ লাইনে, কত আর বলব? এক গ্যাঁড়াকল আছে প্রোডাক্শন ম্যানেজার। প্রোডিউসারকে ডকে তুলতে ইনি হলেন ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট। চা ক্যান্টিনের ম্যানেজার থেকে শুরু করে আর এক্সট্রাদের বাপদাদার সঙ্গে পর্যন্ত এঁর বখরাদারি। এক্সট্রা বুঝলেন না? ভিড়ের দৃশ্যে, নাচের দৃশ্যে যারা পার্ট করে আর কি। এক্সট্রার নামে খরচা লেখালে পাঁচ টাকা, তার থেকে দু টাকা গেঁড়িয়ে তিন টাকা দিয়ে বিদায় করলে। মহরতে সন্দেশ লাগবে, আনলে পাঁচ সের, লেখালে দশ সের। ক্যানটিনের ম্যানেজারের কাছ থেকে চা আসে, সিলিপ দেন প্রোডাক্শন ম্যানেজার। চল্লিশ কাপের অর্ডার গেল, আসলে এল পঁচিশ কাপ; প্রোডিউসারের কাপে, ডিরেক্টারের কাপে, ক্যামেরাম্যান, মনিটার আর হিরোয়িনের কাপে শুধু দু আনার চা, আর বাকি সবার জন্যে ঢালা সাপ্টা চার-পয়সী। চায়ের বিলের দাম ঢুকলো দু আনা হিসেবে। নেট লভ্যাংশ দুই সাঙাতে ফিফ্টি-ফিফ্টি। কেলেঙ্কারির কথা আর কত বলব মশাই, বলতে গেলে শেষ হবে না, মুখের ফেনা জমে শক্ত হয়ে

উঠবে। রিলকে রিল ফিলিম পাচার হয়ে যাচ্ছে। ধরুন, পাঁচ শ ফুট ফিলিম লাগবে। নিয়ে এল পাঁচ শ ফুটের এক আস্ত রিল, কিন্তু ফুস মন্তরে গায়েব হয়ে গেল সেটা। ক্যামেরা লোড হল ছাঁটের টুকরো দিয়ে। কুড়ি ফুট, বাইশ ফুট টুকরো জুড়ে জুড়ে ভজিয়ে দিলে পাঁচ শ ফুট। ছবি তো উঠল নবডঙ্কা, বিলাক মার্কেটে আস্ত রিলটি ছেড়ে রেস্ত উঠল ট্যাঁকে।

কি দাদা, হাঁ হয়ে গেলেন যে! ভদ্রলোক দড়কচা হাসিটুকু ছুঁড়ে দিলেন। ভালো ছবি, ভালো ছবি তো খুব করেন, ছবি যে শেষ পর্যন্ত উঠছে তাইতেই আমার তাকে লেগে যায়। চ্যাংড়া বয়সে আমিও ভালো ছবি ভালো ছবি করে চেঁচিয়েছি। ভালো ছবি তুলবে, তেমন লোক কই, তেমন মন কই। যাঁরা হয়ত পারতেন তাঁরা সরে দাঁড়িয়েছেন। এই ফোর-টুয়েন্টির কারবারে তাঁরা কি টিঁকতে পারেন? গব্য পদার্থ যাঁদের মগজে ছটাকখানেকও আছে, তাঁরা এখানে নো পাত্তা। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে তো এসেছিলুম। কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিনি, অপমানকে ঘাসে মুছেছি, স্ত্রীপুত্রের দিকে চাইনি। এক একটা কন্‌ট্রাক্ট হয়েছে সাত মাসের জন্যে, খাতা কলমে লিখতে হয়েছে শত শত টাকা, কত পেয়েছি তা আর না-ই বললুম। কন্‌ট্রাক্ট করবার সময় ধরেই নিই শেষ দু মাসের টাকা পাব না। টেক্‌নিশিয়ানরাও তাই। সব কিছুর জন্যেই টাকা আছে, ফুরিয়ে যায় শুধু রাতদিন খেটে যারা শিল্পটাকে টিঁকিয়ে রাখছে তাদের বেলায়। পর্দার ওপর নাচন-কোঁদন যতই হোক, সিনেমার কারবারটাই এক ছায়াবাজির খেল, শুধু ছায়া। আচ্ছা, নমস্কার, উঠি।

ভদ্রলোক উঠে গেলেন সমস্ত কামরাটাতে বিষণ্ণতার শুকনো গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে। আমিও উঠলুম। বেরুতেই নজরে পড়ল নিয়ন আলোয় একটা ছবির বিজ্ঞাপন জ্বলছে আর নিবছে। কেমন যেন দাঁত ভেঙচে বলছে, কেমন, কেমন, আর আসবি?

তিনটে ছটা, নটায়

গল্পটি আমার নয়, মামার, ওঁদের কলেজী জীবনের। বয়েস ধরে ধরে পিছন পানে চললে তা অনেকটাই হাঁটতে হবে। মামাদের সঙ্গে পড়ত এক সিলেটী জোছনাদা। ইয়া জোয়ান, বুকখানা ফুলো ফুলো, তুহাতে তাগড়াই গুলো। পড়াশুনোয় নাম করতে পারেন নি, নাম করেছিলেন নতুন ছবির ফার্স্ট শো দেখে। সেটা সাড়ে চার আনায় ফোর্থ কেলাসের আমল। ভাজা দেবার রেওয়াজ তখন কোথায়? প্রথম দিনের প্রথম শোতে সিনেমা যেতে হবে, ডাক জোছনাদাকে। জোছনাদা রাজী, তবে এক শর্তে, ওঁর পয়সাটা চাঁদা করে তুলে দিতে হবে। রাজী তো চল। চলল সবাই। শান্তিপুরী ধুতির নিচে জোছনাদা পরলেন খাকীর হাফপ্যান্ট, আদ্দির চুড়িদার পাঞ্জাবীর তলে স্পোর্টিং গেঞ্জি।

কাউন্টারে ভিড়ে ভিড়াক্কার। জোছনাদা বললেন, ধর দেখি কাপড় জামা। খবরদার, ভাঁজ যেন ভাঙে না। ছিলেন জামাতা জামাতা, জামা কাপড় ইয়ার দোস্তর হাতে গস্ত করায় ভেতর থেকে বেরুল এক পেল্লায় বুকের ছাতি। মুখের মধ্যে পয়সা নিয়ে তুহাত শাবলের মতো ভিড়ের ফাটলে সেঁধিয়ে, দিলেন এক চাড়। চড়াক করে ভিড় ভেড়ে তুখান। অমন তুচার চাড়েই কাউন্টারের কাঠ হাতে ঠেকে গেল। এবার টিকিট কখানা গুনে নিয়ে স্রেফ গাটা এলিয়ে দিলেই হল। মিনি মাঙনায় চক্ষের নিমিষে একদম বাইরে। গেঞ্জি ছিঁড়ে ল্যাল্যাল করছে, পিঠের জমিনে নখ দিয়ে লাঙল চষা কমপ্লিট। জোছনাদা ফিরে আসতেই সবাই ঘিরে ধরল। ইশারা করলেন, আইডিন। একজনের পকেট থেকে আইডিন তুলো বের হল। পরিপাটি করে আইডিন লাগান হল। আবার হুকুম হল, সুঁচ সুতো। সুঁচ সুতো বেরুলো। ছেঁড়া গেঞ্জি রিফু হল। জোছনাদা

আবার জামা-কাপড়ে ফিটফাট হলেন। শেষ অর্ডার এল, চা। ব্যস্ সবাই মিলে চায়ের দোকানে বসে জোছনাদার বিজয়ে চায়ের কাপে ঠোঁট ভিজিয়ে ভেতরে গিয়ে সীট নিলেন। জোছনাদার পিঠে একত্রিশটা যুদ্ধের দাগ ছিল।

সিনেমার শোটি ঠিক আছে, রীতি কিঞ্চিৎ বদলেছে। দুটো শোয়ের

বদলে রোজ তিনটে-ছটা-নটাতে তো হচ্ছেই, ছুটিছাটায় চারটে পাঁচটাও চলছে। টিকিট-ঘরের সামনে হুড়োহুড়ি কমেছে, আর কমেছে গুণ্ডা মার্কেট।

হাল আমলের নতুন আমদানী সিনেমার লাইনটি।

তিনটেয় আরম্ভ, আড়াইটেয় টিকিট ঘরের দরজা খুলবে, এসে লাইন মেরেছে দশটা থেকে। নাওয়া খাওয়া চুলোয় গেছে, কাজকর্ম্মের পাট উঠেছে শিকেয়, জগৎ সংসার সব এসে হাজির হয়েছে এই লাইনে। আমি বলি, ছোঁড়া কাজকম্মের ধান্দায় বেরিয়েছে। ভাবলুম, যাক, বুড়ো বাপের কষ্ট দেখে ছেলের বুঝি আক্কেলের চারা গজিয়ে উঠেছে,

সাত সকালে বেরিয়ে পড়েছে ইদিক উদিক। কিন্তু তা নয় সিনেমায় লাইন দিয়ে ছেলে আমার বিড়ি ফুঁকছেন! বেরিয়ে আয় গুটচ্ছেলে, মেরে চৌপাট করে তবে আজ অফিস যাব।

ভদ্রলোক রাগে গরগর করছেন। চাদ্দিকে ভিড় জমেছে। ছেলেটির দেখলুম বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নেই। ধীরে সুস্থে বললে, কেন খামকা গাল

পাড়ছ। ওদিকে যে অফিসের খাতায় লাল ঢ্যাঁরা পড়ল সে খেয়াল আছে? মা বললে, মধুবালার ছবি এয়েছে, যা দিকি দুখানা দুপুরের টিকিট কেটে নিয়ে আয়। আর আসবার পথে হত্তুকিবাগানে গিয়ে তোর সেজমাসীকেও খপোরটা দিয়ে আসবি, চটপট খেয়ে নিয়ে দেড়টা দুটোর ভেতরে যেন চলে আসে। তা তোমার যদি এত আপত্তি তো যাই বাড়ি, মাকে গিয়ে বলিগে।

ব্যস্, খাস্তা পাঁপরে জলের ছিটে লাগল। ভদ্রলোকের তেরিয়া মেজাজ ফুস্‌মন্তরে নরম মেরে গেল। বললেন, ধুর, আপত্তি করব কেন, এ তো ভালো কথা। বলছিলুম, মাথায় রোদ লাগাচ্ছিস কেন? এই রুমাল নে, মাথায় দিয়ে দাঁড়া।

আরেক ভদ্রলোককে দেখেছিলুম। ঘণ্টাখানেক লাইনে দাঁড়িয়েছেন, কি একটা নতুন ছবির ব্যাপার, টিকিটও কিনে ফেলেছেন। রাত্রের গাড়িতে বেনারস যাবেন, তাই দুপুরের শো'টা কত্তাগিন্নীতে বেশ দিব্যি সিনেমায় কাটাবেন। গিন্নীর ফরমাস। তিনটে বাজতে মিনিট পনরতে দুজনে এলেন। টিকিট গেটে দেখাতেই গেট কীপার বললে, একী, এ তো পরশুর টিকিট, আজ এলেন কেন? বাঃ, আজ কিনলাম টিকিট, তিনটের শো-এর। গেট-কীপার বললে, আজকের টিকিট আজ কিনতে এসেছেন? সেদিন আর নেই দাদা। দুতিনদিন আগেই ফুল হয়ে গেছে। গিন্নী চোখে আগুন ঢেলে বললেন, বলি চোখ দুটো কি ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছিল! ভদ্রলোকের চোখে পাশে দাঁড়ানো গিন্নী যেন ঝাঁটা হস্তে রণরঙ্গিণী সাজ নিলেন।

সব ছবি দেখে হয়ত সব সময় আনন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু যে কোন সিনেমার লাইনে দাঁড়ালে সর্বদাই খুশি হবার মতো কিছু পাওয়া যায়। চৌরঙ্গী পাড়ার সিনেমা-লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি অনেক মজা দেখেছি। রোদ্দুর চচ্চড় করছে। লাইন একটু একটু বাড়ছে। দরদর

ধারে ঘামছি। পিছনে ফিস ফিস শুরু হল। এই শালা, একটু ফাঁক রেখে দাঁড়া না। অন্তারা মাইরি পাঁচজন আসবে বলেছে। কখন আসবে রে? কে জানে, ওর কথা। বলেছে, রেখে দে পাঁচটা সীট। ওঃ খুব যে বলছিস্! যেন তোর বাপের তালুক এটা। এক আধটা হয় ঢুকিয়ে নেওয়া যায়। পাঁচটাকে ঢোকাতে গেলে শালা ফাটাফাটি হয়ে যাবে। দেখছিস সব কেমন চেয়ে আছে? আরে যা যাঃ, এই কাজে হাড় পেকে গেল, আর উনি আমাকে কথাম্মেত্ত শোনাচ্ছেন। যা বলি শোন, আমরা পাঁচজন তো আছি, বেশ একজন করে বেরিয়ে যা। জায়গাটা ফাঁক রেখে ঘুরে-টুরে আয়। একজন এলে, আরেকজন যাবি। তারপর দুজন করে যাবি। তারপর ওদের একজনকে সঙ্গে করে লাইনে ঢুকবি। একজন বাইরে থাকবি আর জায়গা একটু ফাঁক রাখবি। তারপর সে এসে ইজিলি ঢুকে পড়তে পারবে। এমনি করেই পাঁচ-ছ'জনেক—বুঝলি? বড় মজা লাগল আমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কেদ্দানিটা দেখলাম। যে লাইনে একজন পরে এসে ঢুকলে লাইন-সুদ্ধ লোক কামড়াতে যায়, সেখানে ওরা অনায়াসে আরো পাঁচজনকে ঢোকালে।

আপিস কাছারী খোলা থাকলে তিনটের সময়কার লাইনে ইস্কুল-কলেজের ছোকরারা এসে ভিড় বাড়ায়। লম্বা চুল উল্টোদিকে ঠেলে ফেলে, পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে শুরু হয় নানাবিধ কেচ্ছাকাহিনী।

বুঝলি রাম, ফিলসফির ওই উড়িয়া মেয়েটার মাইরি কি-এক লাভার জুটেছে। সেদিন ওদের হোস্টেলে গেছি। বাইরে দেখি এক ইয়া বুইক একেবারে চকচক করছে, ওঃ গরমে মরলাম, কি ঘাম দিচ্ছে দেখেছিস, শালা এই জায়গাটুকু এয়ার কণ্ডিশন করে দেয় না কেন? যা যাঃ, আছিস ফোর্থ কেলাসের লাইনে দাঁড়িয়ে আবার চাইছিস এয়ার কণ্ডিশন! হ্যাঁরে, হলই বা কটকের গোরু তা বলে সে কি দুধ দেয় না? তোর

বুদ্ধির যা আওয়াজ ছাড়ছিস না, মাইরি চেষ্টা করলে ডেপুটি মিনিস্টার হতে পাত্তিস। হ্যাঁ যা বলছিলুম, গাড়িতে বসে ছিল এক পাঞ্জাবী। মেয়েটা গটগট করে এসে গাড়িতে উঠল। ব্যস, দুজনে হাওয়া। আরো কদিন দেখেছি মেয়েটাকে ওই লোকটার সঙ্গে। বল দিকিনি, কলকাতা ইউনিভার্সিটির মেয়েকে পাঞ্জাবী এসে ভাগিয়ে নিয়ে গেল ! আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলুম। বাঙালী আর বাঁচবে না, বুঝলি, ধক্ ফুরিয়ে এসেছে। ওঃ আজ যদি পি সি রায় বেঁচে থাকতেন ! আরেকজন ফস্ করে ধত্তাই দিলে, কেন, নেতাজী ? নেতাজী থাকলে কি আর এ দুর্দশা হয় আমাদের। এই গরমে রোদে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকত হত নাকি ? উপযুক্ত গাইডান্স পেলে হল ভেঙে চুরমার করে দিতুম না ! লীডারের অভাবেই আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।

সওয়া পাঁচটা থেকে কথার হাওয়া পালটাতে থাকে : কোত্থেকে মাইরি এক সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এসে জুটেছে, জ্বালিয়ে খেলে। রাতদিন পেছনে লেগে রয়েছে। জান কয়লা করে দিলে ভাই। পরশু দিন এক মেমো এসেছে বড় সাহেবের, খেয়াল নাই, কোথায় রেখে দিয়েছে ব্যাটা, আজ মনে পড়েছে, আর অফিস তোলপাড় করে তুলেছে, যেন সাইক্লোন বয়ে গেছে। কাগজপত্তর উল্টেপাল্টে, সে কী কাণ্ড। শালা এই সব লোক কে ডি-র কাছে জব্দ। কেন, কে ডি আবার কি করলে ? আর বলিসনে। হাসতে হাসতে মরি। এ রকম দু একটা লোক আছে বলেই বেঁচে আছি। হয়েছে কি, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট একগাদা কাগজ চাপিয়েছে কে ডি-র ঘাড়ে। কে ডি তো ফায়ার, গট গট করে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘরে ঢুকেই বললে, স্যর, টু মচ্ ওয়ার্ক পেণ্ডিং। আই ক্যানট্ ওয়ার্ক এলোন। গিভ্ মি এ প্রস্টিটিউট। ওই শুনেই সাহেবের চক্ষু চাঁদি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে আর কি ! জিগ্যেস করলে, হোয়াট ! হোয়ট ডু ইউ ওয়ান্ট ? সাহেব যত শুধোয়, কে ডি অম্লানবদনে ততই বলতে থাকে, প্রস্টিটিউট স্যর,

আই ক্যানট ওয়ার্ক এলোন। সে মাইরি কী ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত চাটুজ্জে যায়, গিয়ে সাহেবকে বোঝায়, বিস্তর কাজ জমে গেছে, একা একা আর পারছে না, একটা লোক চায়—একটা সাবস্টিটিউট।

পাশ থেকে আরেকজন বললে, আমাদের সেকশনে দাদা, কদিন থেকে একটা মেয়ে ট্রান্সফার হয়ে এসেছে। এই কদিনেই লাইফ মিজারেবল্ করে দিলে। কি বকে, উঃ! সেকশান-সুদ্ধ এখন টিফিন-রুমে গিয়ে বসে থাকে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টটি বড় রসিক লোক। এস্টাব্লিশমেণ্টে বলে পাঠালেন, সেকশনকে সেকশন ইয়ংমেন, বড্ড ইরেগুলার হচ্ছে, একটা মেয়ে-টেয়ে দাও, কাজকর্মে ছোকরাদের নইলে মন বসবে কেন? তা কি মেয়েই পাঠালে দাদা, মেয়ে তো নয়, তপ্তখোলায় খই। সব্ব অঙ্গ দিয়েই বাক্যি ঝরছে। ফলে হল কি, আগে তবু আমরা এক আধ ঘণ্টা কাজে বসতুম, কিন্তু এখন, ভয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্দি ঘরে ঢোকেন না।

একজন বললেন, মেয়ে মাইনাস্ কথা সে আপনি কোথায় পাবেন? এ তো তবু জ্যান্ত মানুষ। তবে বলি শুনুন, আমাদের গ্রামে সরস্বতী পূজো হবে, নবদ্বীপ থেকে কারিগর নিয়ে গেছি। বেশ ফার্স্ট ক্লাশ এক হালফ্যাশানের সরস্বতী সে বানালে। সবই করলে, কিন্তু ঠোঁট দুটো আর কিছুতেই ফিনিশ করে না। যত বলি, ওহে ঠোঁট দুটো জোড়া করে রাখলে কেন? কারিগর বলে, কেন, বেশ তো আছে, থাক না। ইয়ার্কি পেয়েছ? ওই রকম খুঁতো হয়ে থাকবে ঠাকুর? বেচারা কারিগর আর কি করে, ফের ঠিকঠাক করে জোড়া ঠোঁট যাঁহাতক ফাঁক করে দিয়েছে আর অমনি সরস্বতী বলে উঠল, ওহে কারিগর, পুরোনো আমলের শাড়ি আমাকে পরিয়েছ কেন? কলকাতায় এ স্টাইল অচল হয়ে গেছে।

আরো কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক টিকিট নিয়ে ঢুকে গেলেন। তিনটেয় যদি ছাত্রদের ভিড়, তো ছটায় কেরানীদের।

সিনেমার লাইনটাই যে শুধু মজার, তা নয়। শো শুরু হবার আগের

মুহূর্তগুলিই বা কম যায় কিসে? এক বন্ধুর জন্যে হলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এক রিক্সা এসে থামল। নামলেন তিনজন মহিলা। একজনের কোলে এক ছেলে। একজনের হাতে থার্মোবোতল, আরেকজনের হাতে ফিডিং বোতল তার উপরেও আবার ঝিনুক-বাটি। ছেলে যদি বেগ ধরে তো কিসে থামবে জানা তো নেই, তাই এই অবস্থা।

রিক্সা থেকে নেমে বড়জন বললেন, ন-বৌ, ছ আনা পয়সা দিয়ে দাও।

রিক্সাঅলা বললে, বারো আনার বদলে ছ আনা দিচ্ছেন কি মা!

ছ আনায় বরাবর আসছি বাবা, আজ নতুন তো নয়।

তিনজন উঠলেন, এত দূর থেকে—!

বড়জন ধমকে উঠলেন, মুখপোড়ার কথা শোন, তিনজন উঠবে না তো ওই কচি বউ, কাঁচা কোলে, ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসব? নিবি তো নে, না হলে চলে যা। অবলা পেয়ে সদরে ডাকাতি করবি নাকি?

বাইরেই এই, ওঁরা ভেতরে ঢুকলে আজকের শো-এর যে কি অবস্থা হবে, তা ভেবে নিয়ে বন্ধুটি এলে বললুম, চ, আজ হাওয়া খাইগে ময়দানে গিয়ে, ছবি দেখে কাজ নেই।

সে কি, টিকিট যে কেটেছি!

বললুম, হাপ দামে বেচে দে, তাও ভালো।

সিনেমার লাস্ট শো-টি ব্যাপারীদের কব্জায়। বেচাকেনা সাঙ্গ করে মনটা ঝালিয়ে নিতেই তাদের সমাগম। তাদের কথা বিস্তারিত না বলাই ভালো। তবে একবার এক লাষ্ট-শো-দেখনেওয়ালার পাল্লায় পড়েছিলুম, তার কথা শেষ করি। ভদ্রলোক আমার ভগ্নীপতি। থাকেন মফস্বলে। মাঝে-মিশেলে কলকাতায় এসে দুচারদিন থাকেন। তখন সিনেমা দেখা চাই। খাওয়াদাওয়া সেরে সবাই মিলে লাষ্ট শো-তে চললুম সিনেমায়। একেবারে গুষ্টি সমেত। একা একা জামাইবাবুর আবার জমে না। চমৎকার ছবি। নিশ্বাস বন্ধ করে ছবি দেখছি সবাই।

হঠাৎ পাশ থেকে ফুস্‌র্‌র্‌ ফুস্‌র্‌র্‌, মৃত্থ মৃত্থ নাসাবাস্থ। চমৎকৃত হলাম। ফেরবার পথে জামাইবাবু বললেন, ছবিটা ভালোই। বললুম, ঘুমিয়েই তো সময় সাবাড় করলেন, বুঝলেন কি করে? নির্বিকার জামাইবাবু জবাব দিলেন, ভালো ছবিতে গোলমাল হয় না, ঘুমটা বেশ জমে। আমি আবার কানের কাছে ফুস্থর ফুস্থর হলে চোখের পাতা বন্ধ করতে পারিনে।

গড়ের বাত্ত

প্রকাণ্ড প্রোসেশন। সামনে আলোর গেট। সারি সারি বন্দী আলো চলেছে রাজপথ জুড়ে। তার পেছনেই বাজনদারেরা। কত রকম যন্ত্র, কত রকম পোশাক, কত রকম শব্দ। ভোঁপ্পোর ভোঁপো পোঁ, পোঁ, ডিম্ ডিম্ ঝন্ ঝন্। কেমন মুহূর্তের মধ্যে চাদ্দিকের চেহারা পাল্টে যেত।

কোন্ ছোটবেলায় দেখেছি, ছবিটা এখনো চোখে লেগে আছে। ছেলেমানুষী কানে দুটো শব্দ শুনেছিলুম। গড়ের বাত্ত। আজও তা ভুলিনি। তাই কৌতূহল পুষে রেখেছিলুম। সময় পেলে নেড়ে চেড়ে দেখব বলে।

হ্যারিসন রোড—কলাবাগান। রাস্তার ওপরেই ঝোলানো থাকে কিম্ভূতকিমাকার বাজনা গুলো। পেতল-রঙা পাকানো পাকানো যন্ত্র-গুলো নানা ভঙ্গীতে টাঙানো।

গিয়ে বসতেই জোয়ানটা নড়ে চড়ে বসলে। চোখে বোধহয় ঘুম আসছিল। চোখ কচলে জিগ্যেস করলে, কি চাই? বললুম, এমনিই এসেছি, কোন কাজে নয়। বললে, কেন, বোলেন না, ভালো পার্টি দিয়ে দিচ্ছি, খুব সোরেশ এস্পার্ট (এক্সপার্ট) আছে। মশকবাজার পার্টি লিবেন? হেসে বললুম, কাজের জন্যে আসিনি, ঘুরতে ঘুরতে পরেশান হয়েছি। একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। কি আপত্তি আছে? বললে, বোসেন বাবু—বোসেন যত খুশি।

তারপর একথা-সেকথা শুরু হল। জোয়ানটা নিজেই বলতে লাগল,

মায়ের দুধ ছেড়েছি তো বস্, বাপ এসে মুখে ফ্লুট ধরিয়েছে, ফ্লুট ছেড়েছি তো মশকবাজা। বাধা দিয়ে জিগ্যেস করলুম, মশকবাজা কোনটা? আঙুল দিয়ে ব্যাগপাইপ দেখিয়ে বললে, উ সে আছে। তারপর থিকে মুখের আর ছুটি মেলেনি। ক্লারিনেট (ক্লারিওনেট), কর্নেট, যা পেয়েছি ফুঁক দিতে হয়েছে। বাপ ছিল ভারী কারিগর। না যদি বাজাব একদিন তো মেরে খাল খিঁচে লিয়েছে। তা আখুন তো সেই বাপ-দাদার ওস্তাদির জোরে রুজি-রোজগার চলছে।

শখ করে যে একদিন কিছু বাজাব, এমন ইচ্ছা কখনো হয়নি, যা কিছু সব পেটের ধান্দায়। আখুন পরব ঠাণ্ডা তো বস্ ফূর্তি-ফার্তিকা মাথেমে মারো ডাণ্ডা। ফূর্তির মাথায় ডাণ্ডা মেরে বসে থাক। ভাদ্দর মাসে বাঙালী লোকদের শাদী-উদি হয় না, মুসলমান লোকদেরও তাই, পূজা পরবও নাই, বড় মুশকিল। রোজগার-রুটি জোগাড় করব কি করে, তাই ভেবে মাথার ঘিলু জখম হয়ে গেল। আখুন তো সব ঝড়তি-পড়তির দিন। ইয়াদ হয়, বাচ্চা বয়েসের কথা, আঃ কি দিন! এই যে দোকান দেখছেন, এখান থেকে জলুস বের হত বাবু, একাওন (একান্ন) পাঁচাশ (পঞ্চাশ) আদমী। আর কী ড্রেস, গোরালোকের মত হুবহু।

আমার বাপ ব্যাণ্ড মাষ্টার। হুকুম করলো তো বাজা শুরু, হুকুম করলো তো বাজা বন্ধ। আমি তো বাচ্চা। টুং-টাং লোহা পিটছি, লেকিন আমার ড্রেস্ ভি বহুৎ ফাস্‌কিলাস্। উর্দিটুর্দি পরে তো চললাম জলুসের সাথে সাথে। তো আমার মনে হল কি, তামাম কলকাত্তার বাদ্‌শা। বায়না-আয়না কিছু না, খালি খালি ঘুরে আসলাম। কলুটোলা, হারসন রোড, শিয়ালদা, রাজাবাজার, মেছুয়া।

এমন খাসাউর্দির বাহার ছিল কি দূর থেকে আদমিলোগ দেখত আর বলত, সেখ নাছরুল্লার ব্যাণ্ড পার্টির। দূর দূর থেকে ডাক আসত। পাটনা, কটক, আসাম, নাগপুর তক্ গিয়েছি বাপের সঙ্গে।

আর কলকাত্তাতেও তো অর্ডার ছিলই। আখুন সময় খারাপ পড়েছে। খেতে মিলছে না, না পয়সা, না কড়ি, তো ফূর্তি জমবে কেমন করে। এই তো বসে আছি, কেনো কাজ নেই, কোনো মেজিক দেখানেওয়ালাও আসে না। আগে আগে কত সার্কাস কোম্পানি লিয়ে গিয়েছে আমাদের। আখুন তো তাও বন্ধ।

বুড়োটাও চুপচাপ বসে ছিল। আর সামনে আরেকটা লোক বসে বসে কর্নেট ফুঁকছে। বেসুরো আওয়াজ কানে ঢুকে খোঁচা মারছে। বুড়ো ধমকে উঠল, অ্যাই উল্লুক, থাম, থেমে পড়্। বুকে জোর নেই কর্নেট বাজাচ্ছে। ওসব মরদের বাজা আছে বুঝলি। বুঝেছি, বুঝেছি, লোকটা রাগ করে রেখে দিল। বললে, না রুপেয়া, না পয়সা, কিছুই তো দিচ্ছ না মাষ্টার, তো বুকে জোর হবে কোত্থেকে। কাজ-কাম কিছু মিলছে না। বুড়ো বললে, কেন, তুই তো কাজ করছিলি? হ্যাঁ কাজ তো করছিলাম জুতা কলে। মিশিন চালানো কাম। তো দুচার দিনে সব শিখে নিলাম। কি চাবি টিপলে সুঁই চলবে, সিলাই হবে, তা মাষ্টার, কল চলবার সময় আওয়াজ একটা হয় না, ঠিক একেবারে সাইড্ ড্রাম। আর মাষ্টার, মন ঠিক থাকে না, সেই বাজনা শুনি, আর মনটা খোঁয়াড়ে আটকা ভৈঁসের মত দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে। চোখের পর্দা খুলে যায়, আর দেখি, এক জলুস বেরিয়েছে। বহোৎ ভারী। সেই যে মারোয়াড়ীদের শাদীর জলুস বেরিয়েছিল, সেই রকম। তুমি আগে চলেছ মাষ্টার, ইয়াসিন-ভি আছে, ফুলুট ফুঁকছে। নসরুল্লা ক্লারিনেট। আরো সব কত কত লোক। তো ব্যস্, বিলকুল গোলমাল হয়ে যায়। আমার হাত আর মিশিনে থাকে না, লোহার এক ডাণ্ডা

নিয়ে ঠুং-ঠুং বাজাতে থাকি। কাজকাম গড়বড় হয়ে যায়। মালিক এসে ফৌরন (ঝটিতি) নিকাল দেয়।

বুড়ো বললে, মাতোয়ালা থাকিস কেন? সে বললে, খোদার কসম বুড়া, এক ছটাক ভি পিয়া করি না। পয়সা কুথায়? জুতা কলে কাম গেল তো বেকার থাকলাম। ঘোরাঘুরি করে হায়রান হয়ে ফের এক কাম জোগাড় করলাম। হোটেলে, বয়ের কাম। বহুৎ খারাপ কাম। একদিন এক বিদেশী এল। আঃ মাস্টার, কি বলব, কি সুন্দর এক ক্লারিনেট। কি উম্‌দা চীজ! শালা ফুঁক দিতে শেখেনি, রাত্তির বেলা পোঁ পোঁ করল, থাকতে পারলাম না, কাজ কাম ছেড়ে গেলাম তার কাছে। বাজাটা চেয়ে নিয়ে বাজালুম রাতভোর। সে তো মস্ত্‌ হয়ে ছিল। এক সময় ঘুমিয়ে পড়তেই সেটা নিয়ে হাওয়া দিলাম। তো গেল সে নোকরি।

জিগ্যেস করলুম, চুরি করলে? তৎক্ষণাৎ সে জবাব দিলে, তা কি করব? চাইলে কি ও চীজ্‌ খয়রাত করে কেউ? আর সে কী সরেস, হামেশা অমন কি মেলে! ব্যাণ্ড মাস্টারকে জিগ্যেস করেন। বুড়ো বললে, ঠিক কথা, খুব মিঠা আওয়াজ ছিল।

কথাবার্তার পথ ধরে পুরানো দিনের এক গল্প উঠে পড়ল। বুড়ো তাজা হয়ে উঠে বসল। বললে, এক সার্কাস পার্টির সঙ্গে তো বেরিয়ে পড়লাম। আমরা আটজন। তখন আমি পুরো জোয়ান। সার্কাসের বাজনা, জানেনই তো খুব জোশ্‌দার হয়। পুরা ইংলিশ টিউন বাজাতে হয়। আমি তালিম নিয়েছিলুম এক গোয়ানিজ্‌ কালা সাহেবের কাছ থেকে। সেই সাহেবই ব্যাণ্ড মাস্টার ছিল। একদিন খেলা যখন খুব জমজমাট, তখন সাহেবের কি খেয়াল হল, নেশা করেছিল খুব, দিল 'গড্‌ সেভ্‌' বাজিয়ে। 'গড্‌ সেভ্‌ দি কিন্‌' ভারী ইংলিশ বাজনা আছে। ও তো খেল খতমের বাজনা। বাজনা শুনে মানজর, রিং মাস্টার, সব

ছুটে এল। কি মতলব? কালা সাহেবের খেয়াল নেই। সে ছড়ি ঘুরিয়ে অর্ডার দিচ্ছে, আমরা হুকুম তামিল করছি। শেষে তিন চার পহেল্‌বান্‌ এসে সাহেবকে জবরদস্তি ধরে নিয়ে ঠাণ্ডা পানির চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে দিল। তখন সাহেবের হুঁশ ফিরল। বড় মজাদার আদমি ছিল বাবু। আহা, কী সব জমানা ছিল। খোরাকি আর পোশাক, তার ওপর রোজ আট রুপেয়া। আর আজ আট আনা ভি জোটা মুশকিল। আমি পাঁচটা ইংলিশ টিউন জানি, পুরা কনসার্ট চালিয়ে দিব, আট দশ আদমির কনসার্ট ঠিক ঠিক চালিয়ে দিব। এখনো পারি। তা এখন তো আজাদী হয়েছে। ইংলিশ টিউন কেউ শুনতে চায় না, হিন্দী গানা ফিল্মি গানা বাজাবার ফরমায়েশ। তা তারও তো অর্ডার আসে না।

প্রোপ্রাইটারও চুপচাপ শুনছিল কথাবার্তা। বললে, খুব মন্দা যাচ্ছে মার্কেট। বাঙ্গালীলোক খুব ফূর্তিবাজ ছিল। বিয়ে-শাদী হোলো, লাগাও বাজনা, বাচ্চা উচ্চা হোলো, লাগাও বাজনা। মামলা জিতেছে, লাগাও বাজনা। মরেছে কেউ, লাগাও বাজনা। পূজা পরবের কথা তো বিলকুল বাদই দিচ্ছি। বেনিয়া বাবুরা ছিলেন খুব সমঝদার। মল্লিকবাবুর বাড়ির এক জলুসে পূরা কলকাত্তার তামাম বাজনা সাফ হয়ে যেত। কি হোলো বাবু, নসিবের ফের, সন উনিশ শ' ছাব্বিশ সালে লাগল ভারী দাঙ্গা। ব্যস্‌, সব বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। বয়কট করে দিল। হিন্দুর পরব পূজা বেশি, বাজাওয়ালা বিলকূল মুসলমান। ইনসানের কী বেওকুফি। মাথাগরম আদমিরা মারপিট করবে আর মরব আমরা যারা মেহনৎ করে খাই। বুদ্ধু, হারামিকা বাচ্চে সব! তারপর তো বাবু, ফের কিছু কিছু কাজকাম শুরু হোলো। দু চারটে অর্ডার আসতে শুরু করল। তো কিছুদিন বাদে বেধে গেল লড়াই। দুনিয়া ওলোটপালোট হয়ে গেল। দিলের সুখ, ফুর্তির বাসা ভেঙ্গে চুরে নষ্ট হোলো। তখন আর কে বাজনা শুনবে? কে আর জলুস বার করবে? তাও কিছু

কিছু হচ্ছিল। কিন্তক এই 'পুলিশ পাশ' হবার পর থেকে তাও গেল। প্রোসেশন করবেন তো পুলিশের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে। পঞ্চাশ রুপিয়া ফি-ও দিতে হবে। পুলিশকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আবার ব্যাণ্ড পার্টিকে টাকা দেবে, এত পয়সা কার আছে আজকাল?

এই তো ঈদের পরব হয়ে গেল, একটা বায়না পেলাম চল্লিশ টাকা। তো ত্রিশ টাকা কারিগরকে দিয়ে থাকল আমার দশটাকা। ড্রেস ধোলাই করতেই চার পাঁচ রুপেয়া বেরিয়ে যাবে। তো কি থাকবে আমার? বাজাওয়ালাদের খুব মুশকিল। সাল মে চার মাহিনা কাম তো আট মাহিনা বিলকুল চুপ। কি করে চলবে দিন আল্লা জানে।

মজুরি তো নেই বললেই হয়। পরেশনাথের প্রোসেশন বের হয় বড়বাজার থেকে আর পঁহুচায় বেলগাছিয়া পুল। সকাল আটটা থেকে রাত নয়টা। স্রেফ তিন রুপেয়া, ব্যাস্ আর কিছু নয়। চা পিনা, খানা খাওয়া সব ওর মধ্যে! তো কি থাকে? দাদার কাছ থেকে বাপ তালিম নিয়েছে, বাপের কাছ থেকে আমি। ষাট বছরের ঘরানা কারবার। আর কিছু শিখিনি, আর কিছু করতেও পারিনে। কি করে করব? বুড়ো হয়েছি, ভাল দম নেই, তবুও যখন শানাই-এ ফুঁ দিই, একটার পর

একটা রাগ বাজাই, তানে ডুবে যাই, চোখের উপর রোশ্‌নি দেখি রকম রকম, এক এক রাগে এক এক রকম। আগ জ্বলে উঠে, পানি গিরতে থাকে, ফুল ফোটে কত, হুরী পরী আশমানে সব সাঁতার দিয়ে বেড়ায়। আহা, কী সুখ তখন! সুখের দরিয়ায় চিৎ হয়ে ভেসে অল্প অল্প ঢেউয়ের দোলায় আরামে উপর-নিচ করি। দুনিয়া খুবসুরৎ হয়ে ওঠে, দুঃখ থাকে না, কষ্ট

থাকে না। শোক তাপ জ্বালার সীমানা পেরিয়ে চলে যাই এক পুলকের জমানায়। এ ছেড়ে তাই আর কিছুতে মন বসে না।

বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেললে। ক্ষণিকের উজ্জ্বলতা মুখের ওপর থেকে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বিষাদকে পথ ছেড়ে দিলে। একটুক্ষণ চুপচাপ থেকে ধীরে ধীরে বললে, কি জানি, নসিবে কি লেখা আছে। বহুদিনের শখ বাবুজী, মাটি নেবার আগে একবার মৌজ করে একটা নহবতে বসি। বহুৎ তকলিফ করে ওস্তাদের কাছ থেকে যে তালিম নিয়েছি, গোরে যাবার আগে সেই খাস জিনিস কিছু শোনাই। কিন্তু নহবৎই বসে না আজ-কাল। শানাই-এর আলাপই কেউ শুনতে চায় না। খালি ফিল্মী গানার ফরমায়েশ। চ্ চুক্ চ্ চুক্। খাশ সমঝ্দারই নেই আর।

প্রোপ্রাইটার বললে, দোকানপাতি তুলেই দিতে হবে। কর্পোরেশনের 'চারজ্' বেড়েই যাচ্ছে, আগে লাইসেন্স চার টাকা ছিল, এখন চব্বিশ টাকা হয়েছে। সামনে যে শেড্টা দিয়েছি টিনের চালা তুলে, তা ওর 'চারজ্' চার টাকা থেকে আঠার হয়েছে। তো কি করে চালাব?

জিগ্যেস করলুম, তা এখন তোমাদের রোজগার কি? বললে, ঠিক কিছুই নেই। দুর্গাপূজা আসছে, সেদিকে মুখ করে বসে আছি আশায়। আর বর্তন বাটি বেচে পেট চালাচ্ছি। মাঝে মাঝে দু' চারটা 'কলব্' (ক্লাব) থেকে তলব আসে। দু একটা ড্রাম কি বিগিল্ বিক্রী করি, দু একজন গিয়ে তাদের তালিমও দিই। যা দু চার টাকা ওখান থেকে আসে। কিন্তু তারও তো ঠিকঠিকানা কিছু নেই। বিগিল্ বাজানো হিম্মতের কাম। অত তাকত কোথায় পাবে? তাই এক বছর যেতে না যেতেই মুখ দিয়ে খুন বেরিয়ে পড়ে। ব্যস্, বন্ধ হয়ে যায় বাজনা।

কথাবার্তা বলছি। এমন সময় একটা লোক ছুটতে ছুটতে এল। এসেই তড়বড় করে বললে, চাচা, ঘরওয়ালীকে বাঁচাও। কি ব্যাপার?

কি হয়েছে ? না বউ-এর ব্যথা উঠেছে। খারাপ কেস্, ডাক্তার দেখাতে হবে, টাকা চাই। যেমন করেই হোক টাকা দিতেই হবে। কুড়িটা টাকা চাইই চাই।

প্রোপ্রাইটার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। কোথায় পাবে এত টাকা ? কিন্তু উপায় তাকেই করতে হবে, আর কে আছে, কার কাছেই বা যাবে। প্রোপ্রাইটার একবার পকেটে হাত দিল, বাক্স খুলল। কিচ্ছু নেই। চুপচাপ অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে লম্বা লম্বা সারি দেওয়া ড্রয়ারের নিচু তলাটা খুলল। বেছেগুছে বের করলে একটা হাইল্যাণ্ডার গোরার পোশাক। ভেলভেটের ঘাঘ্‌রা, ভেলভেটের কোট, টুপি, ক্রস্ বেল্ট্। খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে দেখল পোশাকটার দিকে। একটা টানা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। পোশাকটা নিয়ে একজনেক বললে, যা এটা বেচে দিয়ে আয়। যা দাম পাবি চটপট লিয়ে আয়।

লোকটি বেরিয়ে গেল। বুড়ো বললে, পনের বছর আগে এটা শখ করে বেটাকে বানিয়ে দিয়েছিলাম। দো শ' রুপেয়া নিয়েছিল। তখন আমদানি ছিল, কিছু পরোয়া করিনি। তারপর বেটা মারা পড়ল। রেখে দিয়েছিলাম পোশাকটা। একবার একবার দেখতাম, পুরানো জমানার রঙ্ চোখে ভাসত। বামড়ার রাজার বেটীর শাদীতে বাজিয়ে যা টাকা মিলেছিল, তাই থেকেই পোশাকটা করা।

লোকটা ফিরে আসতেই কথা থামিয়ে জিগ্যেস করলে, ক্যায়া রে, কেতনা মিলা ? কত পেলি ? তিরিশ। সির্‌ফ ? বুড়োর মুখটা একটু মলিন হয়ে গেল। পরক্ষণেই কুড়িটি টাকা তাকে দিয়ে দিলে। লোকটি সেলাম বাজিয়ে চলে গেল।

বুড়ো বললে, তা এ-ও তো আমার লেড়কার সামিল। কারিগর

খুব ভালো। আচ্ছা ফ্লুট বাজায়। বাপদাদা যা করে গিয়েছিল, হায়রে আমাকে সে সব বেচে দিতে হবে। বিলকুল বেচতে হবে। পেটের ধান্দায় আরও কি করব কে জানে ?

উঠে আসছিলুম। বুড়ো হাত চেপে ধরলে, তা কি হয়, আপনি মেহমান। খাতির করবার মতো কিছু নেই, কম্‌সে কম্‌, চা তো একটু পিয়ে যান।

ঈদ্ মুবারক

আলো না হলে চলে না। ঠিকই সূরয নাই তো জিন্দগী কানা। তবুও রমজান মাসে, এই রোজার টাইমে মাঝে মাঝে যখন পিয়াসে বুকের ছাতি ফাট-ফাট, ভুখে পেটের তন্দুর গরম আঁচে গনগনে, সেই সময়ে মাঝে মাঝে আশমানের দিকে চাই, আর কাতরভাবে খোদাতালার কাছে আর্জি পেশ করি, হে আল্লা হে মেহেরবান, হে দুনিয়ার মালিক, দিনটারে ছোট করে দাও, তোমার আলখাল্লা দিয়ে সূর্যের চোখ ঢেকে দাও। আলোর ডিউটি খতম করে দিয়ে এবার আন্ধার পাঠাও। পাও হাত ধুয়ে উজু করি, শরবৎ পানি পিয়ে নিয়ে একটু শান্ত হই, দেহটারে শীতল করি।

হাজী হক্কাক্ বললেন, আন্ধার ছাড়া সাচ্চা মুসলমানের এই রোজা ভাঙা চলবে না, তা জান যায় সো ভি আচ্ছা। আল্লার কাছ থেকে শুধু মেহেরবানি আর দোয়া চাইব, খাজনা কিছুই দেব না একি হয়? খোদা দেনে ওয়ালা, চাওয়ার অপেক্ষা নেই, দুহাত ভরে দিয়েছেন। এই দুনিয়া আজব জন্তু-জানোয়ার, চিড়িয়া, নদী পাহাড়, সমুদ্দুর তাবৎ কিছু তাঁরই কেরামতে। আমরা মানুষেরা বেবাকই তাঁর নফর, সিভিল সার্ভেণ্ট। এই দুনিয়াখান যেন আমাদের ওয়েল ফার্নিশড্ কোয়াটার, দিব্যি আরামে বিনি ভাড়ায় আছি। তা যে মুনিবের দৌলতে এই সব, তাঁকে খাতির জানাতে হবে না?

খানা সারব কখন, যখন আন্ধার থাকবে এই দাড়ির মতো চাপ-চাপ। কাকপক্ষীরও ঘুম ভাঙবে না, এই হাতে নেব এক কালো সুতো, আর এই হাতে নেব এক সাদা সুতো, নিরীখ করব সেই আন্ধারে ফারাক মালুম হয় কিনা, যদি আবছা আবহাও হয়, আভাসেও ভেদ বোঝা যায় সাদা-কালোর, তো খানা বন্ধ করতে হবে। কেন? না আলো ফুটেছে। শুরু হল রোজা, নির্জলা উপোস। রোজায় কি শুধু নির্জলা উপোসই, তা কেন সমস্ত শরীর-মনই সাফা রাখতে হবে। চুরি-জোচ্চুরি, দাগাবাজি, বেইমানি, মিথ্যেবলা, প্রাত্যহিক জীবনের যা কিছু গ্লানি, কালিমা, মালিন্য, এই সব কিছুর থেকে তফাৎ থাকতে হবে, রিপুর বশে না থেকে রিপুর ঘাড়েই বসতে হবে চেপে। প্রবৃত্তির আদিম প্রবৃত্তি বোধ করি ক্ষুধা, তাই সব প্রথমে এই ক্ষুধা শাসন। রোজার আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে দেহকে পাক করে তোলা।

পয়লা রমজান থেকে রোজার শুরু, আর খতম হবে গিয়ে সেই মাস শেষে উনত্রিশে কিংবা ত্রিশে, যেদিন চাঁদ দেখা যাবে। উনত্রিশ তারিখে যদি চাঁদ দেখতে পাই তো সেই রাত্রেই রোজা ভাঙব, আর নইলে দেখি আর না দেখি, তিরিশে রমজান বেবাকই রোজা শেষ করবে। এই ঈদ্ বড় ঈদ, ঈদ-উল-ফিতর মোসলেম জাহানের সব চাইতে ভারী পরব। আরেকটা ঈদ আছে, বকরীদ, ঈদ-উজ্জোহা। সেই সময়ে একবার আমি মক্কা সরীফে গিয়েছিলাম। হজ্জ্ করে এসেছি। সার্থক হয়ে গেছে আমার জনম।

আমীর, তা তার যতই দৌলত থাক, কিন্তু সে যায়নি, আর ফকীর তার কিছুই না থাক, কিন্তু সে হজ্জ্ করেছে, মক্কা শরীফের পবিত্র বাতাস গায়ে লাগিয়েছে, ওই পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রাণের বাঁধন আলগা করে দিয়ে বুক ভরে তাজা বাতাস টেনে, গাল ভরে বলতে পেরেছে, "আল্লাহুমা লব্বৈক্", আল্লা, তুমি ডেকেছিলে, আমি এসেছি। তা আমি

সে ফকীরের নফর হব, কারণ এই ফকীর তাঁর চুক্তি রক্ষা করেছে। আল্লার ডাকে সাড়া দেয়নি যে, তার আমীরী তুচ্ছ, তার দৌলতের কিম্মত কানাকড়িও নয়।

হাজী হক্কাকের সঙ্গ ছেড়ে পথে বের হলাম। নাখুদা মসজেদে দুপুরের নমাজ শুরু হয়েছে। সূর্য্য মধ্যাহ্নগগনে, যেন গলিত উত্তাপের বাটি। উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে পৃথিবীর পরে। পথে পথে লোক। আর্ত, আতুর, ফকীর, হাত পেতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—বোরখাধারিণী ফকীরনীরও অভাব নেই। দোকান পসারে ভিড়। চিৎপুরে বিকিকিনির এই একটা মরশুম। ঘুরে ফিরে দেখছিলুম। বেশি ভিড় জুতোর দোকানে। আর বিক্রি হচ্ছে তাজ—মাথার টুপি। কাপড়-পোশাকও বিক্রি হচ্ছে, তবে একটু ঢিলে। রঙীন রুমাল বেশ কাটছে, সঙ্গে জর্দা আর আতর।

সন্ধ্যের সময় চা-খানা, হোটেলে, রেস্তোরাঁ ছাপাছাপি। আলাপ হল সেই রকম এক জায়গার। অদ্ভুত লোক এই সুলেমান মৌলভী। বয়স হয়েছে বোঝা যায় না, পেটে বিদ্যে আছে ধরা যায় না। এক কোণায় বসে বসে চা খাচ্ছিল। অন্য চেয়ারে আমি বসলুম। কিছুক্ষণ চুপচাপ, পরে কথাবার্তা শুরু হল।

বললেন, মুসা, ঈশা আগে, পরে মহম্মদ রসুল। এ-সব, এই মজবের আচার-আচরণ খানিক-খানিক বাইবেলে পাবেন, ওল্ড টেষ্টামেণ্টে। এই উপোস করে চিত্তশুদ্ধির প্রথা, প্রায় সব ধর্মেরই অঙ্গ। তকলিফ ওঠানোর মধ্যে কৃতিত্বের পরিচয় আছে, বুঝলেন না? য়েহুদীরা চল্লিশ দিন ধরে উপবাস পালন করত। চব্বিশ ঘণ্টা পর পর কিছু মুখে দিত। কিন্তু এতটা কৃচ্ছ্রসাধন সাধারণের নাগালের বাইরে। তারা পালন করতে পারত না, নানারকম কারচুপি করত। সেই আচারটা ইসলামের মধ্যে চলে এল বটে, কিন্তু মহম্মদ কড়াকড়ির রাশ অনেক আলগা করে দিলেন।

যে-আচার আপামরসাধারণ পালন করতে পারবে না, তা রেখে লাভ কি। তাই চল্লিশ দিনের বদলে এক মাস, আর চব্বিশ ঘণ্টার বদলে দিনান্তে রোজ ভাঙা চালু হল।

রমজানের আরেক মাহাত্ম্য শান্তি। রমজান মাস শান্তির মাস। এ-মাসে রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা মন থেকে তাড়িয়ে দিতে হয়। আরবের ব্যাপারে জানেন তো, কড়া গোষ্ঠী-প্রথা। এক গোষ্ঠীর একজন অন্য গোষ্ঠীর আর কাউকে হয়ত হত্যা করলে, ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গে দুষমনি দাঁড়িয়ে গেল এ-দলের সঙ্গে ও-দলের, আর তা চলল বংশপরম্পর, পুরুষ থেকে থেকে পুরুষে প্রতিহিংসা নেবার দায়িত্ব অর্শাতে লাগল। এমন যেখানে দুঁদেমি, সেখানেও রমজান মাসে অশান্তি নেই, এই এক মাসের মতো এদের দুষমনি মুলতুবি থাকবে।

অনেকক্ষণ ধরে ছেলেটি কাঁদছে। বাপ প্রবোধ দিচ্ছে, লে লো বেটা, রুমাল একঠো, বহুত বঢ়িয়াঁ হ্যায়। ক্যায়সা আচ্ছা, আউর বুট্টিদার। বাপ যত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রুমাল দেখায়, ছেলে ততই কাঁদে, পছন্দ আর করে না। তব্ ক্যায়া লেওগে ? কি নিবি বাবা ? সিল্কের রুমাল নেবে ? না, তবে কি চাস্ ? তাজ চাই, জুতো চাই, কামিজ চাই, কামিজ চাই, প্যাণ্ট—! বস্ বস্। বাপ তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিলে ছেলেকে। বেওকুফ। রুমাল নে বাবা, ছাখ না কেমন লাল, কেমন নীল, কেমন সিল্কের! এই ছাখ তো, মুন্নির জন্যেও তো নিলাম একটা। মুন্নি কেমন লক্ষ্মী মেয়ে, কাঁদে না তোর মতন।

বাপটাকে বললুম, কেন ভাই খামকা ছেলেটাকে কাঁদাচ্ছ ? দাও না যা চাইছে একটা কিছু কিনে। বলতেই বাপের চক্ষু সজল হয়ে এল। বললে, পয়সা কাঁহা বাবুজী ? পয়সা কোথায় ? নইলে কি আর দিইনে। জিনিসপত্র সবই তো 'মহাঙ্গি', আক্রা ছুঁই আমাদের সাধ্যি কি। গরিবের ঘরের ব্যাটা, বাদশাজাদার মতো অর্ডার দিচ্ছে, হুকুম তামিল

করব কি করে ? জুতো একজোড়া দেড় টাকা, এক টাকার কমে মিলবে না, কামিজ-প্যাণ্ট তো ছুঁতেই পারব না, আর তাজ, জরী ছাড়া ব্যাটা ছোঁবেন না; দেড় টাকার কমে কি করে পাই, তা আমার কাছে আছেই মোটে পাঁচসিকে। তাই দিয়ে বাবুজী দুজনের ঈদের বাজার করতে হবে। ঘরে আর এক বেটী আছে আমার।

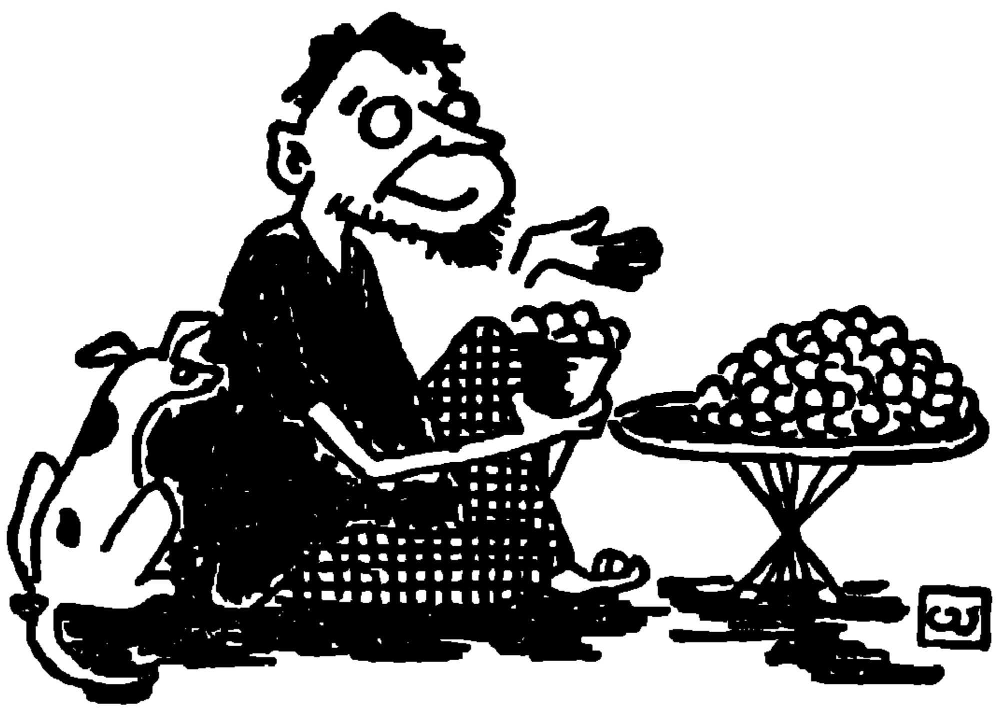

ঘুরতে ঘুরতে মিঠাই-মহল্লায় পৌঁছে গেছি। বারকোসে সাজানো স্তূপীকৃত সিমাই, চাক চাক লচ্ছ্যা, সন্দেশ-রসগোল্লা, গজা-ভর্তি ডাব্বা। ছেলেটি তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাপটা বিরক্ত হয়ে উঠছে। এমন সময় ছেলের বায়না ঘুরে গেল। বললে, ও চাক্কা দো। ওই চাক দাও। ঘিয়ে ভাজা সিমাইএর চাক, লাল-হলদে রঙ করা করা। সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ওইটা দ্যাও। যাক, বাপের নিষ্কৃতি মিলল।

শসা, আম, শুকনো খেজুর, সবেদা, কাঁঠালের ছাড়ানো কোয়া। সবই আছে, তবে সবচেয়ে বেশি আছে লেবু। রোজা ভেঙে প্রথমেই লেবু-চিনির সরবৎ, তার পরে অন্য কথা। ফির্নি, ফালুদা, লস্‌সি, একের পর এক আসবে। কোপ্তা-কোর্মা-কাবাব—হোটেলের গোটা মেনুটাই উপর থেকে শুরু করে নিচু অব্দি সাবাড় করতেন আমাদের হাবু জোয়াদ্দার সাহেব। জোয়াদ্দার সাহেব প্রতি বছরই রোজা রাখেন, সারা দিনমান তবু যাহাকে করে কাটান, সন্ধ্যে হতেই কোনক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে হোটেল অব্দি পৌঁছেই শুরু করেন খাওয়া। আর ফালুদা লস্‌সির গেলাসে যখন সুখ-চুমুক মারেন, তখন দশটার কাঁটা ডিউটি শেষে বাড়ি ফিরব ফিরব করছে।

এক মাস ধরে রোজার কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করা যায়। কিন্তু কাহিল

করে দেয় শেষ দুদিন। তিনদিন আগে থেকেই গুজোব কথা চাউর হতে থাকে, হোথাকার ইমাম খবর পাঠিয়েছেন, এবার উনত্রিশ তারিখেই চাঁদ দেখা যাবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। উনত্রিশ তারিখে বিকেল থেকেই সব ক্ষণে ক্ষণে আকাশে উতলা-চক্ষু। এখনো রোদ্দুর আছে ঢের। পথের অন্ধ ফকির জিগ্যেস করে, কি দোস্ত, খবর মিলল? হেসে বলি, না। পরিষ্কার আকাশ ছিল, দেখতে না দেখতে মেঘে আকাশ ভরে গেল। সন্ধ্যে হল, রাত হল, মেঘ সরে না। নাঃ, আজ আর দেখা যাবে না। আরো একটা দিন উপোস, আল্লার ইচ্ছা।

পরদিন বড় নামাজ। খুশি আর শরীরে ধরেনা। এক মাস শুদ্ধচিত্তে রোজা পালন করতে পেরেছি সর্ত পূর্ণ হয়েছে। আর পায় কে। এস মোবারক জানাই, আলিঙ্গনে বক্ষ জুড়াই। কিছু খয়রাত করি। দীন-দুঃখী, দৌলতবান, আজ আর কারো প্রতি পক্ষপাত নেই। দিলের চওড়া দরজা খুলে দিলুম, সবাইকেই মোবারকবাদ জানাই।

বাজার

একে বাইরে এই গরম। বিরাট এক চব্বিশ-নম্বুরে কড়াইএ পূরে রোদের জ্বালে যেন সব্বাইকে আল্টা-পাল্টা সাঁতলাচ্ছে, তার ওপর মশাই বাজারের জিনিস, সে তো আবার তারে বাড়া, তার কাছে এই চনচনে রোদ্দুরও ঠাণ্ডা মেরে যায়। সূর্য্যের গায়ে তবু হাত ঠেকানো যায় কিন্তু আনাজপাতির কাছে যান আপনার সাধ্যি কি?

অথচ বাজারে ঢুকতে না ঢুকতেই কান পাংচার হয়ে যায় যায় আর কি! লে চচকাচ্চক, এই যে বাবু, চলে গেল বোম্বাই মেল, সস্তা এক্স-প্রেস। কি? না, ঝিঙে। কত দর? না, আট আনা সের। মারো ঝ্যাঁটা তোর সস্তার বোম্বাই মেলের মুখে। বলি ওহে, এই তোমার ঝিঙে? এত বুড়ো ঝিঙে পেকে ধুঁধুল হয়ে গেছে, অ্যাঁ! আর এই নিয়েই তড়পাচ্ছ? কচি, নরম, একদম রসগোল্লা, বাবু। ভাঙব? ভেঙে দেখাব?

থাক, আর বাহাদুরিতে কাজ নেই। শাক কত করে হে? চোদ্দ পয়সা। বল কি! জল দিয়ে দিয়ে তো বাপু টালার ট্যাঙ্ক করে রেখেছ। জল! জল কুথা গো বাছা। উ কথা বলনি। বলতে না বলতেই পাশের বালতিতে হাত চলে গেছে। আর ফিচ্ করে এক গণ্ডূষ জল এসে পড়ল শাকের ওপর। মাল দেখে মোনাসিব হলে তখন দরদাম। টানাটানি, হেঁচড়া-হেঁচড়ি। কাছায় গিঁট মেরে শক্ত হয়ে বসে আছে দোকানী। চোখ রাঙিয়েই হোক আর তুতিয়ে তাতিয়েই হোক কি করে এক-আধ পয়সা কমানো যায়, আপনার সেই চেষ্টা। অ্যাঁ, তুমি বলছ বারো আনা, আর ওই দিকে যে এগারো আনায় দিচ্ছে পটল। বলি দিন দুপুরে কি হাতে মাথা কাটবে? কেউ দেবে না বাবু, আজকের দরই হচ্ছে বারো আনা। তবে কি আমি মিথ্যে কথা বলছি? ভদ্রলোক

খেঁকিয়ে উঠলেন। আমি কি আজ নতুন এলাম বাজারে? ব্যাটা জোচ্চোর কোথাকার! দেখুন বাবু, মুখ সামলে কথা বলুন। চোপরাও বেয়াদব! তুমি লোক চেন না। এ-বাজারে বাস তোমার উঠিয়ে দেব। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। দেখুন দিকি মশাই, ছোট-লোকগুলোর আস্পদ্দা। আলুঅলা, পটলঅলা, তার চোখ-রাঙানিটা দেখলেন একবার! গরম বাজার পেয়ে টু পাইস্ কামাচ্ছে কিনা, ধরাকে সরা দেখছে এখন। কিন্তু এটা বুঝিস নে, আসলে তো ওদের জাত। তা সাঁতরাগাছিরই হও আর মাদ্রাজেরই হও; মূলে সব সমান। বাড়বাড়ন্ত যতই হোক, থাকবি সেই মাটির নিচেই। কি? কি হয়েছে দাদা, এত গোলটা কিসের? দেখুন দিকি মশাই ব্যাটাদের আস্পর্দা। দোকানী চেঁচিয়ে উঠল, কী তখন থেকে ব্যাটা-ব্যাটা কচ্ছেন, খুব তো রোয়াব নিচ্ছেন, আমি আপনার কাছ থেকে জবরদস্তি করে পয়সা ছিনিয়ে নিচ্ছি? আমার কথা বললাম, পোষায় লিবেন, না পোষায়, অন্য ঠাঁই যাবেন। খামোকা হুজুগ কচ্ছেন কেন? কি বাবু, অন্যেহ্য বলেছি কিছু? হ্যাঁ, মশাই, তাই করুন। পছন্দ না হয় অন্যত্র যান। গালমন্দ করাটা ঠিক হবে না। ডিমোক্রেসির যুগ, বুঝলেন না! প্রেস্টিজ পজিশন সবাইকারই বাঁচিয়ে চলতে হবে।

বাজারে ঢুকে শতকরা আশী জনেরই পা চলে আলুর দোকানে। আনাজপাতির দোকানীদের মধ্যে এরা একেবারে অভঙ্গ কুলীন। ওহে, দাও তো। কোন্‌টা বাবু? বড়টা দিই? খাস্ নৈনীতাল? না-না, মাঝারি দাও। একটু দেখে দিও হে, বড্ড পচা বেরুচ্ছে আজকাল। পচা কোথায় বাবু? আমার দোকানে পচা-টচা মিলবে না। সব বাছা আছে। কত দেব, আড়াই সের? না-না, আড়াই পো দাও। নিলেই খরচ। আড়াই পো নিলেও একদিন, আর সেই আড়াই সের নিলেও তাই। মেয়েমানুষ ভাল্লুকে হলে ফতুর হতে ক'দিন লাগে।

ওহে, মাপ-টাপগুলো একটু আলগা-টালগা দাও। যের'ম শুরু করেছ, এর পর দেখছি রতি মাষার মাপে আলু কিনতে হবে। বলতে না বলতেই পকেট থেকে ভদ্রলোক বের করলেন একশ' টাকার নোট। দোকানী একবার বাবুর দিকে চেয়ে বললে, খুচরো নেই? বাবু বললেন, তাহলে আর সাত তাড়াতাড়ি তোমার দোকানে আসব কেন? আলুর দোকানে

নোট ভাঙানো আমাদের 'বার্থ রাইট', জন্মগত অধিকার। বাপ-দাদার আমল থেকে এ-কারবার চলে আসছে। এ-রাজত্বিতে তো সব সুখই পানসে মেরে গেল, তুমি বাপু দয়া করে কাঁটার বিষে আঙুলের খোঁচা মের না। দোকানী বাক্যব্যয় বৃথা ভেবে নোটের টাকা গুনে দিলে। তারপর আরেক দিকে চেয়ে হাঁ-হাঁ করে উঠল। ওকি কচ্ছেন, নিচের আলু টানছেন কেন? পড়ে যাবে সব, পড়ে যাবে। রেখে দিন। কতটা চাই। আপনার? কি বল্লেন একপো? দোকানী মহা খাপ্পা হয়ে গেল। আরে মশাই, আপনি তো আচ্ছা ইয়ে, সেই যখন এসে দোকান খুলিছি, তখন থেকে আলু বাছা শুরু করছেন, আর এখন তিন ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল, তবু আপনার একপো আলু বাছা হল না! ওকি, আবার নখ দিয়ে খুঁচচ্ছেন কি? রাখুন রাখুন।

লোকটির ওপর এতক্ষণ পরে নজর দিলুম। এক টেরে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে আছে। মলিন মুখ। একমনে একটির পর একটি আলু তুলছে, নেড়ে চেড়ে বেশ করে দেখছে। কোথাও একটু দাগ দেখতে পেয়েছে কি নখ দিয়ে খুঁটে দেখছে। আবার আলুটি রেখে দিয়ে অন্য আলু নিচ্ছে। লোকটির কাছে এগিয়ে গেলুম। বললুম, কি, আলুগুলো ভালো নয়?

লোকটি আমার দিকে চাইলে। তারপর একটু বিব্রতভাবে বললে, মুশকিলটা হয়েছে সেইখানে। ভালো-মন্দ বাইরে থেকে ঠিক বোঝা যায় না। এরা তো আর কেটে দেবে না। তাই একটু দেখেশুনে নিতে হয়। সময় একটু লাগে, তা লাগুক। খাদ্য-খাদকের ব্যাপার। তড়িঘড়ি কাজ সারা ঠিক নয়। উনিশ-বিশ হলেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি। বললুম, তা ঠিক, দেখেশুনে নেওয়াই ভাল।

পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। মাছের বাজারে চট করে ঢোকে কার সাধ্যি, বিশেষ করে বারটা যদি ছুটির হয়। হৈ-চৈ আর গোলমালে কানের পর্দায় ঘাঁটা পড়ে যায়। বলছি ওজন ঠিক হয়নি। ভাল করে ধর, হ্যাঁ, আঙুলটা ছাড় ছাড়, ওকি! তোমাদের চালাকি আর বুঝতে বাকি নেই। ওই যে ওজনের দাঁড়িটি, যাবতীয় মারপ্যাঁচ ওইখেনে। এখন তো আর সেরকে সের নেই। চোদ্দ ছটাকে সের। নতুন করে ধারাপাত শিখতে হবে বাপু। নচেৎ আর গোলমাল থামবে না। তোমাদেরও অশান্তি, আমাদেরও অশান্তি। পাশ থেকে একজন বলে উঠলেন, তাহলেই কি অশান্তি কমবে ভাবছেন? ষোল ছটাক যে নিয়মে চোদ্দতে দাঁড়ায়, চোদ্দ কি সে নিয়ম ধরে আর একটু এগিয়ে বারোতে দাঁড়াতে পারে না? তাহলে বিহিত কি বলুন। এরা তো পাল্লা ঝুলিয়ে দিব্যি হিসেব গস্ত করে দিলে। কিন্তু বাড়িতে যে গিন্নী মুকিয়ে রয়েছেন দাঁড়ি-বাটখারা নিয়ে। ঠাকুর-চাকর বাজার কচ্ছিল। পাল্লাতে মাপ কম দেখে তাদের দিলে খারিজ করে। তারপর থেকে অষ্টপ্রহর খোঁচানি মশাই। নিজের বাজার নিজে করতে পার না তো কাছা খুলে কাপড় বেড় দিয়ে পর, কোঁচা খুলে ঘোমটা দাও, তারপর হেঁসেলে এসে ঢোক। লজ্জাও করে না! মদ্দ উঠে সকাল থেকে কাগজ মুখে পড়ে লইলেন। আর ওদিকে ঠাকুর-চাকর চেটেপুটে আখের গুছিয়ে নিলে। পয়সা মারে, ওজনে মারে, তা গতরখানা নড়িয়ে একবার দেখতেও তো পার। কত

লেকচার দিলুম মশাই বিশ্বাস যদি বিশ্বাসের মতো হয় তো চোরের সাধু বনতে ক'দিন লাগে। আসলে তোমাদের মনেই ঘুণ ধরা, অবিশ্বাস করা একটা বাতিক। আর সেই রি-অ্যাকশনের ফলে লেকচার মাঝ-পথেই থামল, গিন্নীর রক্তবর্ণ চক্ষু দেখে আমার ঠোঁট থেকে জয়-মা বলে কোথায় যে লাফ দিয়ে পড়ল হদিশ পেলুম না। তখন এক প্র্যাকটিক্যাল সাজেচশন দিলুম। বললুম, দাঁড়িপাল্লা কেনো। চাকর যাঁহাতক বাজার নিয়ে এসে দাঁড়াবে, অমনি তুমি তার সামনেই ওজন করে জিনিস ঘরে তুলবে। তাহলে এই চেকিং দেখে ওরা আর কিছু করতে ভরসা পাবে না। নিজেই উজ্জুগ করে সাহেব কোম্পানির থেকে ভাল দাঁড়িপাল্লা কিনে দিলুম। অন্তত তাতেও যদি বাজার করার বদারেশান থেকে রেহাই পাই। কিন্তু দাদা বলব কি, কী বংশই যে সেধে নিলুম, তা আমিই টের পাচ্ছি। দাঁড়িপাল্লা আনবার পর, সাতটা দিনও কাটল না, দু সেট ঠাকুর-চাকর বদলী হল। গিন্নী হেঁসেলে ঢুকলেন, বাধ্য হয়ে আমি এলাম বাজারে। আর মশাই, তারপর থেকে এক পার্মানেণ্ট অশান্তি। বাজারের এক সের, বাড়ির পাল্লায় চৌদ্দ ছটাকের ওপিঠে পৌঁছয় না। পাই-পয়সাটি অব্দি গিন্নির কাছে ধরে দিই। তবু হাত পেতে বলেন, আর কই? আর কই কি! গিন্নী মুচকি হেসে বলেন, পয়সা, ফিরতি পয়সা গো। মাছ আনতে বলেছিলুম আধ সের, এনেছ সাত ছটাক। বক্রী পয়সাটা ফেরৎ দাও! বাঃ, সাত ছটাক আবার কখন আনলুম, আধ সেরই তো এনেছি। দাঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, বিত্তেটা তাহলে মুনিবেরও

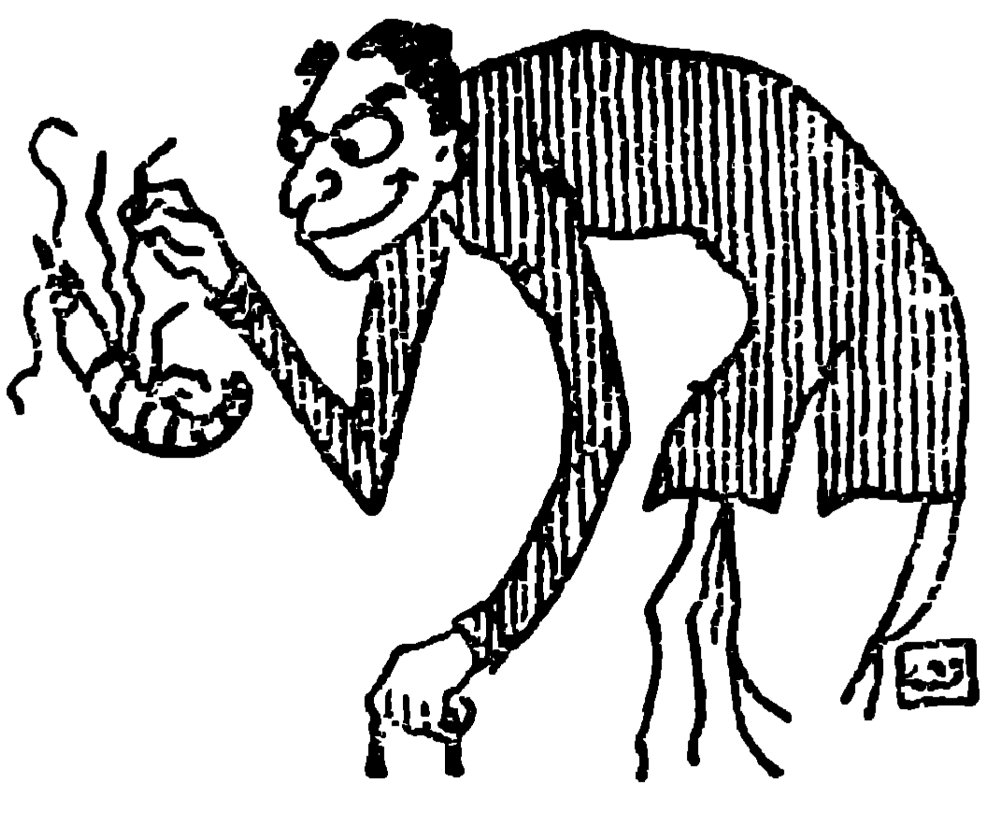

জানা, তবে আর মিথ্যে চাকর-বাকরকে দুষি কেন? বুঝুন, নিজের গিন্নীর কাছে নিজেই চোর হলুম। প্রত্যহ আর খিচখিচ কাঁহাতক ভাল লাগে।

তাই ধার করে মশাই, আর একটা দাঁড়ি আমিও কিনেছি, বন্ধুর বাড়িতে রেখেছি সেটা। এখান থেকে সটান যাব সেখানে। ওজন করবো, শর্ট পড়লে আবার তা কিনে নিয়ে তবে বাড়ি যাচ্ছি আজকাল। বেকসুর দিনের পর দিন গাঁট গচ্চা দিয়ে চলেছি। গিন্নীর কাছে তো আর এর জন্যে পয়সা চাইতে পারিনে। হাত-খরচ তো ছেড়েই দিয়েছি, টিফিনের পয়সাও বাজারের শর্ট মেকআপ করতে চলে যাচ্ছে। তাতেও কুলোয় না, সন্ধ্যেয় একটা টিউশনি নিয়ে তবে এখন নিশ্চিন্দি। জান যাবে যাক, তবু তো স্ত্রীর কাছে মানটা বজায় রেখেছি, সেই ঢের।

এক বন্ধু অনেক দুঃখে বলেছিলেন, পাঁচরকম তো লেখো-টেখো। তা একখানা 'সচিত্র দৈনিক বাজার-ক্রিয়াপদ্ধতি' গোছ কিছু একটা লিখতে পার না? পাঁচজনের উবগার হয় তাহলে। যদি পার, তাহলে কিন্তু একটা কাজের মতো কাজ হয়। গিন্নীর খিঁচুনিতে ভাই প্রাণ অস্থির হয়ে গেল। দেখ ভাই, কিছুতেই আর তোমার বউদির মনস্তুষ্টি হয় না। কি করি বল দিকিনি। সেদিন ইয়া বড় বড় আম কিনলুম। কেটে খাওয়ালে, ফার্স্ট ক্লাস, মোটে আঁশ নেই, নাম বললে ভূতো বোম্বাই না কি, একটু বেশি দাম দিয়েই কিনলুম, টাকায় ছটা, চার টাকার আম গিন্নীকে ক্রেডিট নেবার জন্য বললুম, দু টাকার। ওঁর মেজদা আবার নাকি এক নম্বর বাজার-করিয়ে। গিন্নী বেশ করে নেড়ে চেড়ে, শুঁকে, বঁটি দিয়ে কেটে এক চাকলা মুখে ফেলে, মেয়েকে ডেকে বললেন, পুঁটি, ঠাকুরকে দিয়ে আয়, অম্বল রাঁধবে। বললুম, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, ভূতো বোম্বাই দিয়ে অম্বল রাঁধবে! গিন্নী বাঁকা হাসি হেসে বললেন, বুড়ো হয়ে মরতে চললে, তবু গুল মারাটা ছাড়তে পারলে না। টাকায় বারোটা ভূতো বোম্বাই বিক্রী হয় শুনেছ কখনো, বলে মেজদাই সাতটা-আটটার বেশি আনতে পারে না। ভূতো তো নয়, গুঁতো বোম্বাই। খেয়ে দেখ না একবার। টকের গুঁতোয় বোম্বাই পালাতেই

হবে। খেয়ে দেখি, সত্যি। অথচ, জলজ্যান্ত একটা আম কেটে খাওয়ালে। একেবারে ম্যাজিক।

বাজার করার চাইতে বাজার দেখতে আমার ভালো লাগে। নিরিবিলি পেয়ে ছোকরাটাকে জিগ্যেস করলুম, দোকানটা কি তোমার নিজের? একগাল হেসে বললে, না বাবু, মাহাজনের। কথায় কথায় জমে গেলুম। বললে, এই বাজারে, নতুন জায়গা পাইবেন ক্যামনে। এই যে ছ্যাখতে আছেন জায়গাটুক, এই টুকুনের 'দান' দুই বেলা এক টাকা, এছাড়া ঝাড়ুদার-মেথরের তোলা আছে ডেলি দুই পয়সা। জিগ্যেস করলুম, দানটা কি বস্তু? বললে, মালিকের গরে (ঘরে) দেওন লাগে যে। এখন এই জায়গাটুকুর মতো একটা জায়গা নিতে গ্যালে সেলামী লাগব পাঁচ হাজার টাকা। ওই যে ছ্যাখেন না দরজার পাশে, ওই কাপড়ের দোকানটুক, ওইটা আগে আছিল মোছলমানের, অখন স্যানা নিছে এক হিন্দুস্থানী, সেলামী কত দিছে জানেন? সাত হাজার টাকা। ইচ্ছা তো করে এই বাজারে একখান আপন দোকান দিবার। কিন্তু কোমরেঁ জোর নাই। কাজ-কাম তো সবই শিখছি। মাহাজন তো টাকা দিয়াই খালাস। খরিদ-খরচ, কেনাবেচা বেবাক কামই তো আমি করি। মাহাজন আমারে খাইতে দেয়, আর বচ্ছরে দুইশ টাকা।

আরেকজন বলছিল, কী আর এমন থাকে, মেহনতের তুলনায় তেমন কিছুই না। বাপ-দাদার ব্যবসা, উঠলে কলঙ্ক, তাই মশাই ধূপ-ধূনো জ্বালিয়ে যাওয়া। কোনো গতিকে পাপক্ষয় আর কি। চাঅলা যাচ্ছিল। ডাকলে, এই চা দে, বাবুকেও দে। চায়ের গেলাসে মুখ ঠেকিয়েই গালাগাল দিয়ে উঠল, মারব শালা কোমরসই এক লাথি! 'এটা চা, না ঘোড়ার পেচ্ছাপ? হারামীর বাচ্চা, খালি জোচ্চুরি। ছোকরা গাল খেয়ে একটুও চটল না, হাসতে লাগল। বললে, লাও,

একটু চিনি লাও, চায়ে দোষ নাই, দার্জিলিং, একেবারে ফাস্ কেলাস। তা কি গো, কাজকম্ম একটা দাও। কেন, বেশ তো বেচছিস চা। ধুর! জম্মভর চা-ই বেচব? লিজের একটা উন্নতি-অবনতি কত্তে হবে না? তা হবে বৈকি। তবে, ও-শালা লেংড়ার দোকানে বয়গিরি করলে কিছু হবে না। বাজারে একটা জায়গা লিয়ে দাওনা গো, আলু-পটল বেচবো। ভাগ্ শালা, পরনে ট্যানা জোটাতে পারে না,

সামিয়ানার বায়না দিচ্ছে। টাকা ঢালতে পারবি? আটশ টাকা সেলামী লাগবে, কর্পোরেশনের লাইসিন পনের টাকা, মাল কেনবার টাকা, কোথায় পাবি? লটারীর টিকিট কিনেছি। সে টাকা আগে পেয়ে নে। তার পরে তড়পাস্ শালা।

মেছুনী বললে, যত অনাছিষ্টি বাবু। বল দিকিন, এটা কি একটা বিচার হল? সাড়ে এগারো আনা 'দান' দিয়েছি কাটা পোনার জন্যে, ভিস্তিকে দিয়েছি দু পয়সা। জল বয়ে দেয়, তাকে তো পয়সা দিতেই হবে। জমাদার-ঝাড়ুদারকেও দিন দু পয়সা তোলা দিতে হয়, তা দিতে হয় দিয়ে এসেছি, যা নিয়ম, তাতে আপত্য করব কেনে? কিন্তু বল তো বাবু, আজ ইলিশ মাছ এনেছি বলে অন্য রকম একটা আইন জারী হয়ে যাবে? বলি বাছা, তোমার বাবুকে গিয়ে বলগে যাও, নিজেই যেতুম, কিন্তু তাহলে দোকান দেখে কে? জায়গা তো আর কাটা পোনা বেচার থেকে বেশি নিইনি। সেই জায়গাটুকুতেই ইলিশ বেচছি, তার জন্যে দানে আবার হেরফের হয় কেন? বলি এক কুড়ি মাছে চোদ্দ পয়সা করে দান দিতে গেলে আমাদের কী থাকে, হ্যাঁগো বড়বেটা, বলনা গো! তা আমি কি করব বাপু, আমি কি মালিক? হুকুমের চাকর,

অডার হয়েছে, অডার শুনিয়ে গেলুম। মর্ মিনসে, আমার ভারী অডারঅলা এলেন, সর্ সর্ সরে যা সামনে থেকে, নইলে গায়ে দোব আঁশ-জল ছিটিয়ে। বেশ ঝগড়াটা জমে উঠেছে। লোকটি মুখ কাঁচুমাচু করে কেটে পড়বার ফাঁক খুঁজছে। যার যা খুশি চেল্লাচ্ছেঃ লাগ্ লাগ্ লেগে যা বিশরকম। চালা পানসি বেলঘরিয়া। ব্যোম কালী কলকাত্তাবালী। আরে কি হল, ও মাসী, এই যে বোম্বাই বোম্বাই, চলে গেল নীলামবালা। তাজা খান বাবু, তাজা।

হট্টগোলকে পাশ কাটিয়ে গেটের দিকে পা বাড়িয়েছি। দেখা হয়ে গেল আবার ভদ্রলোকটির সঙ্গে। এখনো তিনি একটার পর একটা আলু বেছে চলেছেন। আশ্চর্য লাগল আমার। এগিয়ে গেলুম। জিগ্যেস করলুম, কি দাদা, ভালো আলু মিলল? ভদ্রলোক আমার দিকে একবার চাইলেন, বললেন, একটু বেছেগুছে নিতে হয়। খাওয়ার জিনিস কিনা, একটু সাবধান হতে হয়। একটু থামলেন, তারপর প্রায় বিড়বিড় করেই বললেন, সেই আগে থেকেই যদি সাবধানটা হতাম।

আজকাল নিজেই বাজার করি। কিছুই আর কিনিনে বিশেষ। খাওয়া-দাওয়ার পাট তুলেই দিয়েছি। আর কে-ই বা আছে যে খাবে। বাজার-টাজার কত্তুম না তো নিজে, চাকর-বাকরের হাতেই ছিল সমস্ত ভার। গত ষষ্ঠীতেই বুঝলেন, জামাই-মেয়ে এল, মাত্তর দু মাস আগে বিয়ে দিয়েছি। জামাই যেমন দেখতে, তেমনি গুণে। ইঞ্জিনীয়ার ছেলে। খুব খেতে ভালোবাসতো। ঢালাও আয়োজন করলুম। আর তাইতেই হল কাল। কী জিনিস যে চাকর কিনলে! মেয়ে বার বার বললে,

বাবা তুমি বাজারে যাও। তা কোনদিন কোনো ঝামেলায় থাকিনি, বাজারে যাবার নামে জ্বর আসত, চাকরই গেল। তা কী জিনিস সে আনলে সেই জানে, ঠাকুর যে কী রাঁধলে ঠাকুরই জানে। ভোর রাত থেকে ভেদবমি। পরিবারকে পরিবার। ছ ঘণ্টা আগুপিছু মেয়ে-জামাই চলে গেল। জখম হয়ে বেঁচে রইলুম দুই বুড়ো-বুড়ী। ডাক্তার বললে, ফুড পয়জনিং। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন ভদ্রলোক, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, সেই থেকে বাজারের ভার আর কাউকে দিইনে। খাদ্যখাদক বেছে নেওয়াই ভাল। ভদ্রলোক আবার একটা আলু তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। চলে এলাম।

বাজারে আম

বেশ একটা মেয়েলী ছড়া আছে। পৌষে কুশি মাঘে বৌল, ফাল্গুনে গুটি, চৈত্রে কাটিকুটি, বৈশাখে ঝোল, জ্যৈষ্ঠে দুধের বাটি, আষাঢ়ে আদাড়ে আঁটি, শ্রাবণে—

আর শ্রাবণ পর্যন্ত গিয়ে কাজ নেই, আঁটির তত্ত্ব তোলা থাক। আমের তত্ত্বই বলি। আম আমাদের ন্যাশনাল ফ্রুট। বিদেশে চাহিদা যেমন বাড়ছে, ভয় হয় একদিন না দেশের তাবৎ আম কালাপানি পাড়ি

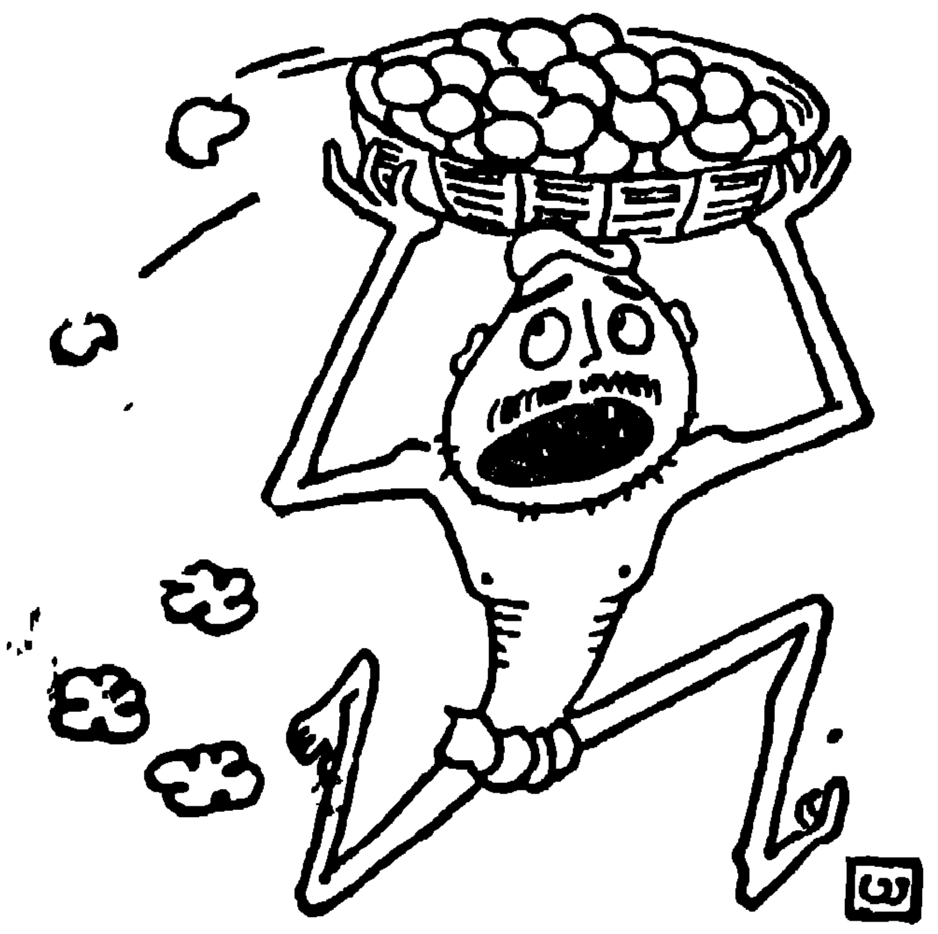

দিয়ে ডলার স্টার্লিং রোজগার করতে বিদেশের বাজারে যাত্রা শুরু করে। আম নিয়ে কালাপানির পারের দেশে আমার জ্ঞানত দুবার কেলেঙ্কারি হয়েছে। একবার রামায়ণে, হনুমান লঙ্কায় গিয়ে রাবণ-রাজার ল্যাংড়ার বাগানে ঢুকে একেবারে ভুট্টিনাশ করে ছেড়েছিল। সে গল্প তো ছেলে বুড়ো সবাই জানে। আম নিয়ে আর কেলেঙ্কারি করেছিলেন বার্নার্ড শ। তার অবিশ্যি কায়দাটা অন্য। পণ্ডিত নেহরু একবার আমের টাইমে লণ্ডন যাবার সময় কয়েক ঝুড়ি আম নিয়ে গিয়েছিলেন। বার্নার্ড শ-এর সঙ্গে মোলাকাৎ করে তাঁকে তো এক ঝুড়ি সরেশ ফল চাখবার জন্যে দিয়ে এলেন। দুদিন বাদে দেখা হতেই একগাল হেসে পণ্ডিতজী শুধুলেন, মহাশয়ের কেমন লাগল ফলগুলো? শ' বললেন, সবুর, বলছি। বলেই হাঁক পাড়লেন বাবুর্চিকে। বাবুর্চি এল, শুধুলেন, কি হে, ফলগুলো যে দিলাম, তা কেমন খেলে বাপু? একগাল হেসে বাবুর্চি বললে, ফাস্ কেলাস্। আছে নাকি আরো?

শ' বললেন, কি হে ছোকরা, পেলে তো সার্টিফিকেট? কিছু মনে কোরো না, এই শেষ বয়সে নতুন এক্স্পেরিমেণ্ট করতে সাহসে কুলোয় নি। তাই ও ব্যাটাকেই দিয়েছিলুম টুকরিটা।

আমের নামে শ' হয়ত 'শক্' পেতেন, কিন্তু বাঙালীদের জিভ্ যে সক্সক্ করে, পড়ি কি মরি তাঁরা যে বাজারে ছোটেন সে তো চোখের সামনেই দেখি। বসে বসে দেখছিলুম তাই। কদিন ধরে কী গরমটাই পড়েছে! সূর্য এমন চটা চটেছেন যে থেকে থেকে মুঠোভর রোদের গুঁড়ো সামনের বিরাট পাত্র থেকে তুলে নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন। গোল মরিচের গুঁড়ো এসে যেন আমাদের চোখে ঢুকছে, যন্ত্রণাটা মালুম হচ্ছে তেমন। প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি। কিন্তু আমের বাজার সমান চালু। মেম আসছে, মারোয়াড়ী আসছে, বাঙালী, মাদ্রাজী বাদ আর কেউ নেই।

আড়তদার বললেন, আম খায় না কে? সাহেব বিবিরা ল্যাংড়া পেলে আর কিছু ছোঁবেই না। ল্যাংড়া ধ্যান ল্যাংড়া জ্ঞান, ল্যাংড়াই ওদের সার। অবিশ্যি ল্যাংড়া সবারই পেয়ারের। কিন্তু মজা দেখুন, মারোয়াড়ীরা বাজারে এসে আগেই খুঁজবে আলফান্সো। এ মুলুকের আম নয়, কোইম্বাটুর, বোম্বাই ওই সব তল্লাটে জন্মায়।

বড় বড় গাড়ি করে শেঠের-পোরা নামবেন সব। তারপর মুখ খুলেই শুধুবেন, হাপুস হ্যায়? লাও দো টুকরি। আলফান্সো আমকেই এখানকার বাজারে হাপুস বলে। পেলেন তো উত্তম, নইলে সেকেন্ অর্ডার গেল, আচ্ছা বোম্বাই মিলে গা? খাস বোম্বাই মিলবে? মিলবে না কেন শেঠজী, তাহলে আর আছি কেন এখানে। তবে হিমসাগরটা একবার দেখলে হত না? হিমসাগর! আরে, রামজী তেরা ভালা করে,

দো ভাই, দো চার টুকরি দে দো। দিয়ে দাও ভাই, হিমসাগর পেলে আর কি কথা। তবে হ্যাঁ, সাইজগুলো যেন বেশ চোখে লাগার মতো হয়।

মারোয়াড়ীদের ওই ব্যাপার। হিমসাগর না পেলে তখন দেখ বোম্বাই, তাও যখন মিলছে না সুবিধে মতো, তখন ক্ষমা ঘেন্না করে ল্যাংড়াই হয়ত নিলে এক টুকরি। তবে বলিহারি আম খায় বটে মাদ্রাজী। কী যে ওদের পছন্দ ঈশ্বরই জানেন। এই যে দেখছেন সব পুষ্টু পুষ্টু আম, কী ফ্লেভার, কী রং, কী স্বাদ! আমের আর এক নাম যে 'অবের্ত' (অমৃত) ফল, তা সে নামটা কি আর বে-ফজুল দেওয়া হয়েছে। তেমন তেমন আম হলে এক চাকলা জিভে দিতে না দিতেই প্রাণ তর্‌র্ হয়ে যায়। তা মাদ্রাজীদের মশাই সেদিকে নজর নেই একটি ফোঁটা, বাজারে এসেই খুঁজে পেতে বেছে বেছে রাম-টক আম সব বের করবে, তারপর সেগুলো কিনে ঘরমুখো রওনা। আর টকও কি একটু আধটু না কি? গাই-এর কাছ দিয়ে নিয়ে গেলে বাঁট দিয়ে আর দুধ বেরুবে না মশাই, গুচ্চের চিনি খাইয়ে সে সময় যদি দুইয়ে নিতে পারেন তো বিনা পরিশ্রমে একেবারে চিনিপাতা দই পেয়ে যাবেন। মিষ্টি আম যেন ওদের ভাসুর।

হ্যাঁ এসব দিক দিয়ে বাঙালী। সত্যিকারের 'আম-ঈটার' বটে। সর্বজীবে দয়া। আঁটির কি কলমের, বোম্বাই কি চিনিটোরা, ফজলী কি মধুকুলকুলি, মিষ্টি কি টক কি পানসে, কিচ্ছু বাছ-বিচার নেই, আম আম হলেই হল, টপাটপ পেটে পুরে শান্তি। নইলে বুঝছেন না, ভারতের প্রায় সর্বত্রই তো আম জন্মায়, কিন্তু কলকাতার মতো এত বড় বাজার আর কোথাও নেই। একজন দুজন নয়, ষাট হাজার লোক শুধু এই কাজেই লেগে রয়েছে।

কথাবার্তায় বাধা পড়ল। এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে

পড়লেন আড়তদারের ঘরে। চোখাচোখি হতেই হৈ হৈ করে উঠলেন, কী আমই দিয়েছিলে ভায়া ! একটা যদি মুখে তুলতে পেরেছি। সব কটা কাঁচা। একবার যেও বাড়িমুখো। তোমার শ্যালিকাটি একেবারে রণচণ্ডী সেজে বসে আছেন।

আড়তদার হাঁক পাড়লেন, বুধুয়া ! গুটি গুটি বুধুয়া এসে দাঁড়াল। মুখভরা একগাল হাসি। কি রে ব্যাটা, কাল এই বাবুকে কী আম দিইছিস ? কেন বেশ সরেশ আম দিয়েছি। আপনার কথা মতোই দিয়েছি। কোন্ গুদাম থেকে ? দুনম্বর। একটু চুপ করে গেলেন আড়তদার। তারপর বললেন, ঠিক হয়েছে। কি আর বলব দাদা, সবই গেরো। ফার্স্ট ক্লাশ আমই আপনাকে দেওয়া হয়েছিল। ল্যাংড়ার এই ভ্যারাইটি বাজারে পাওয়াই যায় না। চল্লিশ টুকরি এসেছিল, সব কটিই পরিচিত লোকদের ডেকে ডেকে দিয়েছি। সবই হয়েছিল, একটুর জন্যে সব বরবাদ হয়ে গেল। আচ্ছা দাঁড়ান, দেখি। আপনাদের তো আর কিছুতে তর সইতে চায় না।

ডাক শুনে বুধুয়া এসে দাঁড়াল। আড়তদার খাতা খুলে দেখে বললেন, রামধারীর ঘরে যা। বল্ গে, পরশু আমার কাছ থেকে ল্যাংড়ার যে টুকরি কটা নিয়ে গেছে, বিক্রি না হয়ে থাকলে এক টুকরি নিয়ে আয়। বলবি যে বাজার দরই দেবো, নইলে ব্যাটা দিতে চাইবে না। বুধুয়া চলে গেল। ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললেন, একটু যদি ধৈর্য ধরে পাকাতেন তো দেখতেন যে কি চীজ দিয়েছিলাম কত সস্তায়। কত, ন টাকায় দিয়েছিলাম না টুকরি ? এখন দেখুন সেই টুকরিই কত দিয়ে কিনতে হয়। সেরেফ দুটো দিন যদি কম্বল চাপা দিয়ে রেখে দিতেন টুকরিটা, কিছুই না নিচে একখানা গরম কম্বল ভাঁজ করে, তার ওপর টুকরিটা রেখে আর একখানা কম্বল দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলেই হত, আজ দেখতেন গন্ধে ঘরখানা ভরে উঠত।

বুধুয়া এক টুকরি আম নিয়ে এল। ঝুড়ি খুলতেই পাতার ফাঁক থেকে টুকটুকে ল্যাংড়াগুলো মিচকি মিচকি হাসতে শুরু করলে। ভদ্রলোক তো মহাখুশি। আড়তদার বললেন, 'সেম্' জিনিষ। অথচ —কি রে, কত চাইলে? তের টাকা? দেখলেন, আমারই বেচা মাল, আমাকেই আবার চড়া দামে কিনতে হচ্ছে।

ভদ্রলোক চলে যেতেই আবার গল্পগুজব শুরু করলুম। বললেন, বারো মাসই প্রায় কলকাতার বাজারে আম পাবেন। তবে 'অফ্ সিজিন' এর আম সে মশাই ফিলিমের বিবি। দেখতে শুনতেই যা ছিমছাম, দূর থেকে জেল্লা মারে, তৃপ্তি পাওয়া যায় না। যে সময়ের যা, সিজিনকালের আমের চেহারা অন্য রকম। আর মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে সেই যে আম আসতে শুরু করে, শেষ হতে আগস্ট মাস। বাজারে আম পাঠিয়ে বউনি করে কাল্লিকট। মার্চেই কাল্লিকটের আম

কলকাতার বাজারে এসে ঝাঁটপাট ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে দোকানের ঝাঁপ খুলে বসেন। তারপর দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে কোইম্বাটুরী, পাইরী, হাপুস, সবেদা, গোলাপখাসা, বেগুনফুলী, তোতাপুরী আসতে শুরু করেন। দেখে বাঙলা বিহারে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। বাংলার সরেশ আম হিমসাগর, বিহার বারাণসীর ল্যাংড়া, বোম্বাইএর আলফান্সো। বাজারে পড়তে না পড়তেই সরগরম। মেওয়াবাজার ভরাভরন্ত। ক্যায়া ভাও? এই টুকরিতে কত আম আছে? ভসাভস ট্যাক্সি করে মেম আসছেন, সাহেব আসছেন, দেশ বিদেশের লোক মেয়েলোকে আমের বাজার থক-থক করছে। জুন মাস আমের মাস। জুন শেষ হতে হতেই তেজের সূতোয় ঢিলে পড়ে। এতদিন ধরে মালদা এক কোণায় ঘাপটি মেরে

শুধু ছোকরাদের তড়পানি দেখছিল। আর মিচকি মিচকি হেসে ছটাকী আমেদের লাফঝাঁপ করবার সুযোগ দিচ্ছিল। যেই দেখলে ওদের দম ফুরিয়ে এসেছে, ঝপাঝপ পাঠাতে শুরু করলে ফজলী। হ্যাঁ, আম বটে ফজলী, বাপ্ কী সাইজ একখান, একটাকে কায়দা করতেই ঘাম বেরিয়ে যায়। ফজলী আম গেরস্থদের খুব আদরের। গুষ্টিপোষানী কিনা। যোগাযোগে একটা কিনে নাও, একপিঠ নিজেরা খাও, অন্য পিঠ বেয়ানবাড়ি পাঠাও, আঁটিটুকু চাকর-বাকরকে দাও, ছিটেফোঁটা যা লেগে থাকবে, তাই খেলেই ঢেকুর উঠবে—হে-উ। ফজলী আমের সঙ্গে সঙ্গেই আমের বাজারের অন্ত্য শেষ রজনী। তাই কি? আরে দাঁড়াও। আরে, ওই যে ফরাসের পাশে ট্যাম ট্যাম করছে, ওটা কে? লজ্জায়

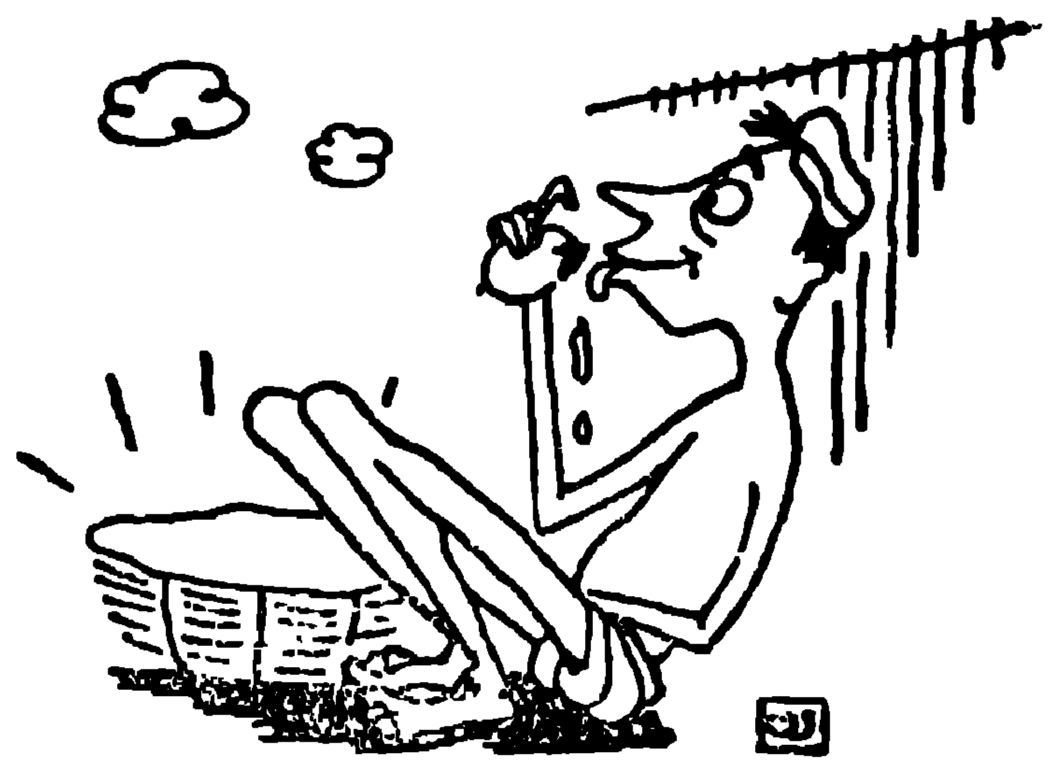

পড়ে গেল বেচারা। নেমন্তন্ন ছিল দুপুরের, গড়িমসি করে এসে যখন পৌঁছুলো, তখন ঝি-চাকরের অব্দি খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেছে। তাই লজ্জায় বেচারা অধোবদন হয়ে, নখ দিয়ে মেঝেতে আঁকিবুকি কাটছে। কি করতে কত্তা ইদিকে আবার এসেছিলেন। দেখেই চীৎকার করে উঠলেন, আরে এসেছ তাহলে, এস, এস, আমি আরো ভাবছিলুম—

কত্তার হাঁকডাকে সবার দৃষ্টি আবার পড়ল। তখন আবার ওকে নিয়ে সব্বায়ের টানাটানি। এঁর নাম কাঞ্চন। কালো কোলো চেহারা। আম্রকুলের ইনি কনিষ্ঠ সন্তান। ভাঙাহাটেই এঁর আসর। আগস্টের মাঝামাঝি এঁর আগমন। ইনি আসবেন, ‘ক্লোজিং সঙ্’ গাইবেন—

ভাঙল আমার খেলা
সাঙ্গ আমার বেলা।
যাই গো এবার, যাই!

মাটিয়া কালেজ

আমাদের এই গবরমেণ্ট যা একখানা হয়েছে না মশাই, কি বলবো, যেন ছাঁকা তেলের মালপো। শুধু এই দেখতেই যা চেকনাই। তুলে পেটে পুরেছেন কি যন্তন্নায় বাপ-ঠাকুর্দার টনক নড়ে উঠবে। আসল কাজের কাজী নন, আন কামের পরামাণিক সব। দিলি তো বাপু এক-কথায় লেক হাসপাতাল তুলে। কী, না টাকা নেই। আবার সোহাগ করে বলা হল, লেক হাসপাতাল তুললুম বটে, কিন্তু অন্য হাসপাতালে সীটও তো দিলুম বাড়িয়ে। সে যে কী বাড়ান বাড়িয়েছেন, দেবা না জানন্তি, আমরা মনিষ্যিরা তো গেরাজ্জির বাইরেই।

বুঝলুম, বৃদ্ধ খুব চটেছেন। চটবার কারণ যে নেই তা বলি কি করে। ক-দিন থেকে পড়াশুনো করতে পারছি নে, চোখ দুটো বাগড়া দিচ্ছে, ভাবলুম একটু দেখিয়ে আসি। গেলুম হাসপাতালে। হাসপাতালের আউটডোরে চিকিচ্ছে করাতে আসা মানেই ওয়েটিং লিস্টের মালগাড়িতে চাপা, ধিকিস্ ধিকিস্ চলছে তো চলছেই, সাত মাইলের এক ইস্টিশানে পৌঁছুতেই নিদেনপক্ষে সাতটি মাস। দুদিন ধরে এলাম, আউটডোরের অপেক্ষা-আগারে বসতে বসতেই বৃদ্ধটির সঙ্গে আলাপ হল।

বলি রাগটা হয় কি সাধে, বৃদ্ধটি সমর্থনের আশায় আমার দিকে চাইতেই আমি মাথা নেড়ে সায় দিলুম। বলুন দিকি মশাই, সেই কখন এইছি, আমের আঁটি পুঁতে দিলে গাছ হয়ে এতক্ষণে সেই গাছের আম পেকে গন্ধ ছাড়ত, আর কি না এই বেঞ্চি থেকে উঠতেই পারলুম না! কালকের মতো সারাক্ষণ বসিয়ে রেখে আবার না বলে বসে, 'কাল আসবেন।' অবিশ্যি ভিড় একটু হয়, তা এই কটা লোক দিয়ে ম্যানেজ করতে না পারিস, লোক রাখ্ আরো।

পাশ থেকে একজন ফোঁস করে উঠলেন, কি বললেন! লোক রাখবে আরো! বলি দাদা, কোন্ স্বগগে বাস করেন? কাগজ-টাগজ পড়েন? লোক রাখা তো অনেক দূরের রাস্তা মশাই, যা লোক আছে

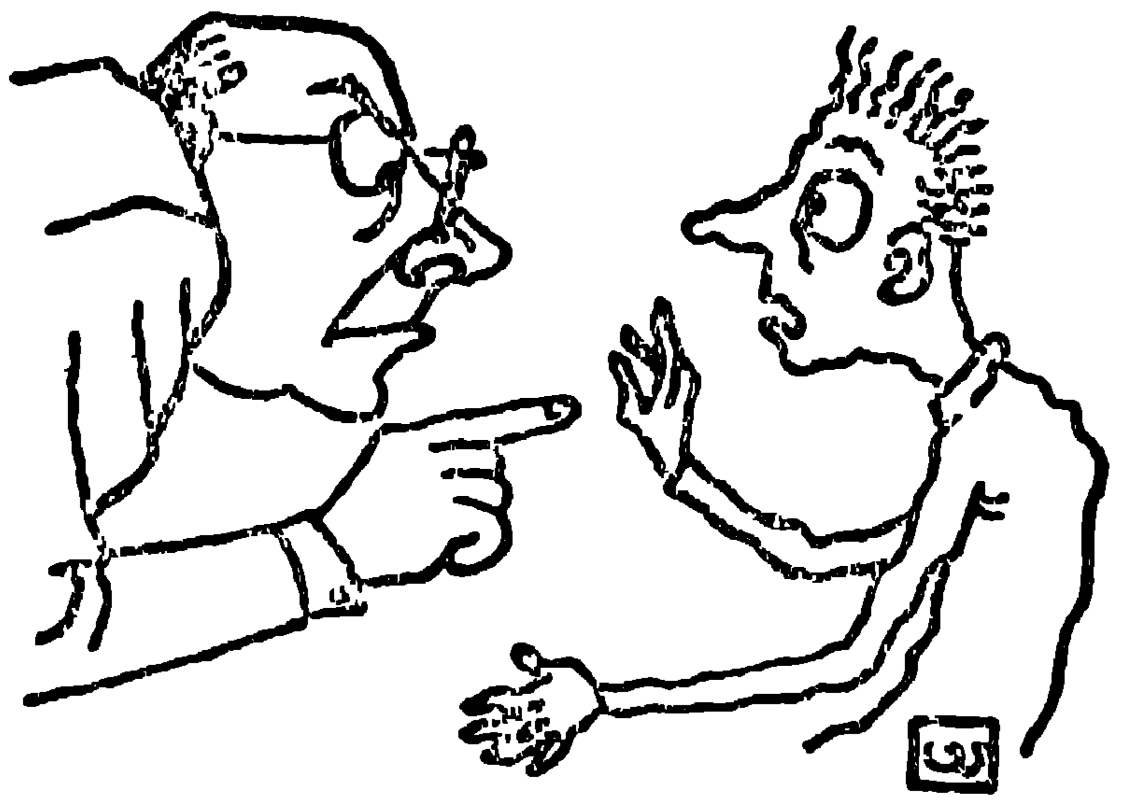

তাই কমিয়ে দিচ্ছে,এই নিয়ে তুমুল বেধে গেছে ডাক্তারদের সঙ্গে আর কর্ত্তাব্যক্তিদের সঙ্গে। আমার এক মেসো এখানকার অনাহারী ভিজিটিং সার্জন কিনা, তাই তো জানি ব্যাপারটা। ট্যাঁক থেকে তো আধ-লাটিও খসাতে হয় না হাসপাতালের, গাঁটের কড়ি খরচা করে ওঁরা এসে রুগী দেখে যাবেন, তাও সহ্য হল না, দিচ্ছে অনারারী ভিজিটিং ডাক্তারদের ন্যাতা মেরে। ও-পাটই তুলে দিচ্ছে গভর্ণমেণ্ট। এই যে দেখছেন, এই সব বাইরের রোগী—রোজ কত আসে জানেন? সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার। সব নিয়ে ছাপ্পান্ন জন ডাক্তার আছেন এখেনে, তাও আবার বেশির ভাগ অনাহারী।

মাইনে-করা তো মাত্র দশজন, বাদবাকী সব ..কোটিয়া। এক একজন ডাক্তারকে কমপক্ষে ষাটটে রোগী তো দেখতেই হয় ডেলি। সাধে সাধে কি আর আমাদের শিরদাঁড়া টাটায় মশাই। হেতু আছে বৈকি। হেত্বর্থে এখন তো কেবল পঞ্চমী। পাঁচ দিনেই পার পাচ্ছেন। কিন্তু এখনই হয়েছে কি, সুখের দিন তো সামনে, তখন এক মাসে পার পান তো আপনার মহাপুণ্যি। গবরমেণ্টের হাসপাতাল, তার নিয়মেই চলবে তো। আর নিয়ম যাঁরা করেন, তাঁরা তো হবুচাঁদ রাজার ভায়রা-ভাই সব। ছাপ্পান্নটা ডাক্তারে যেখানে থই পাচ্ছে না, সেখানে ডাক্তারের সংখ্যা কমিয়ে ছত্রিশ জনে ঠেকাচ্ছেন। সেদিনের ছবিটি একবার দেখতে চেষ্টা করুন দিকি, আপনার চোখ আপনিই পরিষ্কার হয়ে যাবে, ডাক্তার-

ঝক্কি কিছু লাগবে না। আমি এক নতুন ডিক্‌শনারি লিখছি, বুঝলেন, রাজনীতি-টিতিগুলো ছেলেপুলেদের একটু শিখিয়ে রাখা ভালো। তা গবরমেণ্টের মানে আমি লিখেছি ঃ ইহা একটি যন্ত্র। এই যন্ত্র জীবন্ত। ইহার সহস্রটি চক্ষু আছে। সেই চক্ষু সতত পাবলিকের কোমল স্থানের সন্ধানে ফিরিতেছে। ইহার সহস্রটি নখ আছে। সেই নখ সর্বদা পাবলিকের সেই কোমল স্থানগুলিতে চিমটি কাটিতেছে।—কি, ঠিক কিনা, সেই তালে ঘুরছে কিনা বলুন তো ?

ভদ্রলোক কথাগুলো বলেছেন ভেবে দেখবার মতো। এমনিতেই এই ডাক্তার নিয়েই তো রোগী সামলাতে পারা যায় না। আর রোগীও যা দেখেন একেবারে ভগার নামে। সিলিপ-টিলিপ কেটে বসতে বসতে এক ঘণ্টা। ডাক্তারের কাছে ডাক আসতে আরো এক ঘণ্টা। ততক্ষণে সে রোগ ভালো হয়ে অন্য আরেকটা রোগ শরীরের জমিনে নতুন কোঠার ভিৎ কাটতে লেগে গেছে। আর কী ওষুধ দেয় মশাই, একেবারে জলবত্তরলম্।

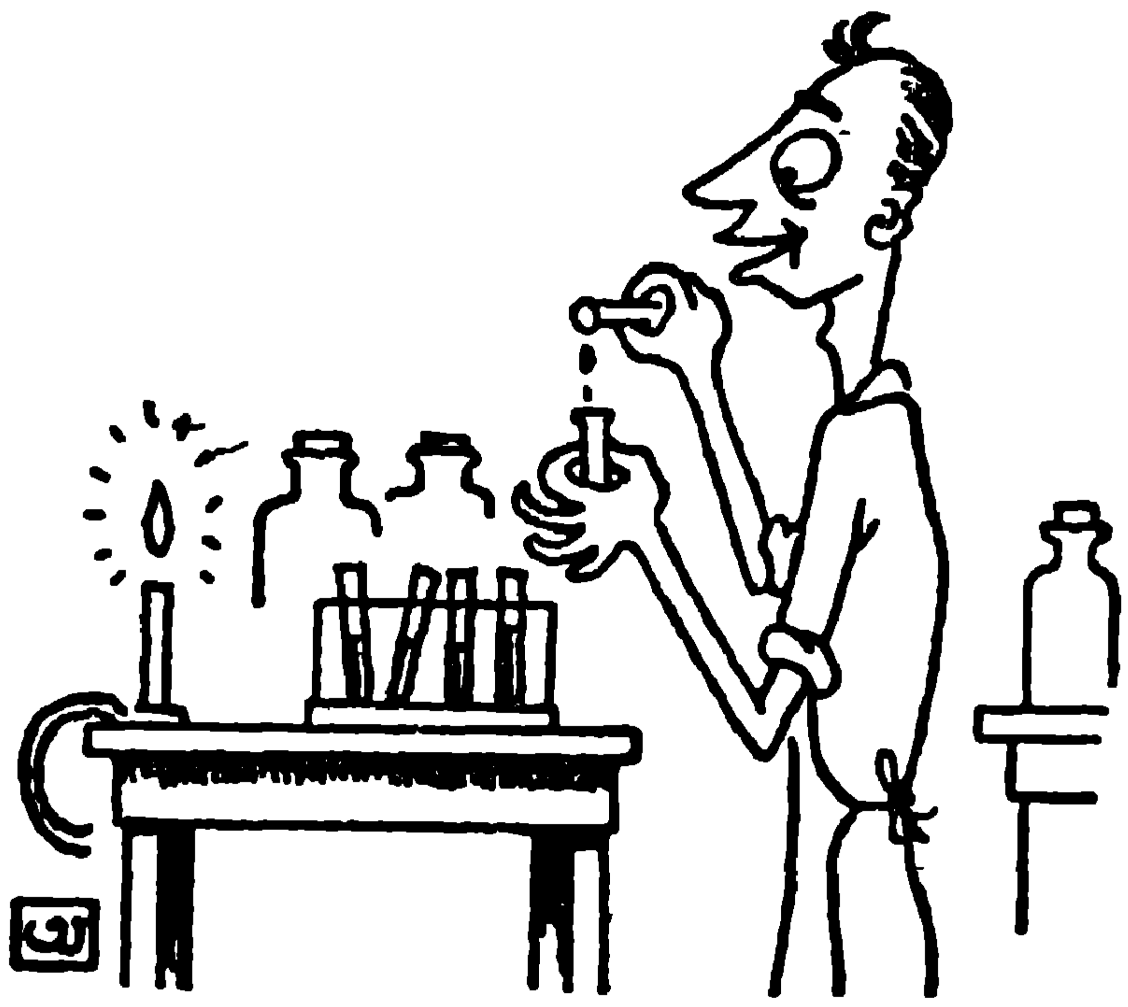

হাসপাতালে এসেছেন রামবাবু। ডায়েবিটিসের চিকিৎসা করাতে। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করবার জন্য নিয়ে যেতে ইউরিনের বোতলটি নার্সের হাত ফস্কে পড়ে ভেঙে চুরচুর। নার্স আর কি করে, হাতের কাছে পেল ফিমেল ওয়ার্ড। সেখান থেকে একটি বোতল নিয়ে ল্যাবরেটরীতে দিয়ে এল। পরীক্ষার রিপোর্ট বেরুলো। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার লিখলেন, প্রেগনেন্‌সি, জেনারেল কণ্ডিশন গুড, অ্যাডভাইস কেয়ারফুল অ্যাটেনশন। অর্থাৎ, পোয়াতী, স্বাস্থ্য ভালোই, যত্ন-

আত্যিতে রাখা হোক ? পড়ে তো রামবাবুর চক্ষু চড়কগাছ। ছুটলেন ডাক্তারের কাছে। লজ্জায় লজ্জায় বলে ফেললেন, এ রিপোর্ট ভুল, একটু ভালো করে দেখলে হত না স্তর ? ডাক্তার তো খচে ব্যোম। বললেন, আপনার পছন্দমতো তো আর প্রেসক্রিপশন বানাতে পারিনে মশাই, যা পেয়েছি রিপোর্টে তারই ব্যবস্থাপত্র দিয়েছি। দয়া করে এবার সরে পড়ুন দেখি, কাজকর্ম্ম করতে দিন।

এই তো সব চিকিচ্ছের বহর। ভেবে-চিন্তে কাজ করবে, তার যেমন অবসরও নেই, সত্যি বলতে কি, ততটুকু আন্তবিকতাও যেন আজকাল নেই। রোগীরা তো ডাক্তারের কাছে মানুষ নয়, ওরা হল এক-একটা 'কেস'।

বসে বসে গল্পগুজোব করছি। চেঁচামেচিতে সেদিকে চোখ পড়ল। একটা ছোট্ট ছেলেকে কোলে নিয়ে দুজন লোক ঢুকল। যন্ত্রণায় চীৎকার করে কাঁদছে ছেলেটি। চোখে কি-একটা হয়েছে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেই ছাত্তরগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ডাক্তারবাবু খুশি হয়ে বললেন, বাঃ কেসটা বেশ ইনটারেস্টিং তো, ওহে দেখে যাও তোমরা। ব্যস্, চোখটি নিয়ে শুরু হল লুডো খেলা। ছেলেটা চিৎকার করে চলল, চোখের যন্ত্রণা যম-যন্ত্রণারই সমান তো। ডাক্তারটি নির্বিকারচিত্তে উদাহরণ সহযোগে এক সতের-শ'-ষাট গজী লেকচার শুরু করলেন চোখের ব্যামোর রোগলক্ষণ সম্পর্কে। আর ওই রাবণের গুষ্ঠী ছাত্তররা হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তারপর একের পর এক চোখ টিপে ভুরু টেনে ছেলেটার পৌনে বারোটা বাজিয়ে ক্ষান্ত দিলে। তিন কোয়ার্টার পর ডাক্তার মশাইয়ের কি খেয়াল হল, সিলিপ দিয়ে বললেন, পাশের ঘরে নিয়ে যাও।

আরেকবার কি হয়েছিল বলি। নামকরা এক সার্জন। পেটজোড়া এক পিলে অস্তর করবেন। সবই হল, কিন্তু তাড়াতাড়িতে একটা

প্রধান নাড়ী ছুরির খোঁচায় পাংচার। রোগী তখনো টেবিলে। গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে ফিনকি দিয়ে। বন্ধ করে কার সাধ্যি। টেবিলে রোগী মরলে সার্জনের নামে ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে। সার্জন নার্সকে বললেন, তোয়ালে আন। নার্স এক বিরাট টার্কিশ তোয়ালে আনলে, গুঁজে রক্ত বন্ধ করা হল। সার্জন বললেন, পেশেণ্টকে নামাও। নামাবার সময় পেশেণ্ট উঃ করে উঠল। যাক, বেঁচে আছে এখনো। সার্জনের ঘাড় থেকে দায়িত্বের বোঝা নামল। বেশ লক্ষ্মী পেশেণ্ট। খুশি মনে তিনি সহকারীদের বললেন, নাউ হি ক্যান ডাই সেফ্‌লি। আরাম করে মরুক ব্যাচারা।

ভদ্রলোক বললেন, এ-সব মেসোর কাছ থেকেই শোনা। মেডিকেল কলেজের কাণ্ড-কাহিনী শুনলে হাঁ হয়ে যেতে হয়। ওঁরা তখন স্টুডেণ্ট, এটা তখনকার কথা। মেসোর এক প্রোফেসর ছিলেন, একটু ক্ষ্যাপা কছমের, ক্ষ্যাপা না হলে কেউ রোগীর জন্যে প্রাণপাত করে? যাহোক একটা নতুন ধরনের রোগী পেয়ে ওঁরা তো নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিলেন, যমে-মানুষে টানাটানি চলল। কিন্তু টাগ অব ওয়ারে যম চিরদিনই চ্যাম্পিয়ন, এক হ্যাঁচকা টানেই রোগীর কম্ম সাবড়ে দিলে। প্রোফেসর উঠলেন ক্ষেপে। পেয়ারের ছাত্তরকে বললেন, গজেন, এ অসম্ভব, মরবার রোগী নয়, শাস্ত্রমতে নির্ভুল চিকিৎসা করেছি, তবু যে রোগী মরতে পারে না, সে মরলো কেন? মেসো বললেন, জবাব দেওয়া শক্ত স্যর। দুজনে ভেবে আর কুলকিনারা পান না কিছু। পরদিন হঠাৎ প্রোফেসারের কি খেয়াল হল, বললেন, ময়না করব। সে কি স্যর, মেসো বললেন, পেশেণ্টের আত্মীয়স্বজন এসে গেছে, ওরা বাঁধা-ছাঁদা করছে, এখনই মুর্দা নিয়ে যাবে। কিন্তু প্রোফেসর কিছুতেই বুঝ মানবেন না। এনি হাউ তোমাকে ব্যবস্থা কত্তেই হবে। আমি দেখতে চাই, কি কারণে এমনটি ঘটল, কেন এত সতর্কতা সত্ত্বেও পেশেণ্ট বাঁচলো না।

মেসো আর কি করেন, গিয়ে দেখেন ওদের লোকজন এসে মুর্দাটা নামাচ্ছে। ডোমকে বললেন, এই, মুর্দা তুলে নিয়ে আয়। আর ওর আত্মীয়দের বললেন, একটু 'ওয়েট' করুন, ওকে নিতে একটু দেরি হবে। ওর পেটে হাসপাতালের কিছু সরকারী যন্ত্রপাতি আছে, বের করে নিতে হবে। মেসো তো এই সব ঝেড়ে মুর্দাকে ফের ময়নার টেবিলে চাপালে, তারপর ঝটপট ইনটেসটাইনটা বের করে নিয়ে কাঁচের বয়ামে রেখে পেট সেলাই করে মুর্দা ছেড়ে দিলে।

বললেন যদি, তবে একটা মজার গল্প শুনুন বলি, হাসপাতালের গল্প। তরাসে কেমন রোগী টেঁসে যায়। একজনের পেট অপারেশন হয়েছে। পেশেন্টকে ওয়ার্ডে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সকালে অস্তর হয়েছে, বিকেল নাগাত রোগী একটু চাঙ্গা হলেন। দুপাশের বেডে আরো দুজন ছিলেন। ওপাশের জন জিগ্যেস করলেন, কেমন? রোগী হেসে জবাব দিলেন, ভালোই। তা এত থাকতে মশাই, শেষকালে এই হাসপাতালে এলেন? কেন, আর কি কোথাও জায়গা পেলেন না? এ হাসপাতাল খারাপ কিসে? এমন একজন নামকরা সার্জন আছেন। ওই তো হয়েছে মশাই কাজের ঘোলা। অবিশ্যি সার্জন খুবই নামকরা সন্দেহ নেই, এতদ্দেশে আর ওঁর জুড়ি মেলাতে পারবেন না। তবে কিনা বয়েস তো যথেষ্ট হয়েছে, কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি ঘটছে আজকাল, বয়েসের যা দোষ। কি রকম, কি রকম? আর বলেন কেন, এই আমার অপারেশনের সময়, অপারেশন-টপারেশন তো হল, সত্য জ্ঞান হয়েছে আমার, এমন, সময় সার্জন বললেন, ওহে ওকে আবার টেবিলে তোল, একটু ভুল হয়ে গিয়েছে, আবার স্টিচ খুলতে হবে। যে ক্লিপগুলো দিয়ে আর্টারী বন্ধ করা ছিল, তা তো বের করা হয়নি। নাও ঝটপট কর। বুঝুন ব্যাপারটা, আবার সেলাই খোলা, পেটের ভেতর থেকে কিলিপ বের করা, শুধু শুধু হয়রানি নয়? এপাশের বেডটি বললেন, তাহলে

তো আপনি অল্পের ওপর দিয়েই পার পেয়েছেন। কিলিপ তো ভারি একটা জিনিস। আমার কি হয়েছিল জানেন, ছুরিটাই পেটে পড়ে ছিল। তাও আবার গলস্টোন অপারেশন। দুপুর বেলা হন্তদন্ত হয়ে বুড়ো ছুটে এল। এসেই বললে ওহে একটু ভুল হয়ে গেছে, ছুরিটা বোধ হয় বের করা হয়নি। এসব কথাবার্তা যত শুনছিল, নতুন পেশেণ্টের ততই দফা ঠাণ্ডা হচ্ছিল। বলে কি রে বাবা! এ-যে ডাকাতে কাণ্ড দেখছি। ওদের কথা শেষ হতে না হতেই সার্জন এসে হাজির। ব্যস্তভাবে বললেন, ওহে, একটা ভুল হয়ে গেছে। ছাতাটা বোধ হয়—সার্জনের কথা আর শেষ হল না, দ্দম করে ঘা মারলে নতুন পেশেণ্টের বুকে। খপ করে তার চক্ষু দুটো সেই যে বুজে গেল, আর খুলল না।

অবিশ্যি এতটা হয় না, এটা গল্পই। যা হয়, সেটাও নেহাৎ কম নয়। নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলি। হাসপাতালে একবার পড়ে ছিলুম মাস দেড়েক। পাশাপাশি দুটো বেড। আমারটা একশ' সতেরো পাশেরটা একশ' আঠারো। একশ' আঠারোর রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না ভালো, কড়া কনস্টিপেশন। ডাক্তার নার্সকে বলে গেলেন রাত্রে একটা ডুস দিতে। কি ছিল খোদার মনে কে জানে মশাই; শীতের কনকনে রাত্তির, থুথু জমে বরফ হয়ে ওঠে, কাঁথাকম্বলের মধ্যে অবধি শীত ঢুকে ডিম পেড়ে রেখে গেছে। কোনো রকমে ওম্ করে চোখ দুটো বুজেছি কি, জমাদার এসে হাঁক পাড়লে, এ বাবু, উঠিয়ে, টাট্টি যানে হোগা। কেন বাপু, আমার তো আর টাট্টির গোলমাল হয়নি। যত বলি,—তা কে শোনে সে কথা, জবরদস্তি ধরে নিয়ে ডুস লাগালে। একে আমার

নরম ধাত, তায় ওই অবস্থা। সেইদিনই যে গঙ্গাযাত্রা করিনি, সে পূর্বপুরুষের পয়ে।

নার্সদের কথা আর বলবেন না। সে ছিল ব্রিটিশ আমলে, পান থেকে চূণ খসুক তো খিঁচুনির চোটে বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিত মেম-মেট্রনগুলো। আর এখন ? হুঁঃ। সিংঘির পাঁচ পা দেখেছে সব। রোগী জল চাইছে, নার্স বসে বসে উপন্যাস পড়ছে। ঘ্যান ঘ্যান করতে করতে এলে গিয়ে যদি চুপ করলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল, নইলে নাছোড়বান্দা রোগী হলেই মুশকিল, উঠতেই হয় নার্সকে। তবে শুধু মুখে জল দেয় কি করে, তাই সঙ্গে দেয় দাঁতখিঁচুনি। বলব কি মশাই, একেই রাতদিন শুয়ে থাকতে হয় বলে হাসপাতালে ঘুমটা বেশ পাতলাই হয়। অতি কষ্টে তুতিয়ে-পাতিয়ে তুটো পাতা এক করেছি, ঘড়াৎ ঘাই ঘড়ড় শব্দে চমকে উঠে পড়লুম। ইদিক-সিদিক চেয়ে দেখি, নার্স দিদি মাথাটা টেবিলে রেখে একটু নিম্-নিদ্রা দিতে লেগেছেন। একবার ভাবলুম, থাক, ডেকে আর কি হবে। কিন্তু মশাই নাক নয় তো, কাঁই বিচি ভর্তি ফাটা ক্যানেস্তারা। ঘড়ড় ঘড়ড় শব্দে, পাশের মানুষ আমি কোন্ ছার, পাশের ঘরের রোগী এসে হাতজোড় ক'রে বললে, দিদি, একটু চেপে ডাকুন, ঘুমুতে পাচ্ছিনে।

আরেকটা ঘটনা বলি। বন্ধুর সঙ্গে হাসপাতালে গেছি, তার স্ত্রীকে দেখতে, বাচ্চা হয়েছে একটা। মেটার্নিটি ওয়ার্ডে ঢুকতে না ঢুকতেই কানে গেল, কি দাদা, আপনার ক মাস ? পিছনে চেয়ে দেখি, ইয়া গুঁফো এক জোয়ান হাসিহাসি মুখে জবাব দিচ্ছেন, ছয়, আপনার ? সময় হয়েছে, চৌকি নিলেই হল। বেশ বেশ, উইশ ইউ গুড লাক। এ-জগতের ভাষাই আলাদা। ওপরে উঠতেই দেখি হৈ-হৈ ব্যাপার। কি না, সারাক্ষণ আদরযত্ন করে তুধ-টুধ খাইয়ে ছেলে ফেরৎ দেবার সময় হাতের টিকিটে নজর পড়েছে মায়ের ; আরে এ ছেলে কার ? আমার

ছেলে কই অ নার্স, এ তো আমার খোকা নয়। হ্যাঁগা বাছা, এ তো অন্য টিকিট!

একদিন হুদিনের বাচ্চা দেখে তো আর বোঝা যায় না। বাচ্চাদের পাইকিরী আড়তে সমস্তগুলোর চেহারাই এক রকম লাগে। তাই হাতে হাতে টিকিট ঝোলানো থাকে। মায়ের টিকিট আর বাচ্চার টিকিটে একই নম্বর। নম্বর দেখে বেছে নাও কার কোন্ শিশু। নম্বর বদল হলেই কম্ম চিত্তির। রামপিয়ারীর বাচ্চা মানুষ হবে রসময়ীর কোলে?

আরেকবারের কথা। আমার পাশের বেডের রোগীকে নিয়ে হাসপাতাল সুদ্ধ লোক অস্থির হয়ে উঠল। তার দাপটে ডাক্তার থেকে জমাদার তটস্থ। প্রথম চোট বেধে গেল নার্সের সঙ্গে। নার্সের অপরাধ হয়েছে, তাকে কাপড় ছেড়ে হাসপাতালের পোশাক পরতে বলেছে। বুড়ো রেগে কাঁই। বললে, ষাটের ওপর বয়েস হল। দশ বছর বয়েস থেকে ধুতি ধরেছি অঙ্গে। তুমি তো বড় বেয়াদব হে, আমাকে পায়জামা পরাতে চাও! ওসব বাঁদরামি আমার কাছে চলবে না। মহা হৈ-চৈ লেগে গেল। শেষ পর্য্যন্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পর্যন্ত গড়াল কেসটা। কিন্তু বুড়োর বাঁকা ঘাড় সোজা করে কার সাধ্যি। শেষ পরে আমি বললুম, দাহু, পরে ফেলুন পায়জামাটা। ওটা ওষুধ দিয়ে কাচা কিনা, ভারি উবগার দেয়। বুড়ো কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো আমার দিকে। তারপর বললে, তুমি বলছ, ওটা উপকারী? বললুম, হ্যাঁ। তখন নার্সকে ডেকে বললে, ওহে নার্স, দাও—যখন বলছে ছোকরা। তা ক'দিনে ছাড়া

পাব, বল দিকিনি? তুমি আছ ক'দিন? বললুম, এক মাস আট দিন। আরো দিন সাতেক থাকতে হবে বোধ হচ্ছে। তার আগে আর বাড়ি যেতে দিচ্ছে না। বুড়ো বললে, তোমার ধারণা, তুমি সেরে উঠে বাড়ি যাবে? সেরে তো উঠেইছি। দিন সাতেকের মধ্যেই ছাড়া পাব। বুড়ো বললে, হুঁঃ। তা ছাখ। বাড়ি ফিরতে পারলে ভালোই। ছেলেমানুষ। বুড়োর কথার ভাবটা মোটেই ভালো লাগল না আমার। চুপ করে গেলুম। বুড়ো বললে, পছন্দ হল না কথাটা? তা সত্যি কথা কারই বা পছন্দ। এখান থেকে ফিরতে পারবে না তুমি। কেউই পারে না।

রাত্রে ঘুমুচ্ছি। ডেকে তুললে, ওহে, বড় অস্বস্তি লাগছে। জমাদার-টাকে ডাক তো। বললুম, কি হয়েছে কি? না, ধুতিটা রাখলে কোথায়? ইজের পরে ঘুম হচ্ছে না। বললে বিশ্বাস করে না ব্যাটারা। বিরক্ত হলাম। বললুম, চুপ করে শুয়ে থাকুন, সয়ে যাবে। বুড়ো বললে, বলছ তাই? আচ্ছা। আর সাড়াশব্দ করলে না। পরদিন সকালে ফের হৈ-চৈ। নার্স এসেছে, বিছানা গুটোবে। বুড়ো চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। উঠবে না কিছুতেই। নার্স যত বলে, উঠুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। লোকটি পরমহংসের মতো নির্বিকার। বললে, বলছি না অসুবিধে আছে। ঘুরে এস। কি ব্যাপার? দেখুন তো কি মুশকিল। বললুম, দাদু, কি হল? বুড়ো বললে, ইজেরটা তুলে দাও তো ভায়া। রাত্তিরে কোথায় যে ছুঁড়ে ফেলেছি। বড্ড অস্বস্তি লাগে। অভ্যেস মোটে নেই কিনা। বললে ব্যাটারা মানতে চায় না।

এই ইজের নিয়ে বুড়োর সঙ্গে মহা ফাটাফাটি হাসপাতালের। তার আর ফয়শালা হয়নি। আগেই আমি খালাস পেলাম। আগের দিন থেকেই বুড়োর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হয়েছে। সত্যি সত্যি বাড়ি যাচ্ছি

দেখে খাপ্পা হয়ে আছে। সার্টিফিকেট এনে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি। বুড়ো মুখ ভার করে বসে আছে। একটি কথাও বলেনি। বললুম, দাতু, যাই? খেঁকিয়ে উঠল, থাক্ থাক্ আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। আবার ঘটা করে বিদেয় নেওয়া হচ্ছে! কী আর বলব? ব্যাজার মুখে চলে আসছি। লোকটির কিডনি পচে গেছে। বাঁচবে না। ঈর্ষা হওয়াটা স্বাভাবিক। গেটের কাছে আসতেই দেখি বুড়ো তুহাতে বুক জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে। কোনও কথা বললে না। আমার মনটাও বিষণ্ণতায় ভরে এল। ঝাপসা চোখে দেখলুম, বুড়ো ছুটে গিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকল।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। বাসে উঠব। পেছন থেকে কে শুধোল, বাবুজী, মাটিয়া কালেজ ইয়ে হ্যায়? ঘাড় নেড়ে বাসে উঠে পড়লুম।

নার্স লুসি

গোরু, মোষ, পথের কুকুর, বেড়াল এদের কষ্টের লাঘব করবারও প্রতিষ্ঠান আছে। 'দেখ্‌ভাল্‌' করবার জন্যে পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতি আছে। কিন্তু আমাদের জন্যে কী আছে? অন্যকে শুশ্রূষা করে চাঙ্গা করে তুলি, তাই বোধ হয় আমাদের গতর সতের টুকরো হয়ে গেলেও ফিরে চেয়ে দেখবার কেউ থাকে না। অন্যের দরদে হাত বুলোই, তাই কি আমাদের দরদী কেউ নেই? আমাদের অর্থাৎ নার্সদের কথা আর বলবেন না, আমাদের জীবনটাই এক বিরাট কার্স, অভিশাপ।

শ্রীমতী লুসি বিশ্বাস মৃদু হাসলেন। গনগনে আগুনে লোহা পোড়ালে তা যেমন হাসে সেই হাসির এক টুকরো কেমন করে না-জানি সিস্‌টার বিশ্বাসের ঠোঁটে ছিটকে পড়েছে। ডাঃ জোয়ার্দার আমার বন্ধু, এক হাসপাতালের প্যাথলজিস্ট, সেই সুবাদে বাঙালী ক্রিশ্চিয়ান লুসি বিশ্বাসের সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি কথা বলছিলেন। দেখে মনে হল, বেদনার ঝারিতে স্নান সেরে ঔদাস্যের পাউডার মুখে বুলিয়ে এইমাত্র যেন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন।

বললেন, অথচ কত স্বপ্ন ছিল জানেন? গলার লকেটে যেমন মানব-পুত্রের ক্রুশ ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছি এখন, ম্যাট্রিক পাশ করে নার্স হতে এলাম যখন, তখন মনের লকেটে তুলে বেড়াচ্ছিলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। এখন নাইট ডিউটি দিতে দিতে চোখের পাতা ভারী আর হয় না। ঘুমের সঙ্গে পরিচয়ের পাট তো উঠেই গেছে কবে। স্বপ্ন আর দেখব কি করে? নার্সদের ঘুম নিয়ে তো খুব ঠাট্টা করেন আপনারা। আচ্ছা, বলুন তো, সমস্ত রাত্রি একটা লোক একঘর অসুস্থ রোগী নিয়ে ঠায় বসে থাকে কেমন করে? সাড়ে আটটায় আসি, আর বেরোতে বেরোতে সকাল

সাতটা সাড়ে-সাতটা তো হয়ই। একটানা এমন ডিউটি আর কারা দেয়? অথচ দিনের পর দিন আমাদের এই অমানুষিক পরিশ্রম করে যেতে হয়। ছুটি-ছাটা নেই। আমরা বাইরের নার্স। বরাদ্দ মাইনে তো নেই। দিনমজুরি করছি। ছুটি নিলেই রুটিতে টান পড়বে। সেবাধর্ম নিয়ে তো লম্বা চৌড়া লেকচার দিয়ে বেড়ান, তা এর একটা বিহিত করতে পারেন না?

জিগ্যেস করলুম, বাইরের নার্সরাও কি হাসপাতালে কাজ করে? বললেন, করবে না কেন? যে সব রোগী পেয়িং-এ থাকে, কি কেবিনে, তাদের শুশ্রূষা কে করে? তবে বাইরের নার্সদের অসুবিধে কি জানেন, মেট্রনকে হাতে রাখতে হয়। সবই তো গা শোঁকাশুঁকির ব্যাপার? মেট্রন যদি নেক নজরে চাইলেন তো ভাগ্যের জমীনে সোনা ফলল, বেঁকে যদি দাঁড়ালেন তো সেখানে করে খায় সাধ্যি কার? কাজেই, বুঝছেন তো, আমাদের মরণ-বাঁচন সবই, মেট্রেনের আঙুল-ঘোরানোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মেট্রন মেমের গবদা পায়ে তেল না হোক পাউডার মাখাতে যে না জানল তার নার্সগিরির ভবিষ্যৎ ওইখানেই ইতি।

সেদিনকার কথা মনে পড়ছে। ট্রেনিং নিতে কলকাতায় এলাম আনকোরা মফস্বল থেকে। এর আগে হাসপাতালের চেহারা দেখেছি, তা মহকুমা সরকারী হাসপাতালের। দাঁতে ব্যথা হয়েছিল। যন্ত্রণায় জর্জর হয়ে হাসপাতালে গেলাম। একে মেয়ে তায় কমবয়েসী বেশিক্ষণ বসতে হল না। ডাক্তারবাবু দেখে-শুনে বললেন, তোলা ছাড়া গতি নেই। তো তুলুন। বলতে না বলতেই দাঁতে সাঁড়াশী পুরে পটাং এক টান। মগজ অব্দি পড়্ পড়্ উঠে আসে আসে! ঘুল্লি খেয়ে পড়ে গেলাম। খানিকক্ষণ সব কিছুই একাকার। জ্ঞান হতেই মনে হল, যার জন্যে গেলাম সে দাঁতটাই ওঠেনি। ডাক্তারের অবস্থা দেখে ওঁকে সে কথা বলতে ভরসা পেলাম না। ভাবলাম, নার্সকে কথাটা বলি,

তিনিই ডাক্তারকে বুঝিয়ে দেবেন অখন। বললাম, নার্সকে একবার ডেকে দেবেন? নার্স! এই মফস্বলের হাসপাতালে নার্স! হুঁ! গোরুর গাড়ির আবার হেড্ লাইট্! নার্স-ফার্স নেই। কম্পাউণ্ডার পোষবারই টাকা নেই তো আবার ইয়ে।

ঘটনাটা বললাম এই জন্যে নার্স সম্পর্কে একটা কৌতূহল আমার প্রথম জন্মাল ওখান থেকেই। ভাবলাম, এই যন্ত্রণাটা পেলাম, নার্স থাকলে বোধহয় এর একটু উপশম হত। তারপর একদিন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জীবনী পড়লাম। সেন্ট জনের কথা জানলাম। গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বাবার ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হই। কিন্তু সে তো অনেক টাকার মামলা। কোনদিনই ও আশা মেটানো যাবে না। ডাক্তার হতে পারব না, কিন্তু নার্স হতে বাধা কি? দুধ না পাই, ঘোল খেয়ে সোয়াদ মেটাই। বাবার সঙ্গে কলকাতার এক হাসপাতালে এলাম ট্রেনিং নিতে। হাঁসপাতালের চেহারা দেখেই ভিরমি খেয়ে পড়ি। হাসপাতাল নয় তো, বিরাট রাজপুরী। এসেছিলুম সকালে। আউট ডোরের সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। গেটের

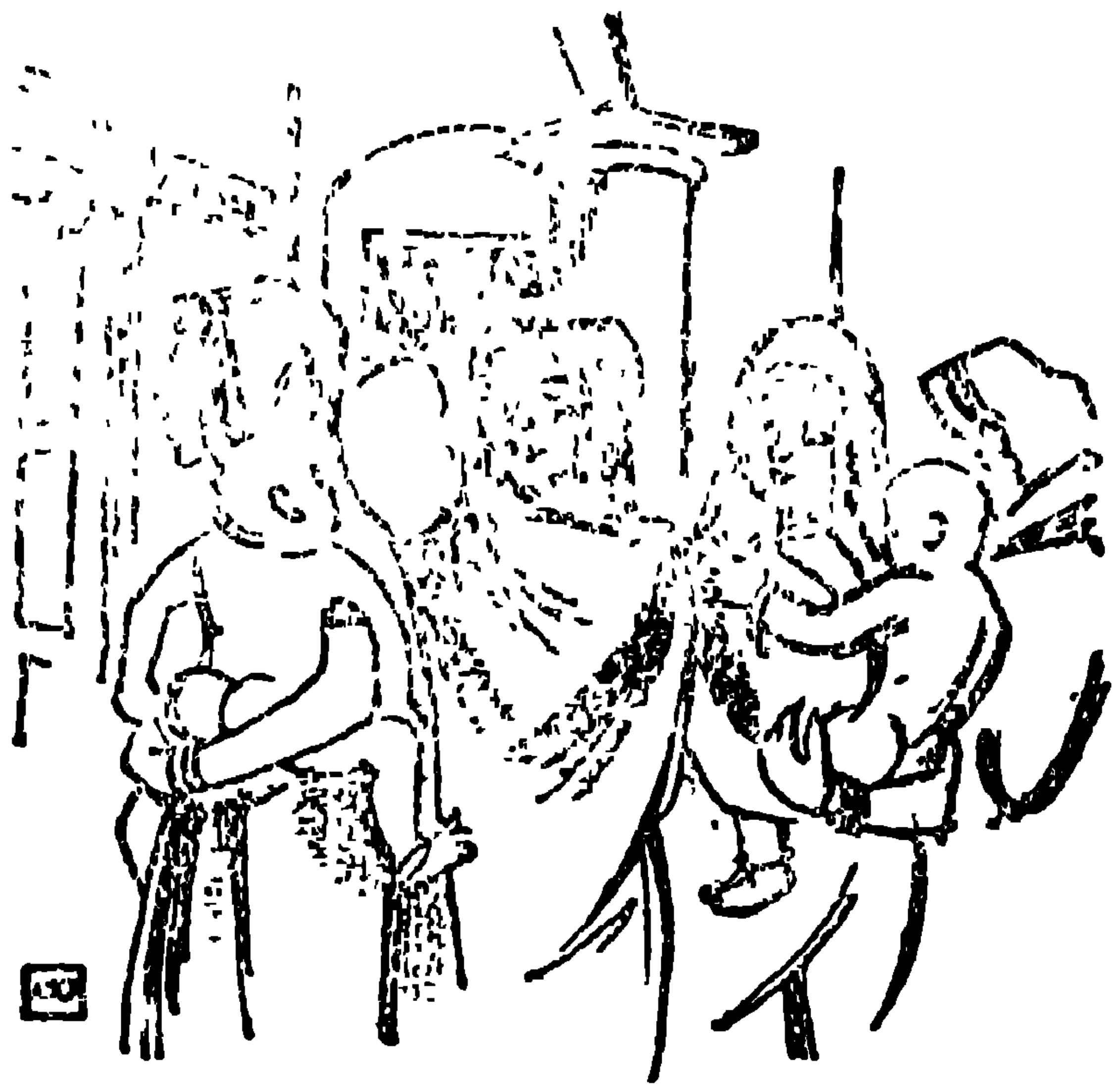

বাইরে ফল বেচছে এক বুড়ো। সব কিছু মিলিয়ে কেমন ভয়, কেমন কৌতূহল, এক উত্তেজনা ভর করল শরীরে। একটি নার্স বেরিয়ে এল। ধপধপে সাদা পোশাক দেখে মনে হল—কবে আমারও অমন হবে!

মেট্রনের সঙ্গে দেখা করলাম। এমন মিষ্টি কথা, শুনেই প্রাণ জুড়িয়ে গেল। মেট্রন বললেন, সব প্রোফেশানের সেরা এই নার্সগিরি। আর্ত আতুরের দুঃখ ভোলানো, তাদের মুখে হাসি ফোটানো, এর চেয়ে মহত্তর

আর কি আছে ? এই লাইনে তোমাদের মতো শিক্ষিতা মেয়েরা তো আসে না। কি আফসোস। আফসোস আমারো হল। মেয়েদের ওপর অশ্রদ্ধা হল। ফরম ভর্তি করে দিয়ে এলাম। ইণ্টারভিউতে ডাক পড়ল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবার এক দফা মহৎ কথা শোনালেন। তারপর ফর্দ দিলেন। বিছানা, থালা গেলাস, ছ'খানা কালো-পেড়ে সাদা শাড়ি, ছ'টা সাদা ব্লাউজ, চারটে পেটিকোট আর দু' জোড়া জুতো এনো সঙ্গে। আর নগদ কুড়ি টাকা। মাথায় আমার আকাশ ভেঙে পড়ল। এসব আমি কোথায় পাব ? মেট্রনকে বললাম, অনুনয় করলাম কিছু কমিয়ে দিতে। মেট্রন বললেন, যা ফর্দ দিয়েছি, তার একটি জিনিস কম হলেও চলবে না। না পার, পথ দেখ।

বুঝতে শুরু করলাম, ঠাঁই বড় কঠিন। এতদূর এগিয়েছি,আর পেছনো যায় না। জোগাড় করলুম জিনিসপত্র। ভর্তি হয়ে গেলাম ট্রেনিং-এ। প্রথম দিনই ডিউটি পড়ল হল-ঘরের মেঝে মোছা, লকারগুলো পরিষ্কার করা। এ কী ব্যাপার ? এ তো জমাদারনীর কাজ, এ আমরা করব কেন ? না, ট্রেনিং-এর মেয়েদেরই এসব করতে হয়। বাঃ, তাহলে জমাদারনীরা কি করবে ? তাদের কাজটা কি ? চোপ্, এই লেখাপড়া-জানা মেয়েরা কেবল হাঙ্গামা করে। এই জন্যেই পারতপক্ষে এদের চাইনে। মেট্রন বললেন, অর্ডার ইজ অর্ডার। যাও কাজ কর।

এই পর্যন্ত বলে লুসি চুপ করলেন। একটু দম নিয়ে বললেন, স্বপ্নটা সেই তক্ষুনি গাছের পলকা ডালের মত মট্ করে ভেঙে পড়ল। একটানা তিনটি বছর কী অত্যাচারটা সহ্য করলুম। বাঁচা মরা সবই মেট্রনের হাতে। মেট্রনের নজর ত্যারচা হলে গোটা জন্মেও নার্সিং পাশ করতে পারতাম না। পনের দিন পরেও একদিন ছুটি মিলত না। আর মেয়েদের কী ব্যবহার ! কী সব কথাবার্তা ! শুধু বিকৃতি আর রুচিহীনতা। দু'দিনেই শিউরে উঠলাম। কতদিন ভেবেছি, ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে পালাই।

কিন্তু কোর্স ফিনিশ না করে পিঠটান দিলে পঞ্চাশ টাকার জরিমানা। সেই ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইলাম। জানেন, এই নার্সদের জন্যে একটা লাইব্রেরী নেই, দু'খানা বই পড়বার কোন বন্দোবস্ত নেই। একটু নির্দোষ আমোদ-আহ্লাদ যে করি তার ছিটে-ফোঁটা ব্যবস্থাও নেই। কী সম্বল করে এই মেয়েগুলো কাল কাটায় বলুন তো। অথচ পদে পদে প্রলোভন। মনোহর হাতছানি, দিনরাত চোখের সামনে ঘুরছে। কে আর কতক্ষণ পা ঠিক রাখতে পারে? চোখ ভোলাবার মন ভোলাবার গোসাঁইদের তো আর অনটন নেই সংসারে! হাসপাতালের আনাচে-কানাচে উটকো প্রেম পাক খেয়ে ফেরে। টিকে নিয়ে কলেরা বসন্ত টাইফয়েড বড়জোর বি-সি-জি নিয়ে টি বি-ও ঠেকাতে পারি, কিন্তু রক্তমাংসের শরীর, কিছু মনে করবেন না, একটু খোলাখুলিই বলি, তার পাওনা ঠেকিয়ে রাখব কোন্ বি সি জি দিয়ে?

যাক, সব কথা বলাও যায় না, শুনতেও নেই। ডাঃ জোয়ার্দারের খবর কি বলুন? বললুম, সে খবর তো আপনারই রাখবার। আমি বহুদিন ওর খোঁজ জানিনে। তবে যতদূর সন্দেহ করছি, দেশেই আছে। একটা মোবাইল ডিসপেনসারী না কি যেন খুলবে বলছিল। লুসি বললে, কিছুই জানিনে। যাক, যে জন্যে ডেকেছি। নার্সদের সম্পর্কে আপনার একটা মন্তব্য পড়েছি। ঠিক সুবিচার করেননি। ওই যে বাচ্চা বদলের একটা গল্প লিখেছেন, পড়তে মজাদার হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাইনে। বলছি, ওর অন্য দিকটাও দেখুন। আমাদের হাসপাতালের মেটার্নিটিতে এলে দেখতেন কী সতর্কতা। কত কেয়ারফুল থাকি আমরা। ডেলিভারি হবার সঙ্গে সঙ্গে নাভি কাটার আগেই আমরা বাচ্চা আর তার মায়ের হাতে নম্বুরে টিকিট বেঁধে দিই। তারপর নাভি কাটা হয়, ওজন নেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে খাতায় হিস্ট্রি লেখা হয়ে যায়। রোগীকে খালাস দেবার সময় এই হিস্ট্রি ডাক্তারকে দেখাতে হয়। ডাক্তার

খাতার নম্বরের সঙ্গে বাচ্চা আর তার মায়ের নম্বর এক করে দেখে' 'চেক-রসিদ' লিখে দিলে তবে রোগী ডিসচার্জ পায়। তবে আপনি যে মিথ্যে লিখেছেন একেবারে, তা বলছিনে। গোলমাল অবিশ্যি হয়, তবে তা মোটেই মারাত্মক নয়। মাঝে মাঝে হয় কি, এর ছেলে তার কোলে চলে যায়, এটা ঠিকই, তবে তা পরক্ষণেই ধরা পড়ে। কেমন ক'রে তা বলছি। নিয়ম হচ্ছে চার ঘণ্টা পর পর বাচ্চাকে তার মায়ের কাছে রেখে আসা। নার্সারীতে আছে আশীটে বাচ্চা। অথচ নার্স মাত্র দুজন। আর ছোট শিশু, এদের কাজের কি আর অন্ত আছে। কাঁথা কাপড় বদলিয়ে, পাউডার মাখিয়ে পরিচ্ছন্ন রাখতে না রাখতেই সময় কোথা দিয়ে কাবার হয়ে যায়। তাই তাড়াতাড়ি করে মায়ের কাছে বাচ্চাকে পৌঁছে দিতে দৈবে ভবিষ্যতে এরটা ওর কাছে চলে যেতে পারে। আর তা ধরাও পড়ে। তবে মজা হচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নার্সরাই ধরে থাকেন ভুলটা।

অভিযোগ কি করবার নেই কিছু আমাদের নামে? ফাঁকি কি দিইনে কাজে? কিন্তু, বিশ্বাস করুন, দিতে বাধ্য না হলে ফাঁকি পারতপক্ষে দিইনে। অন্যের কথা বলতে পারিনে, নিজের কথাই বলি। তখন সবে আমার জুনিয়ারি শুরু হয়েছে। বিছানা পাতা, রেস্‌পিরেশন দেখা, টেম্পারেচার নেওয়া, এনিমা দেওয়া, ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া এই সব তখন নিত্যকর্ম। সিনিয়ার একদিন বললেন, আজ তোমাকে ব্যাক অ্যাটেণ্ড করতে হবে। চটপট সেরে নাও, বুঝলে? না বুঝলে উপায় আছে! ওয়ার্ডে একশ আটটা বেড। রোগীতে টইটুম্বুর। ব্যাক অ্যাটেণ্ড করা মানে পিঠে তেল মালিশ করা, যাতে বেড-সোর না হয়।

একশ আটটা পিঠে মালিশ করবো কি, শুনেই তনু অবশ হয়ে গেল। পঁচিশটে ব্যাক অ্যাটেণ্ড করতেই আমার ডানার ভিটেয় ঘুঘু চরতে শুরু করে আর কি। স্টাফ এসে দেখেই ধাতানি দিলে, করলে কি এতক্ষণ, অ্যাঁ? মাত্তর পঁচিশজনকে অ্যাটেণ্ড করলে এই দিনমান ধরে! হোপলেস। এদিকে এস, ছ্যাখ, শিখে নাও কাজটা। দেখলুম স্টাফের কাজ, শিখেও নিলুম। তার্পিন তেল তেলোয় নিতে না নিতেই তেলোটা রোগীর পিঠে ঠেকালে। একজনের পিঠে ঠেকাতে না ঠেকাতে অন্য আর একটা পিঠে হাত চলে গেছে। এই হল এফিশিয়েন্সি। আর এ না করে নিরেট বোকার মতো আমি দশ মিনিট ধরে একই পিঠ মালিশ করে যাচ্ছিলুম। কি, না রোগীর একটু আরাম হবে। স্টাফ বললেন, একটু কমনসেন্স খাটাও। এটা হাসপাতাল। এখানে লোকে আরামের জন্যে আসে না, ব্যায়ারামের জন্যেই আসে। চটপট কাজ হাঁসিল করবে। এক জনের ওপর যতদিন এতলোকের ভার থাকবে, কাজও হবে এই রেটে। যা পারা যায় না, তা পারি কি করে? যা করা সাধ্যে কুলোয় না, তা করি কি করে? অথচ হাসপাতাল নার্স বাড়াবে না। বেশির ভাগ কাজই তো যারা ট্রেনিংএ আসে তাদের দিয়ে চালিয়ে নেয়। নির্খর্চায় কাম বাগাবার এ এক সুন্দর পথ।

স্বদেশী আমল এল। ভেবেছিলুম, আমরা নার্সরা, এবার বোধ হয় মানুষের পর্যায়ে উঠব, সুযোগ সুবিধে মিলবে কিছু। কিন্তু কই? সবই তো ফাঁকা আওয়াজ হয়ে গেল দেখছি। আগেকার দিনে মেম সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কড়া ছিল। খুব খাটাত, খুব ভোগাত কিন্তু কাজ শেখাতো চমৎকার। আমাদের সময়ের কথাই বলি। আমাকে বললে বেড্ তৈরি কর তো করলুম, রোগীকে শোয়ানো হল। আরে সে মানুষ তো, কাঠ নয়। নড়া চড়া করবেই। চাদরটা কোন্ সময়ে একটু ঘুচিমুচি হয়ে গেছে। মেট্রন ঘুরতে এসেছেন। আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, এ কি! কি করছিলে

বসে বসে, ফের যদি ওয়ার্ড এ রকম অগোছাল দেখি, অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি। আর এখন, দেখুন গিয়ে ওয়ার্ডে, কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ময়লা বিছানা। রোগী তাতেই শুয়ে আছে। কি করবে? এর মধ্যে নার্সের হাত কই? ইচ্ছে থাকলেও সে কী করতে পারে? বেড্-শীট্ চাইলেই লিনেন-কীপার চক্ষু উল্টে বলে বসবে, নেই তো দেব কোত্থেকে? কিছুই পাওয়া যায় না। একটা কেউ কথা শোনে না! আগে কাজ হত, সবাই সহযোগিতা করত। আর এখন, কার শ্রাদ্ধ কে করে? ওয়ার্ড বয়কে পঁচিশবার বললেও নড়ে বসবে না। মেথর জমাদারকে উঁচু গলায় কিছু বলেছেন কি ওরা বলে বসবে, হামসে নেহি হোগা, রিপোর্ট কিজিয়ে। এই তো দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে কতটুকু জানতে পারেন? লণ্ড্রী থেকে কাচা কাপড়ের পাট ভেঙে অঙ্গে চড়াই যেমন, তেমনি মনে রাখবেন, কাচানো হাসিটিও বাড়ি থেকে পরে আসি!

হাসপাতালের চাকরি ছাড়লুম কেন? নার্সকে আপনারা কি চক্ষে দেখেন তা তো জানি। তবুও হাসপাতালে একটু মান-সম্মান, ওরই মধ্যে ওই উনিশ আর বিশ, তবু কিছু আছে। বাইরের নার্সের তো খোয়ারের আর অন্ত নেই। তাও সে চাকরি ছেড়ে দিলুম। কেন, জানেন? পেট ভরে খেতে দেয় না। জিগ্যেস করবেন যাকে, সে-ই বলবে এ কথা। থাকবার জায়গাও দিতে পারছে না এখন। আগে আমরা সিঙ্গেল-সীটেড্ রুমে থাকতুম. এখন সেই রুমে চারজন ঢুকিয়েছে। প্রাইভেট হাসপাতাল তো ব্যারাক। তাতে আর ছিটেফোঁটাও প্রাইভেসি নেই। তাই তো বলছিলুম, গোরু ছাগলদের প্রতি আপনাদের যতটুকু মমতা, আদ্ধেকও যদি আমাদের ওপর থাকত তো বর্তে যেতুম। জীবনের ওপর, মানুষের ওপর একটু শ্রদ্ধা থাকত। যে জীবনগুলো বাঁচাই, তাদের সঙ্গে কী আর সম্পর্ক আমাদের বলুন। তবু একটু মিষ্টি কথা শুনলে মনটা ভরে ওঠে, এই আর কি। কিন্তু সে কি হবার যো

আছে ! পেশেণ্ট আসতে না আসতেই সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায় আদায় আর কাঁচকলায়। একসঙ্গে আশী নব্বুই একশ রোগীর খেদমত করতে হয়। দশটি রোগী যদি একই সঙ্গে কাজের ফরমাস দেয় তো যাই কার কাছে। একটি রুগী তুষ্ট তো বাদবাকি সব মহারুষ্ট। পেসেণ্টরা যেমন তেমন, তবুও তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে আমাদের, কিন্তু পেশেণ্টের রিলেটিভদের সঙ্গে আমাদের কি ? কিন্তু চোখ রাঙাতে কি তাঁরাই ছাড়েন। সব চেয়ে দুঃখ লাগে তাদের হাম্বাই তাম্বাই দেখলে। আমরা তো আর ভদ্রঘরের মেয়ে নই, ভাবখানা যেন এই। একবার কথাবার্তার ধরন-ধারন শুনে দেখবেন। এই নার্স, এটা কর। এই নার্স, ওটা করনি কেন ? ভাষার ইলেক শুনুন একবার !

তাই আর বরদাস্ত হল না। ছেড়ে দিলুম চাকরি। প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেছি। খাই না খাই, দশের চোখ-রাঙানিতে নাই। আরো একটা হেতু আছে। লুসির গলা নরম হয়ে এল। বললেন, দশজনের সেবা করে খুশিও করতে পারিনে কাউকে। প্রাইভেটে তবু একজনকেই সেবা করতে হয়। ঝামেলা কম। আর তৃপ্তিও পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে খারাপও লাগে, খুবই খারাপ লাগে। কিন্তু প্রাণপাত পরিশ্রম করে যমের ঘরে যাওয়া রোগীকে যখন তার নিজের ঘরে ফিরিয়ে দিই, আত্মীয়স্বজনের ম্লান মুখে ছলোছলো চোখে নিভে যাওয়া হাসিটুকু আবার যখন উস্কে ওঠে, তার কৃতিত্ব অনেকটাই আমার, এ কথা ভাবতে গেলে মনে যে শিহরণ জাগে, তাতে সকলের উপেক্ষা, সব অপমান, সমস্ত গ্লানি মুছে যায়। বিদায় নেওয়া পেশেণ্টের ওই যে একটু সকৃতজ্ঞ ‘আসি ভাই’, ওইটুকুর লোভেই তো আটকে পড়েছি। কাজটা আর ছাড়া হয়ে ওঠে নি।

গো-ও-ও-ও-ও-ও-ও-ল

বন্ধু বললেন, তুমি একটি আস্ত উজবুক, পুরো-থান বারোগজী আহাম্মক একটি। অ্যাদ্দিন কলকেতায় আছ আর খেলা দেখতে ময়দানে যাওনি? সে কি হে! মন্দিরে এসে দেবতা দর্শন করলে না? খেয়াঘাটে এসে নৌকোয় উঠলে না, সাত বচ্ছর বৌয়ের সঙ্গে ঘর করে তার মুখ দেখলে না, কষ্ট করে—

যে রেটে দোস্ত আমার এগুচ্ছেন তাতে অচিরাৎ যে তাঁর উপমার স্টক ক্লিয়ার করে দেউলে হয়ে পড়বেন এবং বাদবাকি জীবনটা ধার চেয়ে চালাবেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। তার চেয়ে বখেড়া এক কথায় মিটিয়ে দেওয়া ঢের সোজা। তাই দুজনে চললুম খেলা দেখতে। দুটো টিমই জাঁদরেল, তাই মাঠ সবুজ থেকে কালো হয়ে উঠতে লেগেছে লোকের মাথায় মাথায়।

পাঁচটা পনেরোয় খেলা শুরু, হাজির হলাম যখন তখন ঘড়ির কাঁটা আড়াইটের দরজার গোড়ায় গিয়ে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ঘা দেবে কি দেবে না তাই ভাবছে। সেই তখনই টিকিট ঘরের লাইনের লেজ যেথায় আমার নাকে ঠেকল—সেখান থেকে টিকিট-কাটার ফোঁকর ছুঁতে 'ডবল মার্চে' এগুলেও রাস্তা হবে পাকি দুঘণ্টা সতের মিনিটের। নিচে ময়দানে বাদামের খোলা আর উপরে আসমানের গায়ে সাঁটা সূর্যটা একেবারে মডার্ন জেনানা। মেঘের আব্রু সরিয়ে ফেলে বেহায়া বে-শরম প্যাট প্যাট করে চেয়ে আছেন আমাদের পানে। ফলে 'প্রাণ

যায় রে লক্ষ্মণ।' শরীর আর শরীর নেই, হয়েছে টিউব ওয়েলের মুখ। কোন্ অদৃশ্য থেকে কে এক পালোয়ান 'টিউকলে'র টিকি ধরে ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং করছেন আর ভেতরের তাবৎ পানি হুড়মুড়িয়ে সর্বশরীর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ হয়ে দাঁড়াল, প্রথমে দু-পায়ে দাঁড়িয়েছিলুম, পরে একবার বাঁ পায়ের ওপর একবার ডান পায়ের ওপর, তারপর আর সাড় নেই, নিম্নদেশটি পাথরের স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে গোটা ময়দানটাই মানুষ হয়ে গেল। লঙ্কা ভাজা চলতে শুরু করল। পায়ে পায়ে এগিয়ে টিকিট-কাউণ্টারের কাছ বরাবর এসেছি, আর মাত্র মিনিট বিশেক, ব্যস্ তাহলেই ঘেরের ভেতর ঢুকে কোথাও কোমরটাকে জিরেন দিতে পারি। কপালের কি গেরো, পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল। ভাবলুম, খেলা আমার মাথায় থাক, মানে মানে এইবেলা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চলি। উসখুস করে লাইনের বাইরে পা বাড়িয়েছি বন্ধু এক থাবড়ায় ভেতরে টেনে নিলেন, কচ্ছ কি, এখন যাচ্ছ কোথায়? অবস্থাটা বুঝিয়ে বললুম। ফুংকারে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আরে ও কিছু না, ফলস্ পেন, অব্যেস নেই, এতক্ষণ এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছ, তাই অমন বোধ হচ্ছে। ভেতরে ঢুকে জাঁকিয়ে বসতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বলেই আর দেরি করলেন না, ঠেলতে ঠেলতে এনে ফেললেন টিকিট-ঘরের সামনে, টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলুম।

এপারে সবুজ গ্যালারি, জনগণেশের নাচন-কোঁদনের আপন ঠাঁই। ওপারে সাদা গ্যালারি, হোমরাও চোমরাও ওমরাওদের খাস তালুক। মধ্যিখানে মাঠ, সরেশ হাতের তৈরী একখণ্ড চৌকো গালিচা। আরাম পেলুম একটুস্খানি, আরামটা আমি পেলুম না, পেলে আমার কোমর। মশাই, বলব কি, এ ছাড়া আর ইতর-বিশেষ হল না কিছু, সেই খরতাপ সূর্যের পেয়ারা-নজর, সেই অদৃশ্য হস্তের টিউকল-টিপুনি সমানে চলতে

লাগল ! তার ওপর নতুন উপসর্গ—পেটের মোচড়। একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে দিলে। অথচ চারদিকে চেয়ে দেখি কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই। দিব্যি সব বসে বসে মটাং মটাৎ বাদাম ভাঙতে শুরু করেছে।

আমার অবস্থা এদিকে ভেঙে পড়ার মুখে। ব্রহ্মপুত্রে বর্ষার ঢল নেমেছে, তাকে কি আম-কাঠের তক্তা দিয়ে রোখা যায় মশাই।

গল্পটি হচ্ছিল লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোক বলছিলেন, আমার অবস্থাটা বুঝুন একবার। বন্ধুকে যত বলি, ভাই, আর না, এবারে পথ দেখি, তা কথাটা গায়েই মাখে না। আরে সে হল পাঁড় খেলা-দেখিয়ে। সর্বশরীর গাড্ডায় যাক ক্ষতি নেই, চোখের তেজটা থাকলেই হল। অন্য কথা কি বলব মশাই, ওর বিয়ে, লগ্ন সাতটায়, আর সেইদিনই কপালক্রমে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল চ্যারিটি। ভোর হতে না হতেই বর না-পাত্তা। কি ব্যাপার ? কোথায় গেল ? কি হল ? কেউ হদিস পায় না, শেষকালে ওর ছোটভাই বললে, একবার মাঠটা দেখে এলে হত না ? ছোট্ ছোট্। গিয়ে দেখি, সত্যি। সেই অত ভোরেই শ পাঁচেক লোক লাইন মেরেছে, আর আমার বন্ধুবর সেই পাঁচশ জনের একজন হয়ে মুখটি চাঁদপানা করে দাঁড়িয়ে হারজিতের বাজি রাখছে। আমাদের দেখে হাসিটাকে 'হাইকোর্ট-এণ্ড্' থেকে হাওড়ার পুল অব্দি টেনে বললে, কি রে, তোরাও দেখবি নাকি, তা বেশ, আর দেরি করিসনি, শীগ্‌গির দাঁড়িয়ে যা, এই মাত্তর খবর পেলুম আজ সক্কলেই ফর্মে আছে, খেলা যা জমবে না, আঃ, একেবারে সৈয়দ সাহেবের লেখা। ছোটভাই তেরিয়া হয়ে বললে, রেখে দাও তোমার খেলা, বলি আক্কেলখানা কি রপ্তানি করে দিয়েচ ? সেই সাত সক্কালে উঠে না-বলা না-কওয়া ভচ্ করে যে মাঠে চলে এলে, বলি তোমার না আজকে বিয়ে ! আরে যাঃ, করগে তুই বিয়ে, আর বিয়ে তো সেই রাত্তিরে, তার এখন কি ? সে আমি ঠিক সময়ে হাজির হব'খন, ভাবতে হবে না তোকে।

কি বলব মশাই, কত বলা, অনুরোধ উপরোধ, শেষ পরে এলে গেলুম। খালি বলে, বিয়ে যে-কোন সময় করা যাবে, কিন্তু ভাই আজকের দিন মিস্ করলে জানে মারা যাব। কি আর করা, ওর জায়গায় লাইনে আমি গিয়ে দাঁড়ালুম, সারা দিনমান ওর হয়ে ফিল্ডিং করলুম, উপোসী থাকবে বেচারা, ধকল তো কম নয়, খেলা শুরু হবার আগে ও এসে পড়ল, আমি রেহাই পেয়ে বাড়ি গেলুম। তারপরই মশাই, আমাকে খেলা দেখাবার জন্যে ও উঠে-পড়ে লাগল, গালমন্দ, প্রলোভন, শেষে বন্ধুবিচ্ছেদের নোটিশ দিয়ে আমাকে মাঠে টেনে আনলে। এদিকে আমার তো ওই অবস্থা, যতই চরম হয়ে ওঠে, ও ততই বলে, একটু চেপে থাক না। আর চাপবো কি, চাপের চোটে আমিই অস্থির হয়ে যাচ্ছি। আমার দিকে চেয়ে হয়তো ওর হৃদয় গ্রিজ-মাখা বলের মত মোলায়েম হয়ে উঠল। বললে, খুব যদি বেশি হয় তো গ্যালারির তলে ঢুকে পড় না। ওর কথা শুনে লোক-বোঝাই তাবৎ গ্যালারি মাথার উপর ভেঙে পড়ল। চোখে নানা রঙ, নানা মেকারের কুসুমবাজি দানা বেঁধে উঠতে লাগল। যা থাকে কপালে বলে সোজা দিলুম দৌড়। এদিকে টিকিট বিক্রি শেষ। যত লোক ঢুকেছে তার তিন ডবল বাইরে মোতায়েন। গেট বন্ধ হয়ে গেছে। গেট বরাবর আসতেই মালুম হল বাইরে যেন সমুদ্র লেগেছে। এই, দরজা খোল। ওরে ও (কটুবাক্য) ভাই, টিকিট দে। নইলে পেঁদিয়ে বিন্দাবন পাঠাব। এবম্প্রকার পুষ্পিত বাক্যরাজি এবং ঢাস ঢুস শব্দে ইষ্টকখণ্ডাদি মাঝে মাঝে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তথাপি আমি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করে হুমড়ি খেয়ে গেট-কীপারকে বললুম, দরজা খুলুন। 'আমার অবস্থা তখন চরমস্য চরম মশাই ফুটবল মাঠ, কলকাতা শহর, এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লুপ্ত হয়ে গেছে, রঙিন হয়ে জেগে আছে শুধু এসপ্ল্যানেডের গুমটি আর এক মগ জল।

মরীয়া হয়ে বললুম, খুলুন, আমাকে ত্বরায় বের করে দিন মশাই।

অসম্ভব, কি করে তা হয়? শুনছেন না, বাইরেকার গজরানি, পিষে ফেলে দেবে। বললুম, পিসেই ফেলুক আর মেসোই ফেলুক, আমাকে বেরুতেই হবে। নিতান্ত না-ছোড় দেখে বললে, দেখুন, এভাবে তো হবে না, আপনি গ্যালারির ওপরে উঠে তারের বেড়া টপকে লাফিয়ে পড়ুন। তাই করলুম। কি-করে, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না।

ভদ্রলোকের কথা শুনে দমবেদম হাসছি। এর মধ্যেই আলোচনা উঠে পড়ল। এটা তো ঠিক কথাই, এত লোকের সমাগম যেখানে সেখানে আকস্মিক ব্যাপারের জন্য বন্দোবস্ত তো রাখাই উচিত, আমরা তো ফোঁকটসে আসিনে মশাই। দস্তুরমতো ট্যাঁকের পয়সা খর্চা করে খেলা দেখি। সুখ-সুবিধে কেন দেখবে না। ক্রমেই আলোচনা গরম হতে লাগল। ততক্ষণে আমরা জায়গামতো বসে গেছি।

চারপাশের লোকজনের রকম-সকম দেখে আমার তো খাবি খাবার অবস্থা। আফিসে বড়বাবু বড়সাহেবের কাছে যে-সব ব্যক্তি গরুড় পক্ষী, বাড়িতে গিন্নীর কাছে যারা কিনা কিঞ্চলুম (সাদা বাংলায়—কেঁচো), খেলার মাঠে সে-সব ব্যক্তিই এক-একজন রাবণ-রাজা। কি চেল্লানি! বাজি রেখে বলতে পারি, অত আওয়াজ একখানা গলা দিয়ে বেরোতে

পারে না। জুৎ মতো আওয়াজ না করলে ফিলিং দেখানো যায় কি-করে!

মাঠে খেলোয়াড় নামতে না নামতেই একদফা তুমুল গোলমাল —দু'দিকের গ্যালারি থেকে যেন যুগপৎ হাই-শট করে মাঠে ফেলে দিলে। ওঃ, দেখেছিস্ মাইরি কুমারের হাঁটা, এই পায়ে যা শট হাঁকড়াবে এক-একটা, শালা একেবারে ফায়ার করে দেবে। মান্না নেই ভাই, মাঠ কানা। হুড়মুড় সব এক সঙ্গে

উঠে দাঁড়াল। বললুম, দাদা, কাইণ্ডলি একটু বসুন না। বসুম কি মশয়, বইস্যা কি খেলা ছাহন যায়? এক কাম করেন, বাসায় যান গিয়া, তাকিয়া লইয়া খাটের উপরে উপুড় হইয়া রেডিও গিয়া হুনুন।

মুখের কথা মুখে পুরে দাঁড়িয়ে পড়লুম। ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। সবাই যদি মাঠ পানে চায় তো আমি চাই সবার পানে। আঃ দেখলেন পায়ের এলেমখানা দেখলেন, শালা বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখিয়ে ছাড়লে! মেরে দাও, পায়ে রেখো না, ধুত্তোরি, শালার খালি কেদ্দানি, ওয়ার্থলেস্! আহা-হা ছাখছেন নি, কেমুন একখানা শট্! পিকচার মশাই, পিকচার, গুড্ শট্, আরে আরে গো-ও-ও নাঃ, ওয়াণ্ডারফুল সেভ্ করছে। ওদের গোলী ব্যাটাচ্ছেলে একেবারে চাইনিজ্ ওয়াল। ফাউল, ও রেফারী, কানা, শালা চোখে দেখতে পাও না? মার্ হালারে মাইরা ফালা, ওই হালা লম্বু হাফ্, ওই মারছে,

চাক্কু চালা! গো-ও-ও, অফসাইড্, হ্যাঁ দেখলি অফসাইড্ দিয়েছে, ভেরি গুড্ জাজমেণ্ট। গোল। ওই যাঃ! গো-ও-ও-ল। ও হালা, ও হালার পো হালা, ও '—'র বাচ্চা, ও '—'র বাচ্চা '—', বাইর' ফিল্ড থিকা, যেডি ধইরা আচ্ছামত দিমু তোরে!

খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে ধাক্কা লেগেছে, জখম হয়েছে একজন, গ্যালারি মার-মার করে উঠল। ঠকাস ঠকাস জুতো ছুঁড়লে, আর মুখে যা লবজ্ ছাড়লে তার সিকির সিকিও লিখতে গেলে লজ্জায় কলমের কালি শুকিয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আমার চারিদিক অরণ্য হয়ে উঠল! মনে হল দাঁড়িয়ে আছি একপাল হিংস্র শ্বাপদের মধ্যে।

জোতা মার্ হালারে। বিপক্ষ দল ভালো খেললে তাঁদের দিকে খিস্তি-খেউড়। বিপক্ষ দল জিতলে পরে রেফারীর বাপান্তকরণ।

এমনি করে খেলা শেষ হল। টু টু ওয়ান্। হাওয়া গরম। দু'পা যেতে না যেতেই চট পট চটাস। শুরু হল মারপিট। জান্‌সে মার্ দো। শালা হারামীর বাচ্চাটাকে দে খতম। মার্ শালা, মার্ শালা রবে চতুর্দিক পূর্ণ হল।

মাথা বাঁচিয়ে শেষ সালাম ঠুকে বেরিয়ে আসতেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা। বললুম, এ কী মশাই, এই আপনার খেলা! মুচ্‌কি হেসে জবাব দিলেন, গোল দিয়ে যে খেলার ফয়শালা হয়,মশাই সে খেলায় গণ্ডগোল হবে না? আপনি আছেন কোথায়?

খেলোয়াড়-চরিত

বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছি। বাঘা বাঘা দুই টিম। কিন্তু খেলা হচ্ছে বেড়ালের বাচ্চার মতো। দুদিকেই তো শুনছি সব তা-বড় তা-বড় পেলেয়ার, কিন্তু খেলা দেখে মনে হচ্ছে, বলে আর তাদের পায়ে ভাশুর-ভাদ্দরবৌ সম্পর্ক। পা যদি এগিয়ে যায় তো ছোঁয়াচ লাগার ভয়ে বল জিভ কেটে ঘোমটা টেনে অন্যধারে সটকায়।

কিন্তু তাতে কি? দর্শকরা সমানে চেল্লাচ্ছেন। যার নাম রমণ তাকে বলছেন, ওরে রমণা, হালা খালি ড্রিবলিং করস্ ক্যান? পা—স্ করে দাও। ওঃ কি-এক শট্ ঝাড়লে ভাই, আরেকটু হলেই—হ্যাঁ ব্যাটার দোষই তো ওই, বড্ড গোলকানা। এ তো কথা নয়, যেন উড়ন-তুবড়ী, মুখ থেকে বের করে ম্যাচিস জ্বেলে দু পাশের গ্যালারি থেকে মাঠের মধ্যিখানে ছুঁড়ে ফেলছে। আর সেই তাতে তেতে উঠে মাঠের পেলেয়ার ঘুরে ঘুরে কতো কেদ্দানি দেখাচ্ছেন।

এই হৈ-চৈ, এত উত্তেজনা, তবু কেমন করে নজর পড়ল বৃদ্ধটির ওপর। চুপচাপ খেলা দেখে যাচ্ছেন। মুখে বিরক্তির ছাপ। কোন কথায় কান নেই, চোখ দুটে শুধু মাঠে। মনে হল যেন এ চেহারা কোথাও দেখেছি। কি যে একটা আকর্ষণ আছে ওই রুগ্ণ শীর্ণ অথচ ব্যক্তিত্বময় লোকটির

বোঝাতে পারব না। কিসের এক তাগিদে ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সবচেয়ে মজা হচ্ছে, খেলা যখন চলে, কেউই আর গ্যালারিতে বসেন না, উঠে দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলা দেখেন, কিন্তু বৃদ্ধটি দেখলুম কখনোই দাঁড়ালেন না। চুপ করে বসেই রইলেন। আমিও বসলুম। উনি ফিরে চাইলেন। বললেন, খেলা দেখলেন না? বললুম, আজ্ঞে দেখছি তো, মাত্তর বাইশ-জনের খেলা আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে কি ফয়দা, বসে দেখলে হাজার লোকের খেলা চোখে পড়বে। বৃদ্ধ বললেন, যা বলেছেন, বাইশজনের খেলাও আর দেখবার মতো নেই, এই কি ফার্স্ট ডিবিসনের লীগ খেলা! ছ্যাঃ! আমরা যখন বাতাবী লেবু পেড়ে 'বল' 'বল' খেলতাম, তাও যে এর থেকে ভালো হত।

সবিনয়ে তল্লাস নিলুম, আজ্ঞে খেলা-টেলা তাহলে আপনার আসত? ভদ্রলোকের ঘোলাটে চোখ একবার যেন জ্বলে উঠল। স্মৃতির মনি-ব্যাগটায় ঝাঁকুনি দিয়ে যেন একটা পুরোনো কথার দু'আনি বের করলেন। একটু নড়েচড়ে বললেন, নইলে আর কিসের টানে দিনের পর দিন ভিড় ভেঙে এখানে আসি বলুন। আপনি ইয়ংম্যান, আজকালের ছেলে, আমায় চিনবেন না, গোষ্ঠ পাল, মোনা দত্তের সঙ্গে এককালে পাল্লা দিয়ে হাততালি পিটেছি। সে সব কথা বাদ দিন। এখন গলিতনখদন্ত, এইমাত্র সত্য পরিচয়।

বৃদ্ধের কথায় আত্মনিপীড়নের যে জ্বালা ছিল, আমার অনুভবে তা হুল ফোটালে। তক্ষুনি একদিকে বোধ হয় গোল হল। তুমদাম নৃত্যে গ্যালারি মচ্‌ মচ্‌ করতে লাগল। বৃদ্ধ সেদিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ঘৃণা ও অনুকম্পা যেন হাত-ধরাধরি করে এসে ভদ্রলোকের মুখে বসল। বললেন, এই, এই হাততালিই সব সর্বনাশের মূল। এই যে দর্শক দেখছেন, ভালো করে চেয়ে দেখুন তো এদের মুখের পানে, কি অসুস্থ, কি ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে মাঠ পানে! এই সহস্র ক্ষুধার্ত দৃষ্টির শিকার হচ্ছে ওই বাইশটি হতভাগ্য। এই দর্শকদের পাশবিক উল্লাসের

জোগান দিতে বলি হবে ওই বাইশটি ছাগশিশু। একদিনে নয়, দিনে দিনে, তিলে তিলে। যতদিন দম আছে, গায়ে জোর আছে, চোখে তেজ আছে ততদিন হাততালিই প্রাপ্য, কিন্তু যেই বুটের ঘায়ে শিন্‌বোন ভাঙল, উড়ে গেল হাঁটুর ওপরকার মালা, চোরাগুঁতোয় কিডনির ব্যামো হল, ফর্মটি গেল, ব্যস্‌, মাথার ওপরে ছিলেন তো মুহূর্তে নামিয়ে দেবে পায়ের তলায়। যতদিন খেলা ঠিক ছিল, যেন বাদশা ছিলুম। সতেরো বছর ধরে গড়ের ময়দানে লোকের চোখে চোখে মুখে মুখে ফিরেছি। কাগজে কত ছবি, মেয়েদের কাছ থেকে কত চিঠি, কত ফটো। রাতদিন খেলা খেলা করে মশগুল হয়ে থাকতাম। কিসের চাকরি আর কিসেরই বা টাকা রোজগার। তখন আমি 'স্পোর্টস্‌ম্যান।' আমার নামে লোকে তখন পাগলা হয়ে যাচ্ছে ; এখানে যাচ্ছি, ওখানে যাচ্ছি, রাজা-মহারাজার 'অনার্ড গেস্ট' হিসেবে খাতির যত্ন পাচ্ছি, আমার নাগাল ছোঁয় এমন লম্বা হাত কার! ফুলের তোড়া আর মালার ফুল নিত্য খেয়ে আমার পোষা ছাগলটা মোষ হয়ে উঠল।

তারপর একদিন মুখ থুবড়ে মাঠে পড়লাম, আমার দোষে নয়, এক ছোকরা খেলোয়াড়ের চোরা ঘায়ে। দোষ দিইনে তারো, তার তখন উঠতি বয়েস, গায়ে পায়ে তেজ একেবারে উপচে পড়ছে। পায়ের হাড় ভেঙে গেল আমার। জোড়া লাগল, তবে ব্যথা আর সারল না। শটের জোর কমে এল, ভয় ঢুকল প্রাণে। খেলা খারাপ হয়ে গেল। তবু পুরোনো নামের জোরে মাঠে নামি। আমার ইচ্ছা থাক বা না থাক, ক্লাব-কর্তাদের হুকুম। নামের জোরে কিছু টিকিট বিক্রি হয় কিনা। কিন্তু গ্যালারির দিকে আর চাইনে। হাততালির বদলে সেখান থেকে আসে টিট্‌কারি।

বৃদ্ধ চুপ করলেন। তখন চারদিকে উল্লাসের তাণ্ডব চলেছে। ছাতা উড়ছে, জুতো উড়ছে, উর্ধ্ববাহু নৃত্যের ধাক্কা ঘাড়ে পড়ে পাছে, তাই গা

বাঁচিয়ে বসে আছি। একজনের নাম ধরে শতকণ্ঠে 'বাক্-আপ্' দিচ্ছে, 'হুররে' দিচ্ছে। গোলমাল থামল। বৃদ্ধ শুরু করলেন, তারপর মাঠ ছাড়লাম। গ্যালারিতে এসে বসলাম। গোরু যতদিন দুধ দিলে ততদিনই তার খাতির খেদমত, যেই বুড়ো হল, আর দাও কসাইকে বেচে। আর তাকে কে পোঁছে? আমরাও এখন কসাইখানায়। অবিশ্যি আমরা গোরু নই, ষাঁড়, কি বলেন? নিজের রসিকতায় হাসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না, ঠোঁটের কাঠগড়ায় রেখে হাসিটাকে যেন পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটলেন।

খেলা ভেঙে গেল। মাঠ খালি হল। অজস্র পরিত্যক্ত কাগজের ঠোঙা এখানে ওখানে উড়ে বেড়াতে লাগল। সমস্ত মাঠময় সন্ধ্যা নেমে এলো। আমার মনে হল এই সন্ধ্যাটি যেন ওই বিগতকীর্তি বৃদ্ধ খেলোয়াড়টির চাপা দীর্ঘশ্বাস, ব্যর্থতার করুণ আফসোস।

বৃদ্ধটি কখন উঠে চলে গেলেন, বুঝতে পারিনি; কোথাও আর তাঁর খোঁজ পাইনি। এই বৃদ্ধটিকে খুঁজতে গিয়েই বিভিন্ন ক্লাবে, বিভিন্ন মাঠে আমাকে যেতে হয়েছে। সেখান থেকেই বিভিন্ন সূত্রে খেলোয়াড়দের নানারকম খবরাখবর পেয়েছি।

ফুটবল নাকি বাংলায় সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। লক্ষ লক্ষ লোক ফুটবল বলতে পাগল। ক্লাবগুলিতে অজস্র টাকা চাঁদা ওঠে, বিলাস-ব্যসনে সে টাকা নিয়ত উড়ে যায়; কিন্তু সর্বত্র দেখেছি যাদের জীবনের স্বর্ণময় মুহূর্তগুলির বিনিময়ে এই আমোদ, এই ফূর্তি পরিবেষিত হচ্ছে, সেই হতভাগ্য পুরোনো খেলোয়াড়দের জন্যে একটি আধলাও কেউ বের করছেন না। বহু খেলোয়াড় ব্যাধি-জর্জরিত অবস্থায় অশেষ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

খুঁজে খুঁজে একজনের বাড়ী পৌঁছুলাম। তখন সন্ধ্যে। হাঁফানি রোগে ভুগছেন। একগাদা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সে যে কী অবস্থা, বর্ণনা

করব কি-করে ? কোন কথাই বলতে ইচ্ছুক নন। কি হবে বলে ? কার কাছে বলা ? এখন তো আর কানাকড়ি দাম নেই। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ক্লাবে গিয়েছিলেন, বেনিফিট্ ফাণ্ড থেকে যদি কিছু সাহায্য মেলে। ক্লাবের সঙ্গে তাঁর যোগ একআধ বছরের নয়। বারোটি বছরের। ক্যাপ্টেন হিসেবে একটা ফটোও ঝোলানো আছে ক্লাব-ঘরে। আর আজ সেক্রেটারীর ভাব দেখে মনে হল, চিনতে বেশ কষ্টই পেলেন যেন। তারপর বললেন, ও হ্যাঁ, কি খবর ? তা আর একদিন আসুন না। এবারে টাকা-পয়সার বড়ই টানাটানি। পেলেয়ার আনতে বিস্তর খর্চা হয়ে গেছে, বুঝলেন। শুধু তো আনালেই হল না, মেণ্টেন্যান্সেও তো খরচ আছে। দিনের পর দিন খরচ তো বাড়ছেই। হার্ড কম্পিটিশন, বুঝতেই তো পারেন। বুঝতে পারছি আপানার কিছু টাকা পেলে সুবিধে হত; কিন্তু কোন উপায় নেই। নো মানি—তা ক্লাব তো আপনারও বটে, কিছু 'স্যাক্রিফাইস' আপনিও করুন না। একরাশ মোটরের ধুঁয়ো গায়ে ছুঁড়ে তিনি মাঠের দিকে ছুটলেন।

আমাদের অবস্থার কথা বলে কি হবে ? ডজনখানেক টি-বিতে ভুগছে। একজনের দুচোখ অন্ধ হয়ে গেছে। আরো অনেকে আছে, যাদের স্ত্রী-পুত্র অর্ধাহারে অনশনে দিন কাটাচ্ছে। চাকরি ? পাই বই কি। যতদিন 'ফর্ম' থাকে, আপিসে আপিসে লোফালুফি পড়ে যায়। আড়কাঠির দল ঘুরতে থাকে। ভালো পেলেয়ার জোগাড় করে দিতে পারলে মোটা দাঁও মেলে তাদের। ভালো খেলোয়াড় আপিসে এলে

'অফিস-লীগ' জেতবার খুব সুবিধে, তাই একটা পোস্টে নিয়ে নাও তো এখন, নইলে অন্য অফিসে আবার ভিড়ে যাবে। চাকরি পেলুম, জামাই-এরও বোধ হয় শ্বশুরঘরে এত কদর হয় না। কোন কাজ নেই। পাঁচ মাস ধরে শুধুই খেলা। রেস্ট নেই, ভালো ফুড্ নেই, কোত্থেকে ভালো খাওয়া জুটবে, ট্যাঁক যে রা কাড়ে না। খেলার ফর্ম পড়ে যায়। আর অমনি অফিস থেকে 'দূর দূর'। যে বেকার, সেই বেকার।

এমেচার' 'এমেচার' করে ধাপ্পা দিয়ে রেখেছে। পেটে ক্ষিধে অথচ মুখে বারফাট্টাই। এর থেকে 'প্রোফেশনাল' হওয়া ভালো। দশজনের সামনেই রোজগার করা যায়। আজকাল আবার কে 'এমেচার' মশাই? এই যে বাইরে থেকে খেলতে আসছে, ওদের মধ্যে এমেচার কোন্‌টি? আড়কাঠিরা দিকে দিকে বেরিয়ে গিয়ে যাদের সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট সই করে আসেন, তারা কি ফোঁকোটিয়ার মাল? দস্তুরমতো পকেটে হাজার, বারশ', দু-হাজার টাকা গুঁজে তবে তাদের আনতে হয়। ভালো হোটেলে রাখতে হয়, আর যাবতীয় বস্তু সাপ্লাই দিয়ে ওদের তুষ্ট রাখতে হয়। বেলেল্লাপনা বড় ছোঁয়াচে, বুঝলেন, বাতাসের সঙ্গে ছড়ায়। ওই হাওয়া আমাদের এখানকার ছোকরাগুলোর গায়েও লেগেছে। ক্লাবের কর্তারাও লাই দিয়ে দিয়ে ওড়াচ্ছেন ছোঁড়াগুলোকে। সে আমাদের আবহাওয়া আর নেই। জাহান্নমে গেছে মশাই বাংলাদেশের ফুটবল। কার ক্লাব তার ঠিক নেই। এ-বছর এ-ক্লাবে তো সামনের বছর ও-ক্লাবে। যে যত লোপানি দেখাতে পারে তার দুয়োরে তত ভিড়।

তবু বি ডিবিসন একটু পদে। কিন্তু সেখানেও উপসর্গ জুটেছে ভালো ভালো ছোকরাদের আড়কাঠিরা গিয়ে পাকড়াচ্ছে, আর এ ডিবিসনে এনে ভর্তি করছে। প্রথম দিকে একটা দুটো খেলায় নামিয়ে বসিয়ে রেখে দিচ্ছে সারা বছর। একটি বছর যদি উঠতি ছোকরা বসে বসে ক্লাব টেন্টের ঘাস নিড়োয় তবে তার খেলা আর কি করে বজায়

থাকে বলুন। অন্য ক্লাব যাতে ভালো খেলোয়াড় নিতে না পারে, তার ফন্দি। কত কীর্তি, কত পাপ যে জমা হচ্ছে, তার হিসেব কে রাখছে।

ভদ্রলোক বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, আমার বংশে কেউ যেন আর ফুটবল না খেলে সেই দিব্যি দিয়ে রেখেছি।

কথা শেষ হতে না হতেই ভদ্রলোকের ছেলেটি ঢুকল। সর্বাঙ্গে কাদা মাখা। এক হাতে একটি কাপ, অন্য হাতে একটি বল। বাপের সামনে পড়েই থতমত খেয়ে গেল। ভদ্রলোক বাঘের মতো ছেলের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেন। হারামজাদা বদমায়েস, আবার বল হাতে করেছিস! একশ' দিন না মানা করেছি? আজ মেরেই ফেলব। বলেই পাগলের মতো কিল-চড়-ঘুষি। চেপে ধরলুম। বললুম, কি করছেন! সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, বল বল, আর খেলবি ফুটবল? এই ছ্যাখ্, তোর বাপকে ছ্যাখ্! কাপ, মেডেল আর একটাও নেই, সব পেটে চলে গেছে; এখন ছ্যাখ, এই হাত ছ্যাখ্, ভাঙা, পা ছ্যাখ্, ভাঙা, সর্বশরীর জরজর। পেটে অবিশ্রান্ত ক্ষিধের কামড় আর মনে ব্যর্থতার হাহাকার।

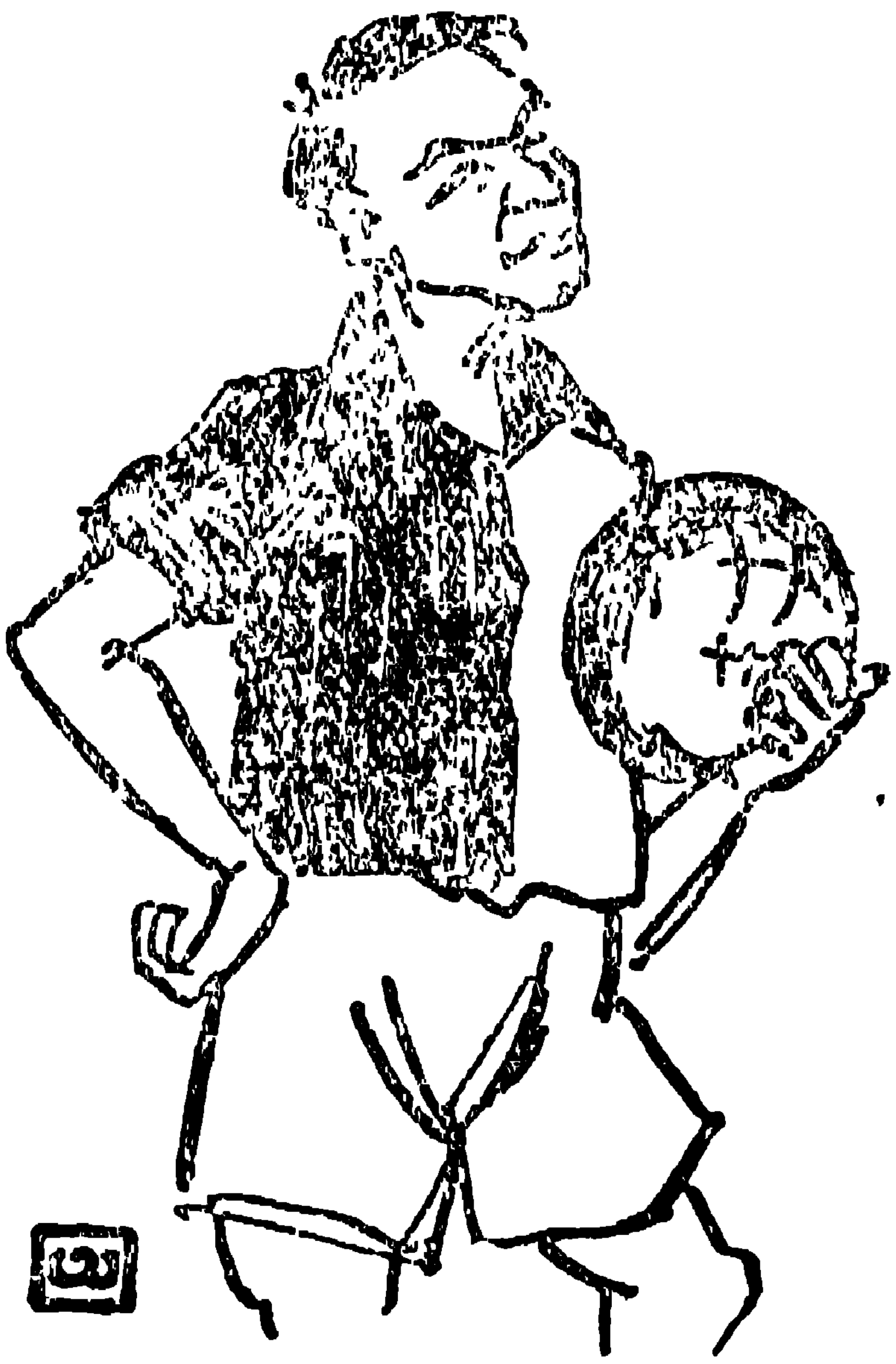

যত দ্রুত পারি চলে এলাম। কিন্তু কানে লোকটির যে হাহাকার ধ্বনিত হল, তার হাত এড়াতে পারলুম কই?

কলকাতায় সার্বজনীন

কলকেতার তুর্গোগো পূজোয় ধুম বাড়ছে। পূজো পাব্বনে গুষ্টিসুখের মওকা মেলে ষোল আনার ওপরে আরো আধ আনা। বাঙালী বড় ইয়ারে জাত। ইয়ার বক্সী নিয়ে একটু আধটু লদ্‌কালদ্‌কি যদি না করা গেল তো ফ্যালনা প্রাণ রাখা কেন? আর তুর্গোৎসব, কে না জানে, পাবলিক প্রপারটি। পূজোআচ্চাটা তো প্যায়দার পাগড়ি, না থাকলে ভালো দেখায় না তাই বুড়ি ছুঁয়ে রাখা। আসল রবরবা তো ফূর্তিতে। ভক্তি বলে পূজোর যে অঙ্গটা ছিল, ব্যাপার দেখে জান বাঁচাতে সে ডিক্‌শনারিতে ঢুকেছে। এখন 'যো কুছ হোতা সব মৌজ কে বাস্তে।'

কোত্থাও কিছু নেই, কানাত পড়ল অমুক পাড়ার সার্বজনীন তুর্গোৎসব! ব্যস্, পুলক ঘুম ভেঙে শরীরের মধ্যে চাগিয়ে উঠল। তাকে আর পায় কে। বাপের যে কেলাসের পুত্তুররা তুধে-ভাতের আমলে বরযাত্তর যেতেন, এখন সে ব্যবসায় মন্দা দেখে রকবাজীতে রকফেলার বনেছেন, কাজের গন্ধে সে সব মক্কেল চনমন করে উঠলেন। পাজামার কষি আঁট করে হাওয়াই শার্টের আস্তিন চুমরে এবার আসরে নেমে পড়লেন। কম্ম কি, না চাঁদা আদায়।

আরে ধ্যাৎ, চাঁদা আদায় তো ফোড়ার ওপর তোক্‌মার পুলটিশ মশাই, ভদ্রলোক চোখ মটকে বললেন, আগে ফোড়া পাকুক। সব প্রথম কমিটি মশাই, আর এখেনেই তো সূতোর মতো গেরো। যাদের পিড়িং পিড়িং নাচতে দেখেন তারা তো সব এই সূতোয় বাঁধা নাচের পুতুল। ভাবেন বুঝি এই প্রিসিডেন্ট সিক্রিটারীরা যেসব ঝক্কির বোঝা

কাঁধে ফেলে ধেই ধেই নৃত্য করছে তা বুঝি সেরেফ ঘরের খেয়ে বাগানের মোষ তাড়ানো ?

তা নয় রে দাদা, নয় রে।
দেখছ যেসব নয়ের বাজী
তার নিচেয় যে সব হয় রে॥

কবির কথা এক বর্ণ মিথ্যে নয়। নয়ের নিচেই যাবতীয় হয়। সেই তো আসল চক্র। এই যে দেখছেন পাড়ায় পাড়ায় সার্বজনীন, এগুলো কি জানেন ? সিঁড়ি। এই সিড়ি যার হাতে সে তরতর করে উঠে যাবে। কর্পোরেশনে বলুন, কৌন্সিলে বলুন, তার রাস্তা শেষ রাত্তিরের চৌরঙ্গীর মতো কিলিয়ার। কে ঠ্যাকায় ? তাই তো বলছিলুম পূজো-আচ্চা পরের ব্যাপার, ঘরের ব্যাপার ইলেকশন।

যারা তোমার গাড়ি টানবে তাদের দানাপানি দিতে হবে বই কি ? এই যে দেখছেন বছরের পর বছর দাদের মতো সার্বজনীন বাড়ছেই, সে কি অকারণ ? যাকগে মশাই, ঘরের কেচ্ছা আর ফাঁস করব না, ভলান্টিয়ার দাদারা গুলো ফুলিয়ে পথের ধারেই বসে। তবে চোখ কান খুলে রাখুন, মজা আপনিই ভেসে উঠবে।

কোনোদিন পূজো-কমিটির কর্মকর্তাদের লিস্টি দেখেছেন ? সে লিস্টিতে কাদের নাম ? ঝুনঝুনবালা আগরবালার ব্যাটা থেকে খবরের কাগজের মাতব্বররা অব্দি এক ফরাসে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। কলকাঠি যাদের মুঠোয় তারা এক একজন আস্ত ঘাঘুর ছানা। মস্ত কারিগর মশাই, হেঁজিপেজি নয়, কিং-মেকার। আঙুল নেড়ে রাজা গড়েন, আঙুল নেড়ে রাজা ভাঙেন। ঝুনঝুনবালা আগরবালা প্রেসিডেন্ট হলেন, কেন না রেস্ত জোগান তাঁরা। খবুরে-কত্তারা আছেন কোন্ কম্মে ? না, পাবলিসিটি। একজনকে বাগাতে পারলেই প্রিতিমে গড়ার উদ্বুদ্ধ থেকে বিসর্জনের কোলাকুলি পর্যন্ত কাগজের পাতায় ছবি উঠবে।

কমিটি গড়ার পর প্রিতিমে গড়ার বায়না, এর মধ্যিখেনে চাঁদা সাধার ভলেণ্টিয়ার চালান। নতুন জুতোর যেমন ফোস্কা, দুগ্‌গো পূজোর তেমন চাঁদা। আহার নেই নিদ্রে নেই, ফেউ-এর গুঁতোয় ফেরার হবার দাখিল। পাড়ার বাসিন্দে, দুবেলা মুখ-দেখাদেখি, সেই সুবাদে চাঁদা দাও। আর তাও কি এক জায়গায় মশাই, তের ঘর লোক তার তেইশটে পূজো। এতজনকে তুষ্ট করতে হাফ মাইনে কাবার। ছাপোষা লোক, কেরানীর বাচ্চা, বাকি মাস বুড়ো আঙুল চোষো। 'না' বলার কি জো আছে, ঘাড়ের মাথা পথে লুটোবে না? পাড়ায় কি বাস করতে পারবেন তারপর? দাপটের চোটে ঘরের ভিত কেঁপে উঠবে না? বলব কি, মোড়ের পানঅলার দুর্গতি স্বচক্ষে দেখে ভয়ে হাত পা পেটে সেঁধিয়েছিল, মেয়ের মাকড়ি বন্ধক রেখে শেষপরে চাঁদা মেটাই। পানঅলা বললে, বাবু, দুটাকা দিই এবারে, আরো অন্যকেও তো দিতে হবে। ছোকরা বললে ঃ

কি কতাই বললে সোনা
জুইড়ে গেল অঙ্গ,
উড়িষ্যায় দাতব্য কর
বাড়ি তোমার বঙ্গ।

তোমার ঘরের পাশে পূজো, সেথা ছেড়ে টাকা দেবে ভিনপাড়ায়? মাইরি! তাছাড়া কমিটি তোমার নামে ধরে রেখেছে দশটি মুদ্রা, আমরা তার কমে নিই কি করে? পানঅলা বললে, অত টাকা পাব কোথায় বাবু? ছোকরা বললে, সে খপোর কি আমার রাখবার। দেরি কোরো না, টাকা মিইটে দাও মাইরি, আরো দশ বাড়ি যেতে হবে। পানঅলা বললে, দুটাকার বেশি দেবো না। কথা শুনেই ছোকরা লাফিয়ে উঠলে। বললে, খুব রোয়াব হয়েছে, না? দশ টাকা তোমাকে দিতেই হবে। ঝামেলা না বাধিয়ে চটপট বিদেয় করে দাও ব্রাদার। পানঅলা বললে,

কেন ঝামেলা করছেন বাবু, দুটাকা দিচ্ছি লিয়ে যান। ছোকরা আগুন হয়ে বললে, শালাচ্ছেলে, হামলোক কি ভিখিরি হ্যায়? এ আমার ফাদার্স ছেরাদ্দ নয়, দশজনের কাজ। যা ধরা আছে তোমার নামে তাই চাই। এক আধলাও কম নয়। বেশি তেড়িবেড়ি করলে পেঁদিয়ে বিন্দাবন দেখাব। এখন ভালো কথায় চাইছি দিচ্ছ না, শেষপরে বাপ ডাকবে আর টাকা দেবে।

ভদ্রলোক বললেন, তাই হল মশাই। দশ টাকাই দিলে পানঅলা, মাঝখান থেকে তার আয়না ভাঙল মাথা ফাটল। তাই মশাই চাঁদা সাধার দঙ্গল দেখলে পিঠটান মারি।

স্বাধীন হয়ে আমাদের রসবোধ কমেছে, রোষবোধ বেড়েছে।

হুতোমের আমলেও দুর্গোপূজোয় বিলক্ষণ ধূম হত। সেকালের বাঙালীবাবুরাও আমোদ-আহ্লাদ করতেন। তখনো চাঁদা সাধতে দল বেরুতো। কিন্তু টেকনিক ছিল অন্য।

হুতোম লিখছেন, একবার একদল বারোইয়ারী পূজোর অধ্যক্ষ শহরের সিংগিবাবুদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত, সিংগিবাবু সে সময় আপিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষরা চার পাঁচজনে তাঁকে ঘিরে ধরে "ধরেছি" "ধরেছি" বলে চেঁচাতে লাগলেন। রাস্তায় লোক জমে গ্যালো। সিংগিবাবু অবাক্—

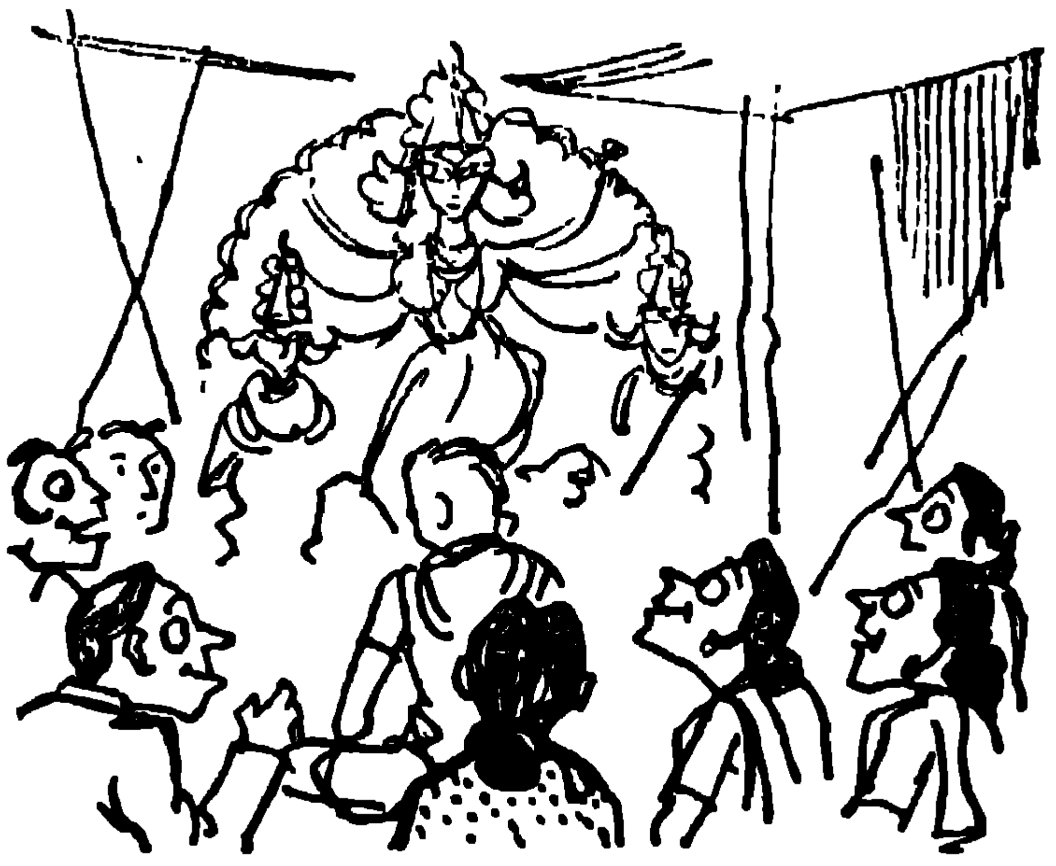

ব্যাপারখানা কি? তখন একজন অধ্যক্ষ বললেন, "মহাশয়! আমাদের অমুক জায়গার বারোইয়ারী পূজোয় মা ভগবতী সিংগির উপর

চড়ে কৈলাস থেকে আসছিলেন, পথে সিংগির পা ভেঙ্গে গ্যাছে ; সুতরাং তিনি আর আসতে পাচ্ছেন না, সেইখানেই রয়েচেন ; আমাদের স্বপ্ন দিয়েচেন যে, যদি আর কোন সিংগি জোগাড় কত্তে পার, তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথাও আর সিংগির দেখা পেলাম না ; আজ ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়েচি, কোনমতে ছেড়ে দেবো না—চলুন! যাতে মার আসা হয়, তারই তদ্বির করবেন।" সিংগিবাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারী চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কল্লেন।

আর এখন ? সেরেফ মুষ্টিযোগ। যুগ বদলেছে। কায়দা বদলেছে। প্রিতিমের গড়ন পেটনও বদলেছে। দুর্গা আগে ছিলেন রণরঙ্গিণী এখন হয়েছেন রঙ্গরঙ্গিণী। মা অবিশ্যি এখনো সিঙ্গি দাবড়াচ্ছেন। তবে কালের গতিকে সিনেমার তারকাপ্রায় ঝক্‌ঝক্ কচ্ছেন। দিন দিন বয়েস কমছে। চেহারা দেখলে কে বলবে অতগুলো ছেলেপুলের মা। কলকাতায় শাড়ির ফ্যাশান নিত্যি। প্রিতিমের ফ্যাশান তাকেও পাল্লা মারছে। এবারেই তো এক জায়গায় দেখলুম অসুর মায়ের দিকে চেয়ে আছে, দুজনের চোখের দৃষ্টি এসে দুজনের চোখে মিশেছে, কি যে আহা-মরি দৃশ্য, যেন ছাঁদনাতলায় শুভদৃষ্টি হচ্ছে! কুমোরের পো-রা কোমর বেঁধে আর্ট করতে লেগেছেন, জল কদ্দূর গড়ায় তাই দেখছি।

পূজোর কদিন আর যাই হোক, যার অন্দরে যাই থাক, ছেলে বুড়োর ফূর্তির স্রোতে জোয়ার জেগেছিল। মেয়েমদ্দ কাচ্চা-বাচ্চার বন্যায় মিনিটের পথ ঘণ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনের জ্বালা পেটে পূরে বাঙালী এই কটা দিন মুখে হাসির থালা সাজিয়ে রেখেছিল।

মণ্ডপে মণ্ডপে মেয়েদের ভিড়, প্রিতিমে দেখতে এসেছেন। আর তার পেছনে সদ্য গোঁপদাড়িতে রেজর ঘষা ছেলের পাল, মেয়ে দেখতে বেরিয়েছে। এক মণ্ডপ থেকে ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়েছি, শুনলুম এক ছোকরার গলা, পেঁচো, এই কর্নারটায় একবারটি চেয়ে ছ্যাখ, উস্‌প্‌, কি একখানা খাস্তা চীজ্‌! চ' একটু পেছু নিই। পূজোর এই এক মজা মাইরি, নির্খর্চায় চোখের সুখ করে নেওয়া যায়, কি বলিস। পেঁচো অতি উৎসাহে এক-নজর চেয়ে নিয়েই গম্ভীর হয়ে গেল। ছোকরা বললে, কি রে, ন'রমে গেলি কেন, পা চালা, শেষপরে কোন্ ভিড়ে তলিয়ে যাবে, ব্যস্‌! পেঁচো বললে, ধ্যাৎ, ওযে আমার দিদির মেয়ে! ছোকরা বলে উঠলে, ভেরি সরি, কিছু মনে করিসনি ভাই। ওই ওই ছ্যাখ, আরেকটা পাঞ্জাবী রে! পেঁচো বললে, যা বলেছিস্‌, চল শালা, আবার নজর-ছাড়া না হয়। চোখের সামনে দুজন মিলিয়ে গেল।

কথা হচ্ছিল এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। বললেন, সবই হচ্ছে মশাই, কিন্তু পূজো বলতে মনে যে আনন্দের একটা জোয়ার আসতো তা কই? ইস্কুল-কলেজে পড়েছি, পূজোর ছুটি আসবার একমাস আগে থাকতেই নাওয়া খাওয়া ছুট হত। কবে গ্রামে ফিরব। গ্রামে আর শহরে তফাৎ এই-ই। সেখানে জাঁক কম, কিন্তু মনভরা আনন্দ। পূজো মানে সেখানে বৎসরান্তে মিলন। শহরে জাঁকটাই আসল, মনের আনন্দে বিরাট ফাঁক। এখানে কেবল বারফট্টাই। কে কাকে কাৎ করবে সেই চেষ্টা শুধু। শহর থেকে থিয়েটার দেখে দেশে যেতুম, বড় বড় অ্যাকটরের রং ঢং ইস্তক মেক-আপটুকু অব্দি কার্বন কপি করে নিয়ে যেতুম। তারপর রাতের পর রাত পেলে করাটাই ফুর্তি, কেউ দেখলো না দেখলো বয়ে গেল। আমাদের কথা হল, কষ্ট করে যখন স্টেজটা-আশটা 'বাঁধিছি ছাঁদিছি', তখন অ্যাক্টো করবই, ঠ্যাকায় কেডা।' সে-সব দিন আর আসবে না। তখন ছিল সহযোগিতা আর এখন

হয়েছে প্রতিযোগিতা। গ্রামের লোক শহরে এসেছে, সেই নাচনে মেতেছে। এক কলোনীতে গিয়েছিলাম, দেখলাম কি জানেন, দশখানা পূজো, সবই সার্বজনীন। এক সার্বজনীনে গিয়ে দেখি লাউডস্পীকারে তারস্বরে 'ও মেরে মন কা রাজা, আজা আজা আজা' বাজছে। ঘোলা ঠেকল। ইলেকট্রিক নেই, লাউডস্পীকার চলছে কি প্রকারে? তত্ত্ব নিয়ে দেখি, ধ্বকস ধ্বকস ডাইনামো চলছে। কলকাতা থেকে আমদানী। নগদ শ রুপেয়া খর্চা। জিগ্যেস করলুম, পূজোয় কি কি অনুষ্ঠান হল? কর্ম্মকত্তা এক ফিরিস্তি দিলেন। বললেন, লাউড-স্পীকারে অনেক টাকা গ্যাছে। শ-এর উপরে (এক শ'রও বেশি) বললুম, লোকজন, আতুর ভিখিরী খাওয়ান নি? ভদ্রলোক এক গাল হেসে বললেন, হে ক্ষ্যামতা কই, রেফিউজী-গো পূজা, বোঝতেই পারেন। তা ছাড়া, এই কলোনীতে দশটা সর্বজনীন অইছে। চাঁদা ত্যামুন উঠে নাই।

বলুন তো মশাই, কথাটা কি সার্বজনীন না সর্বজনীন? না কি খর্বজনীন?

রূপহির জাপান-যাত্রা

বিদেশ যাওয়া দূরে থাকুক, শুধু যাবার কথা শুনেই আক্কেলখানা গুড়ুম হয়ে গেল। তবে কিনা রুপেয়া-পয়সার টান জবর টান, তাই রাজী হলাম। খাই-খরচ, পোশাক-আশাক দেবে, তার উপরে মাস গেলে আড়াই শ টাকা। ফরেস্ট অফিসার বলতে হাঁ কবুল করলাম, কিন্তু মন থেকে ডর ভাগাতে কাহিল হল হালত। কোথায় কোন্ বিদেশে যাব, না জান না পয়চান। যেমন পানির তলে, গাড়া গর্ত কোথায় আছে, তালাস পাব কি করে। চেনা মাটির শড়ক ছেড়ে আন্দাজে হোথা পা বাড়ালেই, ব্যস্, শমন ধরবে চুলের মুঠি। বিদেশ যেতে তাই এত গা ছমছম।

মাহুত হাদিস খান বল্‌তে থাকে, পাস-পোর্টে আমার বয়েস লিখেছে তিরিশ। কিন্তু এই এত বচ্ছরের জীবনে, গাঁও ছেড়ে বাইরে আসা বড় একটা ঘটে ওঠেনি। দৈবে ভবিষ্যতে কখনো-সখনো শহর বলতে দেখে এসেছি ডিব্রুগড়, তা তখন তাকেই ভেবেছি দুনিয়ার সেরা। তারপর এই প্রথমবার গেলাম কলকাত্তা। বাস্‌রে, কি শহর! ডিব্রুগড় যদি মাচিস্-কাঠির আলো তো কলকাত্তা আট ব্যাটারির টর্চ বাত্তি। তারপর গেলাম জাপান, দেখলাম শহর টোকিও। এর কথা বলব জবানে আমার এমন তাকত নাই। কলকাত্তা যদি আমার হাতের টর্চের বাতি তো টোকিও আসাম মেলের সার্চ লাইট।

এইটুকু বলেই হাদিস খান থামলে। একটু দম নিলে। গাট্টাগোট্টা শরীরটাকে টুলের ওপর একটু নড়ালে। মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোখ দুটো হল জ্বলজ্বলে।

জু-বাগান দেখতে গিয়েছিলুম এপ্রিল মাসের গোড়ায়। সেইখানে

হাদিস খানকে প্রথম দেখি। বোকা-বোকা, মফস্বল থেকে সদ্য আসা, এক মাহুত। একটা বাচ্চা হাতীর গায়ে তেল মালিসে ব্যস্ত। কথাবার্তা দু' চারটে বললুম। একটুখানি খবর পেলুম। হাতীটা যাবে জাপানের কিয়োটো জু-তে। জাপানী ছেলেমেয়েদের কাছে পণ্ডিত নেহরুর প্রীতি-উপহার। এবারের হাতীটা দিচ্ছেন আসাম সরকার; মাখুম জংশন থেকে এই বাচ্চাটা আনা হয়েছে। এর নাম রূপহি, বয়েস পাঁচ বছর।

হ্যাপা কি কম সামলাতে হয় মশাই, জু-বাগানের মেজকর্তা-সেজকর্তা গোছ কে একজন বলে বসলেন। এই দেখুন না, হাতী এসেছে আসাম থেকে, যাবে জাপান, কিন্তু খুঁতো হয়ে পড়লো কিনা, মাথায় ঘা হয়েছে এখন তো এ হাতী পাঠানো যাবে না, বুঝুন একবার, তাই ঝামেলা পড়ল আমাদের ঘাড়ে। আরে, এক স্থানের মাল যাচ্ছে অন্য স্থানে, আমরা তো না-খুড়ো না-জ্যাঠা, জড়িয়ে পড়লুম ভ্যাজলে। কেন? না এখান থেকে যে শিপিং হবে, রূপহিকে জাপানী জাহাজের কাপ্তেনের কাছে বহাল তবিয়তে জিম্মা করে দিতে হবে। এখন ঘা না-সারা ইস্তক থাক্ পড়ে এখানে, তাই রয়ে গেছে। সঙ্গে মাহুত হাদিস খান। হাতীর সঙ্গে সেও এসেছে।

হাদিস খান বললে, শুরু শুরু বাড়ির জন্যে মন কেমন করত। এতদিন তো কখনো ঘরছাড়া থাকিনি! বাপ মা আছে ঘরে! আমার এক বাচ্চা আর তার মা আছে ঘরে। এদের থেকে ভিন্ন থাকিনি কখনো। মন খারাপ করল আর শরীর নরম হল। দিলে সুখ পাইনে। খেলে হজম হয় না। করি কি? সাহেবকে বললাম ছুটি দাও, তো সাহেব গররাজী। বলেন, এই তো এলে সেদিন, এখন আবার ঘর যাওয়া কেন? তো তবিয়ত খারাপের হিসাব দিতে পনের দিনের ছুটি মিলল। গেলাম সিধা ঘর। দুই দিনে সব বেমারী ছুটে

গেল আমার। খুশির ভুঁয়ে পড়ল বৃষ্টির ছাট। মরা বাগিচায় জীবন এল। কিন্তু ঠিক দুদিন, বেশি নয়, ফরেস্ট অফিসের পেয়াদা এসে দরজার কড়ায় নাড়া দিলে। হাদিস খান? বেরিয়ে এসে সাড়া দিলাম। চল সাহেব কা পাশ। ফরেস্ট অফিসারের পরোয়ানা। হাজির হলাম তক্ষুনি। সাহেব বললেন, হাদিস খান, তুম? রূপহি? হাদিস খান, তুমি? রূপহি কই? বললাম, হুজুর, পনের দিনের ছুটি হয়েছে আমার। রূপহি ভালোই আছে। সাহেব ভড়কে গেছেন বলে মনে হল। বললেন, ছুটি? কই জানিনে তো। হুকুম করলেন ক্লার্ককে, ফাইল লাও। কি নসিবের জোর, সেইদিনের ডাকেই আমার ছুটির মঞ্জুরি এসে গেছে। সাহেব বললেন, হাদিস খান, ছুটি চৌদ্দ দিনের, পনের দিনের নয়, খেয়াল রেখো, একদিনও লেট যেন না হয়। জী হুজুর। কি বলব, চৌদ্দটা দিন কোন্ জিনের বদ্‌কেরামতিতে চৌদ্দ মিনিট হয়ে দাঁড়াল। চোখের পানি চোখের পাতায় মুছে ট্রেনে চাপলাম। মা বাপ বাচ্চা স্টেশনে এসেছিল। বাচ্চার মা ঘর ছেড়ে নড়েনি। বলতে শরম শরম লাগে, আগের রাত্তিরে দুজনের আঁস্থতে মাথার বালিসে ডিব্রু (নদী) নেমে এসেছিল।

কলকতায় এসে সাহেবের আপিসে গেলাম। মজুমদার সাহেব যেমন তাঁর বিবিও তেমন, খুবই ভালো। সাহেব বললেন, এখন খুব শীত, হাতী যাবে না। বুঝুন, অক্টোবরে এসেছি, তিনদিন কলকাতায় থাকবার কথা, কিসমতের ফেরে ছয় মাস থাকতে হল।

আসাম সরকারের ট্রেড অ্যাডভাইসার মিঃ মজুমদার বললেল, অত শীত সহ্য করতে পারবে না বলে রূপহিকে নিতে ওরাই রাজী হল না। বিস্তর টাকা হাতীর পেছনে গেল। কথায় বলে, হাতী পোষা। ডেলি দশ থেকে পনের টাকা অনায়াসে গলে যায় মশাই, শুধু হাতীর পেটেই। মাহুতের খরচ তো আছেই এ ছাড়া। শেষ পর্যন্ত এই

এপ্রিলে, (ওরা ২১শে এপ্রিল রওনা হয়েছিল) এক জাহাজ, আওয়া-মারু ঠিক হল। কিন্তু ক'মাসেই এত খরচ হয়ে গিয়েছে যে, কিয়োটো জু মাহুত পাঠাবার খরচা দিতে অরাজী হল। কিন্তু মাহুত ছাড়া হাতী সামলাবে কে? তাই হাদিস খানকে শেষ পর্যন্ত যেতেই হল। যেতে কি চায়, কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেলল। আমি আর আমার স্ত্রী ঘাটে গিয়ে ওকে সী-অফ্ করলাম।

হাদিস খান লাজুক হেসে বললে, কেঁদেছিলাম মিথ্যা নয়। কিন্তু আমি তো একটু পরেই থামলাম। কিন্তু রূপাই? তাকে থামাবে কে? জাহাজে ওঠাতেই কি করে বুঝলে এই ওর দেশ ছেড়ে জন্মের মতো শেষ যাওয়া। আর সঙ্গে সঙ্গে ডাঙার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে শুঁড় তুলে কী কান্না! থামায় কার সাধ্য। খালি কাঁদে, খালি কাঁদে। মাথা ঝাঁকায়, কান ঝাপড়ায়, আর কাঁদে। যেখানে ও জন্ম নিয়েছে, ওর বাপ দাদা যেখানে মাটি নিয়েছে, তার মায়া কি কম! আমি ওর পিঠে হাত বুলাই, কান ধরে টানি আর বলি, রূপাই, কাঁদিস না কাঁদিস না, রূপাই, মুই তোর লগে লগে যামু রে! তবে গিয়ে রূপাই বুঝ মানে।

নদীর থেকে কালাপানিতে পড়লাম আর জাহাজে কী ওল্টাউল্টি! এই জাহাজ কাৎ হয়, এই জাহাজ কাৎ হয়। বসতে কাৎ তো দাঁড়ালে চিৎ। ক'দিন ধরে যা খেয়েছিলাম দু'বারেই বেরিয়ে গেল। জান আর ধড়ে নাই। খোদাকে মনে মনে বলি, খোদা, খৈর-খুবীসে দেশে পৌঁছে দাও, দরগায় গিয়ে তাহলে একটা ঘড়ি দেব।

তখনো পা টলে, বেতালে পড়ে, মাথা মাটিতে ঠেকতে চায়, কেবিনে চক্ষু বুজে পড়ে থাকতে থাকতে খেয়াল হল, তাইতো—রূপহি? উঠতে পারিনে, ঘষে ঘষে চললাম। গিয়ে দেখি রূপহি আর তাতে নাই। ভয়ে ডরে খালি চীৎকার করছে। আর শিকল ধরে টানছে। বললাম, রূপাই, রূপাই, ডর নাই, হাবা হাবা, ডর নাই, মুই লগে লগে

থাকিবিড়ে। রূপহির গায়ে হাত দিলাম, আমার গায়ের গন্ধ ও শুঁড় দিয়ে শুঁকে নিলে। তারপর ঠাণ্ডা হল।

ঊনিশ দিন জাহাজে ছিলাম। জাপানীদের কথা এক বর্ণ বুঝিনি। তবে খাতির পেয়েছি খুব। এত খাতির এই জিন্দগীতে পাব, এ আশা করিনি। দেশে থাকি, লক্ষ হাজার লোকের মধ্যে কে এক হাদিস খান, কোন্ এক হাতীর মাহুত, গরিব, আনপঢ়, জংলী, গাঁইয়া, কে তাকে চেনে, কে তাকে পাত্তা দেয়। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবেন না, ঊনিশ বিশ দিন জাপানে ছিলাম, তামাম মুলুক ঘুরেছি স্পেশ্যাল হাওয়া-গাড়িতে। আগে পুলিশের গাড়ি, পরে ব্যাণ্ডের গাড়ি, তারপরে আমি আর রূপহি। যখন যে টাউনে গিয়েছি, শহরসুদ্ধ ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে। জেনানা মরদ বাচ্চা বুড়া সবাই। বাবুসাহেব, এমনটি ঘটবে আমারই নসিবে, একী তাজ্জব! এক একবার মনে হয়েছে, এসব খোয়াবের ঘোর। নিদ্ চটলে সব ফর্সা। কিন্তু নিদ নয়, খোয়াব নয়, সব সত্যি। বাবুজী, চক্ষু বুজলে এখনো দেখতে পাই, আমার চারো তরফে কাতারে কাতারে লোক। লক্ষ লক্ষ হাত আশমানে তুলে হাওয়া কাটে, আর বলে, কিছু তো বুঝি না ওদের কথা, তবু দিল্ ভরে ওঠে, দু'তিনটা কথা খুব বুঝি, হাদিস্ খান, হাদিস্ খান, ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া, পণ্ডিত নেহরু। আমি হাত নাড়ি তো ওরাও হাত নাড়ায়। আমি হাসি তো ওরাও হাসে। দিনরাত এখনো বাবুজী এই দু'কানে হাজার আওয়াজ শুনি—হাদিস খান, ইণ্ডিয়া, নেহরু!

তাহলে জাহাজের আর একটা ঘটনা বলি। তখনো জাপান চার রোজের রাস্তা। রূপহির খাবার নিয়ে গোলমাল হল। খাবারের অনটন হয়নি, যা খাবার তখনো ছিল তাতে হেসে খেলেই রূপহির চারদিন চলে যেত। গরম দেশের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, রোদ্দুরের ভাপ লেগে ফলফুলুরি কাল্‌চে হয়ে গেল, গাছগাছালি শুকিয়ে উঠল একটু, তা তেমন

খাবার হরদম খাওয়াচ্ছি আমরা; কিন্তু সেদিন হল কি, কাপ্তান যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হাতীর কামরায় ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন। হড়বড় হড়বড় কী যে বলে গেল আল্লাই জানেন, আমি তো বাবুসাহেব হকচকিয়ে গেলাম। আরো দুতিনজন এসে জুটল। তখন সবাই মিলে গাদা করা আখের দিকে চায়, শুকনো আক আঙুল দিয়ে দেখায় আর 'ডিক্কো' 'ডিক্কো' না 'ফিক্কো' 'যিক্কো' কি করে? তারপর কলাগাছের দিকে চায়, আবার 'ডিক্কো' 'ডিক্কো' করে। হাতীর খাদ্য তো কম নয়, ডাল, কলাই, কলা, গুড়, তেল যা দেখে তাতেই 'ডিক্কো' 'ডিক্কো' করে ওঠে। আমি একবার এর মুখের দিকে চাই, আবার ওর দিকে তাকাই, শেষ পর্যন্ত গহীন সমুদ্দুরের দিকে চেয়ে সবুজ পানি দেখি। শেষপরে একজন এগিয়ে এসে বললে, দিস্ নো গুড্, ব্যানানাস্ নো গুড্। আন্দাজে বুঝলাম, ওসব খাইও না, ভালো নয়। তবে কী খাওয়াব? এতদিন হাতী তাহলে কী খেয়ে থাকবে? সাঁটে-সোঁটে বুঝিয়ে বলতেই ছুটে গিয়ে গাদা গাদা পাঁউরুটি নিয়ে এল। তাই গব্‌সে গব্‌সে খাওয়ালাম রূপহিকে। এদিকে কাপ্তান করলে কি, কোথাও আর থামলে না। হাওয়ার তারে (রেডিও) জানিয়ে দিলে সে কথা। যাদের যাদের মাল ছিল জাহাজে, তাদের বলে দিলে ফিরতি পথে নামিয়ে দেবে। এক বন্দরে হাওয়াতার করে তেল কয়লা বার-দরিয়ায় আনিয়ে নিলে, এই চারদিনের পথে তেল কয়লা নিতে মাত্র চারঘণ্টা কি তিনঘণ্টা থেমেছিল।

চারদিন শুধু একটানা দৌড় করে ইয়াটু বন্দরে এসে জাহাজ ভিড়ল। জেটিতে পণ্টুনে, ইয়া আল্লা, খালি আদমী! আওরৎ মরদ, বুড্ঢা বাচ্চা, শহরে আর বাদ নাই কিছু। সবাই মিলে ছুটে এসেছে। কিন্তু খালি হাতে কেউ নেই। জনে জনের হাতে রকম রকম ফল। হাতীর জন্যে। ডেকের ওপরে এলাম। ফটো নিল আমার। তারপর চললাম কিয়োটোর জু-বাগানে। বাবু-সাহেব, এমন দিন আমার জমানায় আর আসেনি।

হাদিস খান এইবার থামলে। একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। ওর কাছে বসে বসে শুনছিলাম ওর কথা। খেয়াল ছিল না কত সময় পার হয়ে গেছে। হাদিস খান দুটো বাণ্ডিল বার করলে, দু বাণ্ডিল বোঝাই ছবি। হাদিস খান হেসে বললে, বাবুজী, চোখে দেখিনি, নানীর কাছে কিস্‌সা শুনেছি, বাদশারা যখন সফর করতেন, পথের ধারে ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে থাকত। তা রূপহি আমাকে সেই বাদশা বানিয়ে দিলে। যেদিন কিয়োটো পৌঁছালাম, সেইদিনই জু-বাগানের সুপ্রিণ্টেণ্ট দাওয়াত করলেন। জু-বাগানের সবাই মিলে আমাকে নিয়ে ছবি তুললে। সক্কলের মুখে হাসি আর ধরে না। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম। রূপহিকে গোসল করিয়ে সর্ব শরীরে তেল মেখে চকচকে করে তুললাম। তারপর কপালে দিলাম ফোঁটা কেটে। প্রথম সূর্যের আলো রূপহির ওপর পড়ল। ওর রূপ উথলে উঠল। রূপহি যখন মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালে, মনে হল যেন কনে-বউটি। দলে দলে লোক এসে জু-বাগান ভরে দিল। আরো একটাও তো হাতী ছিল সেখানে, কিন্তু লোকের নজর সেখানে আর পৌঁছাল না সেদিন। সবার চোখেই রূপহি। গুড্, এলিফাণ্ট গুড্, ইণ্ডিয়া গুড্, পণ্ডিত নেহরু গুড্, হাদিস খান গুড্। তারপর আমি রূপহির খেলা দেখালাম। আমাকে কত রকম করে পিঠে নিলে, হাঁটু গেড়ে বসলে, সালাম করলে শুঁড় বেঁকিয়ে। এক একটা খেলা দেখাই আর ওরা ফূর্তিতে ফেটে পড়ে। আওয়াজ তোলে—হাদিস খান, হাদিস খান! এই দেখুন ফটো, সব ওরা দিয়েছে। যখন যেখানে গিয়েছি সেখান থেকেই ছবি দিয়েছে। এই যে আমরা পাঁচজন, বলে আমাকে একখানা ছবি দেখালে। আশ্চর্য হয়ে বললাম, পাঁচজন কোথায়, এ তো দেখছি চারজন? না বাবুসাহেব, পাঁচজন। জিজ্ঞেস করলুম, পাঁচজন কই? এই যে, আমি, এই যে জু-বাগানের বড় সাহেব, এই যে তামাম শহরখানায় মালিক, এই যে আর একজন সাহেব, আর এই যে

নেহরুজী, বলে নেহরুর ফটোখানা দেখালে। তাহলে পাঁচজন হল কি না? স্বীকার করতেই হল। হেসে ফেলে হাদিস খান বললে, নেহরুজীর তসবির তো এ ঘরে ছিল না, ছবি তোলবার আগে হুজুরের হুকুমে একজন ছবিখানা এনে টাঙিয়ে দিলে। হুজুর তারপর হেসে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বললেন, হাদিস খান, আচ্ছা? আমার ছাতি ফুলে উঠল। মাথা নেড়ে জবাব দিলাম, বহুৎ আচ্ছা। হুজুর বললেন, গুড্, সিট্ সিট্। বোসো বোসো। পাশের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি বসলাম না। শোভান্ আল্লা, সেখানে কি বসতে পারি। তো বসি না দেখে হাত চেপে ধরলেন। হাতটা মুঠো করে ধরে ফটো ঐ তুললেন। বারোদিন কিয়োটোতে ছিলাম। যেদিন গেলাম সেইদিনই খানিক পরে সুপ্রিণ্টেণ্ট এসে আমার পোশাক দেখে বললেন, হাদিস খান, কোল্ড্ টু মচ্ হিয়ার (এখানে খুব শীত), দিস্ নো গুড্ (এ পোশাক চলবে না)। সেই তক্ষনি দোকানে নিয়ে গেলেন। কোট হল, প্যাণ্ট হল, গরম জামা হল। জুতো দেখে বললেন, দিস্ গুড্।

তারপর বেরুলাম ঘুরতে। শহরে যাই, শহর ভেঙে পড়ে; গ্রামে যাই, গ্রাম ভেঙে পড়ে। আমাদের দেশের বেবাক লোক বুড়া, মড়ার মতো হাঁটে, মড়ার মতো কথা কয়; কিন্তু জাপানে কম-জোর কেউ নাই। যেমন সুরৎ, তেমনি তাজা। আওরৎ মরদ বাচ্চা বুড্ঢা সবাই।

টোকিওতে গিয়েছি। এক দেশী আদমীর সঙ্গে মোলাকাৎ। বহুৎ দিন ওদেশে আছে। জাপানী বলতে পারে, পড়তেও পারে; নাম আকবর, বাড়ি ভাগলপুর। যেন ভাইকে পেলাম। কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কত সুখদুঃখের কথা বললাম। নাগাসাকি পর্যন্ত সঙ্গে গেল, ছুটি নিয়ে। সে-ই বললে এখন এখানে ইণ্ডিয়ানদের ইজ্জৎ বেড়ে যাবে খুব।

আসবার সময় হয়ে গেল। যে জাহাজে গিয়েছিলাম সেই

জাহাজেই ফেরা। কিয়োটো জু-এর মাহুতের সঙ্গে দোস্তালি হল। রূপহির সঙ্গে তার ভাব জমিয়ে দিলাম। বললাম, রূপই, এর কাছে থাকিস্, ভালো লোক, যত্নে থাকবি। এর কথা শুনবি।

আসবার দিন বাবুসাহেব, পাও আর ওঠে না, ভুলেই গিয়েছিলাম পরদেশে এসেছি। এত ভাই বেরাদর ছড়ানো। এদের ফেলে যাবো কি করে? রূপহিকে ফেলে যাব কি করে? ওকে এই বাচ্চা বয়েস থেকে মানুষ করেছি। এক পেলেট থেকে খাবার খাইয়েছি, ঝুটা খাওয়ালে হাতী খুব বশ মানে কিনা। সেই রূপহিকে ফেলে কি করে যাই। আসবার সময় কত করে বলে এলাম, রূপাই, ইয়া থাকিবিডে, মুই যাউ। কিন্তু বলতে কি পারি। চোখের জলে বুক ভেসে যায় যে। তাড়াতাড়ি চলে আসছি, খানিক দূরে আসতে না আসতেই কোট ধরে কে টানলে। ফিরে দেখি রূপহি। যত বলি, রূপাই, যা ফিরে যা, কিন্তু কথা কি শোনে বাবু। কোট ছাড়বে না, যাবেও না। শেষে মাহুত এসে নিয়ে গেল।

জাহাজে উঠে একবার ভালো করে দেখে নিলাম চারদিক। এক্ষনি ধীরে ধীরে সব মিলিয়ে যাবে। মনে শুধু থাকবে একটা তাজা দাগ। এক দেশের অখ্যাত এক লোক অন্য দেশে এসেছিল। সমস্ত দেশ তাকে ভালোবেসেছে, যত্ন করেছে; তার চেয়েও বড় কথা, তার ইনসানিয়ত, মনুষ্যত্বকে স্বীকার করেছে। আমার চোখ জলে ভরে এল। বাবুসাহেব, বলতে এবার শরম নাই, কেবিনে ফিরে দরজা দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদলাম।

বই-পাড়া

ঃ ১ ঃ

গড্ বললেন, লেট্ দেয়ার বি লাইট—আলো হোক, তো আলো হল ; বায়ু হোক, তো বায়ু হল ; আকাশ হোক, তো আকাশ হল। গড্ বা খোদা বা ঈশ্বর হলেন মশহুর ম্যাজিশিয়ান। ডাণ্ডাখানা ঘুরিয়ে, ছু মন্তর ছুঁক, যেই দিলেন ফুঁক, অমনি তামাম দুনিয়া পয়দা হয়ে গেল। বাইবেলে এমত কিস্‌সা আছে।

কিন্তু মানুষের কেদ্দানির সুতো অত ফাইন কাটা নয়। তার হচ্ছে মোটা হাতের মেহন্নত। তাই ছুক করে বাইবেলখানা হাতের মুঠোয় আনতে সে পারে না। লিখতে দিন যায় তো ছাপতে বছর, ভুল কাটতে হপ্তা যায় তো বাঁধাই করতে মাস। বাইবেল কেন, সব বই-এরই এই হল জন্ম-ইতিহাস।

বই পড়ায় যত মজা, ততটাই, কি তার চাইতেও বেশি মজা বোধ হয় বই-পাড়ায় ঘোরন-ঘারনে। কলকাতায় বইএর ব্যবসা নিতান্ত হেলা-ফেলার নয়। আর ব্যাপারীদের তুচ্ছ বলে মাড়িয়ে যাবে, সে-দিনকে শিকেয় তোলো। খোদ সরকারের ফোঁশ্-ফোঁশানিও বশে এনে ফেলেছেন, তাঁরা, বেশি দিনের কথা নয়, মাত্তর কদিন আগে। ও সব কথা যাক। খাশ কথা বলি।

যদি শুধোই—বই, তুমি কার? বই নির্ঘাৎ জবাব দেবে—কিনলে খদ্দেরের, নইলে দোকানদারের। লিখলে লেখকের, ছাপলে প্রকাশকের; মাঝখানে ছাপাখানার, তারপর দফ্তরীর। নতুন থাকতে বড়লোকের শো-কেসের, পুরোনো হলে ফুটপাতের, আর শেষের শেষ সর্বশেষ উইএর।

বই-পাড়ার হুকুমদার পাবলিশার। বই-পাড়ার বিরাট ফরাসে ডবল বালিস তারই, বাদবাকি আর সবাই তাঁরই হেলায় এগিয়ে দেওয়া পাশ-বালিশ সার। নামী লেখক যদি হলেন তো তাকিয়াটা পেলেন। সে আসরে নামীরাই শুধু গণ্য, বাদবাকি সব 'অন্যদিনে'র জন্য।

শিকড়ে সাহিত্য তাই কি, আসলে তো ব্যবসা, লাভের কড়ি গুনে-গেঁথে ঘরে আনতে হবে না? তবে? আপনি কে? কি বিত্তান্ত কখানা বই লিখেছেন? কোথায় লিখেছেন? ক' এডিশন কেটেছে, তার খোঁজখবর নিতে হবে না? হুট করে বই ছেপে ব্যবসাটা ওল্টা করি আর কি! কি লিখেছেন? আহা দেখাতে হবে না, দেখাতে হবে না—মুখেই বলুন না, দেখব অত সময় কই। বেশ সংক্ষেপ করে দু' কথায় বলে ফেলুন দিকি।

বসে ছিলুম এক প্রকাশনালয়ে। চোখ পাকিয়ে প্রকাশক মহোদয় এমন হাঁকাড় মারলেন যে, ভদ্দরলোক গুটিয়ে কেন্নো। থতমত খেয়ে বললেন, আজ্ঞে গল্প উপন্যাস তো নয় যে দুকথায় বলব। আলোচনাটা একটু সীরিয়াস বিষয়ে। বরঞ্চ আজ রেখে যাই, দিনকতক বাদে এসে না হয় খোঁজ নিয়ে যাব। প্রকাশক হাঁ হাঁ করে উঠলেন। মালুম হল ওঁর হাতের তেলোর ওপর কেউ আগুনে গনগনে আধসেরী বাটখারা রাখতে গেছে। না না না না, ও কাজটি আর দয়া করে করবেন না। ভ্যালা বিপদ, কাজকম্ম নষ্ট করে এখন ওই তেজপাতার বস্তা ঘাঁটি! ছা-পোষা মানুষ মশাই, সারাদিন যায় কোথায় প্রেস রে, কোথায় দপ্তরী রে, তার ওপর আদায় উশুল আছে, র‍্যাশান বাজার আছে, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, তাদের বায়না বায়নাক্কা আছে; এই সব বখেড়া মিটিয়ে বিত্তের ঘরে ধুনো জ্বালব, তার অবসর কই। ওসব ছোটকেলে শখ কবে মিটে গেছে। এখন ছুটির দিনে দোকানপাট বন্ধ থাকলে এক-আধখানা ডিটেকটিভ্ বই-টই নিয়ে ঘুম না আসা ইস্তক নাড়াচাড়া করি, তারপর

সর্বচিন্তাহরা নিদ্রা এলে আর কোথায় বই, কোথায় কি। হ্যাঁ মশাই, ভালো ডিটেকটিভ বই লিখতে পারেন? বেশ কড়া আর কি? পড়তে পড়তে বুক ডন-বৈঠক করবে, তবে বুঝি, হ্যাঁ, লিখলেন কিছু। কিম্বা নবেল লিখুন, বেশ চলে। এ ছাড়া বাংলা বই আর বিক্রি হয় না।

একটু নরম হয়ে গেলেন হঠাৎ, না জানি কেন। বললেন, তা আপনার ওটা কি, নবেল? ভদ্রলোক আশ্বস্ত হয়ে বললেন, আজ্ঞে না, কতকগুলো দার্শনিক প্রবন্ধ। আমাদের দেশে এ ধরণের প্রবন্ধ খুব বেশি লেখা হয়নি। যথাসম্ভব খেটেখুটেই লিখেছি। এই বারোটা প্রবন্ধ লিখতে আমার তা প্রায় বছর বারোই লেগেছে। বইটার নাম দিয়েছি, আধুনিক দার্শনিক মতবাদের ভূমিকা। প্রাচ্যদর্শন আর আধুনিক জীবনবাদের জনক পাশ্চাত্য-দর্শনের একটা তুলনামূলক—ভদ্রলোক শেষ করতে পারলেন না, বাধা পেলেন। প্রকাশক তোলা হাইটিকে একটি হাইশটে ওধার করে বলে উঠলেন, থাক থাক মশাই, ও সব দর্শন-ফর্শন চলবে না। বাংলা দেশে বিক্রি হবে দর্শনের বই, হ্যাঃ! অ্যাদ্দিন ধরে এ লাইনে আছি, আজ অব্দি একজন খদ্দেরও দেখলাম না, কেনা তো দূরের কথা, ওই কেলাসের বইএর খোঁজ-খবরটাও নিলে। মিনি মাঙনা গাঁটগর্চা দেব, বলি এটা দোকান তো, সদাব্রত তো নয়।

পাবলিশার মিথ্যে বলেন নি। বাংলা দেশে আজও প্রবন্ধের বই, বিজ্ঞানের বই, সমালোচনার বই এক উই ছাড়া আর কাটবার খদ্দের মেলে না। কবিতার বই তো কে-কো-কাঃ। গল্পে গল্পে মজার খবর সব বেরুতে লাগল। শুনলুম, বিয়ের লগনসা এলে কিছু কবিতার বই বিক্রী হয়। আর মাঝে-মিশেলে দু একজন ইউনিভার্সিটি কি কলেজের ছোকরা দু এক কপি কেনে; প্রেমে-টেমে পড়েছে, মেয়েটাকে কিছু দিতে-টিতে হয় অথচ ট্যাঁক খাঁকতি, অগত্যা কি আর করা, দাও একখানা কবিতার বই। এদের তবু বাছবিচার আছে একটু। মেঘদূত কি

কাদম্বরী কি ওমর খৈয়ামের অনুবাদ যেমন খোঁজে, তেমনি চক্কোত্তি কি দাস কি বোস দত্ত-টত্তদেরও টেনে-টুনে নামায়। সাতচল্লিশখানা বই ঘেঁটে শেষ পর্যন্ত একখানা হয়ত নিলে। আর মেয়েটি যদি সঙ্গে থাকে তো কম্মের গাড়ি সেদিন পগারে। মেয়েটির ঠোঁট বেঁকতে যা দেরি, ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে বলে ওঠে, পছন্দ হচ্ছে না তো, চল অন্য দোকানে।

দোকানী বললেন, মফস্বলের খদ্দেরদের মধ্যে মশাই এত নুতুপুতু নেই। অথরদের কী বই বেরিয়েছে পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে জেনে আসেন তাঁরা। লিস্টিটি ফেলে দিয়েই খালাস। আমরাও বেঁধে ছেঁদে দু মিনিটে কম্ম কিলিয়ার করে দিই। কখনো-সখনো গোলমাল বাধে দাম মিটুবার সময়। কি স্যর, কমিশন বাদ দেননি যে! কমিশন? ভারি তো নিয়েছেন পাঁচসিকের বই, আবার তাতেও কমিশন! বাঃ, কমিশন নেই, বলি কাঙাল ঠাউরেছেন না কি? তবে থাকল আপনার বই ওই দামেই যদি বই কিনবো তো যাতায়াত সাড়ে চারটি মুদ্রা নগদ খর্চা করে এলাম কেন? আমাদের শ্রীগোবিন্দ ইস্টল কী দোষ করেছিল?

বুঝুন ব্যাপারটা, দোকানী বললেন, ওই জন্যেই মশাই পারতপক্ষে দিশী বই তাকে তুলতে চাইনে। একে তো পাবলিশাররা যা কমিশন দেন তা একেবারে পিঁপড়ের মাজা টেপা চিনি, তার থেকেই তো সব, ঘরভাড়া, লোকজনের মাইনে, লাইট-খরচ, লাইব্রেরি-কমিশন, লাইব্রেরি না হাতী, জানতে কিচ্ছু বাকি নেই, সাত আনা খর্চা করে রবারের ইস্টাম্পো বানিয়ে

ঝড়াক ঝড়াক ছাপ মেরে কমিশন বের করে নিয়ে যাচ্ছে ; গিয়ে দেখ ঢুঁ ঢুঁ, আলমারি দূরের কথা, কেরোসিন কাঠের তাক অব্দি একখানা খুঁজে বের করতে মাইক্রস্কোপের দ্বারস্থ হতে হয়। তার ওপর আবার, কে কলকাতায় এসেছে গোবিন্দ বুক ইস্টল ছেড়ে, তাকেও দাও কমিশন! বলি বইএর ব্যবসা করে দেখি পুলকের গাছে কদম ফুল আর ধরছে না, রস কস সবই যদি গয়ং গচ্ছ হয়ে যায় তো আমরা চুষব কি মলাটের শুকনো পিচবোড্‌!

আবার এমন খদ্দেরও আছেন, গট গট দোকানে ঢুকলেন, ইদিক সিদিক চেয়ে খপ করে বলে উঠলেন, দেহি খান কয় বই। কি বই কি বিত্তান্ত তার ঠিক-ঠিকানা নেই! কি বই, কার বই চাই, হয়ত জিগ্যেস করলেন। হে দিয়া আপনার কী কাম? বই চাইছি বই দ্যাখান। খদ্দের না লক্ষ্মী। তার আর জাত-বেজাত কি। বুকে বউনির থুক ফেলে নামিয়ে চললে। বইএর বোঝা। বইএ বইএ থুতনির গোড়ায় হাবুডুবু, বাবুর তবুও বই পছন্দ হয় না। দোকানী খদ্দেরের রাশভারী মেজাজ দেখে কপালের ঘাম

তেলোয় মুছে বললে, বই কি কিনবেন? ভদ্রলোক খ্যাঁক করলেন, না তো কি কুটুম্বিতা করতে আইছি? তারপর বই বাছা চলল আরো আধ ঘণ্টা। সাতপুরুষের জমা করা ঘাম একদিনেই ঝরিয়ে দিয়ে খান চারেক বই নিয়ে বিদায় হলেন।

তবে যদি মহিলা কেউ আসেন, আর পদ্য-টদ্য এক-আধটু যদি লিখে থাকেন কোন কাগজে তো দোকানীর পোয়াবারো। আসুন আসুন! ওহে, এদিকে দেখ না, কি চান উনি। কোমল কণ্ঠে আওয়াজ বেরুলো, দেখুন, বেশ ভালো একটা কবিতার বই দিন না, প্রীতি-উপহার দেবো। বান্ধবীর বিয়ে কিনা। মেঘদূত নিয়ে যান, ভালো ছবি দেওয়া, রুপোর জলে ছাপা। না-না, বড্ড সেকেলে হয়ে যাবে, একটু আপ-টু-ডেট চাই, তা বলে আধুনিক বখাটে কবিদের বই চাইনে, রস্থি-দীঘখি জ্ঞান নেই ওদের। দোকানের ছোকরাটি বললে, তাই তো বলছি, মেঘদূত নিন, কী লেখা বলুন দিকি,মা-ঠাকুমার সঙ্গে বসে পড়ুন, আহা! মহিলাটির মুখে না-পছন্দের ছায়া। দোকানী টেবা চোখে নিরীখটি সই রেখেছিলেন এতক্ষণ। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ধমক দিলেন, তুমি ওঁকে কী লেখা দেখাচ্ছ, ওঁরা হলেন ঝাড়ে-বংশে লিখিয়ে। 'সাপ্তাহিক পুষ্পরেণু' পত্রিকায় ওঁর পদ্য পড়নি? ও, তুমি ওঁকে চেনো না? আরে, উনি হচ্ছেন সেই 'বুকের বেদন'এর লেখিকা। আরে তাই নাকি, কি কাণ্ড, আর আমি এতক্ষণ মাহুতের কাছে হাতীর গল্প শোনাচ্ছি! দোকানী বললেন, তাই তো বলছি হে, কবিকুসুমের 'মোতির হার' একখানা দিয়ে দাও। লোক দেখে টেস্ট ধরতে পারো না? দু মিনিটও কাটল না, 'মোতির হার' ব্যাগসই হল মহিলাটির। কথার ধার, বুঝলে ছোকরা, ভারে যখন না কাটে, বললেন দোকানী, তখন একটু খড়কে-কাটির দরকার হয়। বলি হুঁশকে একটু চাগিয়ে রেখো।

এক দোকানে বসে থাকলে আর জানা গেল কতটুকু? যেমন বরফের চাঙ্গড়, তামাম শরীর জলে ডুবিয়ে নয়ভাগের একভাগটি ভাসিয়ে রাখে, তেমনি বইপাড়ার দোকানগুলো। তাকে তাকে সাজানো বইগুলো নয়ভাগের সেই একটিভাগ মাত্র। বাকি আটভাগের ক্রিয়াকাণ্ড শুনলে আক্কেলে খিল লেগে যাবে।

এক ভদ্দরলোককে দেখলুম। মোটাসোটা, কাপড়-কামিজ ধূলো-ময়লার মেসবাড়ি। এদিক-ওদিক চেয়ে একটা ছোট্ট প্রকাশন-ভবনে ঢুকলেন। হাতের রেশন ব্যাগটি কাউন্টারের ওপর রেখে শ্রান্তির শ্বাস ফেলে ঘাম মুছলেন। প্রকাশক তাঁর দিকে একটা চাউনি ছুঁড়ে বললেন, এই যে চক্কোত্তি। তারপর আবার তাঁর কাজে মনোনিবেশ করলেন। আধ ঘণ্টা কাটল। প্রকাশক আবার নজরসই করে বললেন, এই যে চক্কোত্তি, কি খবর? চক্কোত্তি মুখটা খুলেই বন্ধ করলেন, কারণ প্রকাশকের চোখ তখন ডুব মেরেছে হিসেবে। আরো মিনিট কুড়ি কাটল। খাতার কাজ শেষ। প্রকাশক বললেন, এই যে, কি হে, খবর-টবর কি? চক্কোত্তি নড়ে-চড়ে বসলেন, তারপর ধীরে-সুস্থে বললেন, আজ্ঞে কাজটাজ কিছু দিন! কাজ আর কোথায় হে। ইস্কুলের সিজিন হলেও কথা ছিল। আর ইস্কুলেরই বা সে-দিন কই। একে তো বই সিলেক্ট করাতে, ইস্কুলে বই লাগাতে হাড়ের রক্ত জমে শক্ত হচ্ছিল, এখন আবার জুটেছেন সরকার। বোর্ড বানিয়ে নিজেরাই বই ছাপছেন। রক্ষক ভক্ষক হলে পয়মাল হতে আর দেরি কত। ঝাঁপ গুটিয়ে হরিনাম করা ছাড়া আর পথ দেখছিনে। চক্কোত্তি বললেন, তা বললে কি হয়, আপনারা না তাকালে আমরা যাই কোথা? আরে আমরা নিজেরাই কোথায় যাই দ্যাখ আগে। সেই ভাবনায় মাথার চামে খুস্কি জমে গেল। কাজ-কর্ম আর নেই। দৈব-ভবিষ্যতেও যে হবে, সে আশার বাতিতেই বা তেল কই? তবু চক্কোত্তি ছাড়ে না। ছাড়লে তাঁর চলে না। এরই ওপর তার সংসারের হাঁড়ি হেঁসেল থেকে উঁকি মারছে। চক্কোত্তি প্রফেশনাল লিখিয়ে। শুণ্ড থাকলে গণেশ বলে অনায়াসে চালানো যেত। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশটে বই তাঁর বাজারে। সবগুলো যে খারাপ, তাও নয়। চক্কোত্তি আমাকে বললে, দেখবেন লক্ষ্য করে, কেলাস ফোরের যা বাংলা বই লিখেছি একখানা, একেবারে সরেস।

মফস্বলের ইস্কুলগুলোয় একেবারে মার মার। একখানা বই ঝোলার মধ্য থেকে বের করে দেখালে, অন্য লোকের নাম লেখা। দেখে বললুম, একী, এ তো অন্য লোকের বই! চক্কোত্তি শিশুর মতো হেসে বললে, ওই তো খেলার মজা। অথরশিপ্ বিক্রি করে দেওয়া কিনা। মাত্তর নব্বুই টাকায়। অথচ দেখুন কী লাগা লেগেছে। ঝাঁকায় ঝাঁকায় বই আসছে। বলে চক্কোত্তি হাসল। চাইল ঝাঁকা-মুটেটার দিকে। দেখলুম ওই বয়স্ক মুখটায় একটা চাপা অভিমানের ছাপ। যেন ওর খেলনা আর কেউ কেড়ে নিয়েছে, ফিরে পাবার আর সম্ভাবনা নেই দেখে হাল ছেড়ে বলছে, নিয়ে যা, বয়েই গেল আমার। কিন্তু সে ক্ষণেক। পরমুহূর্তেই হেসে বললে, কোন্ লোকের ছেলে আর কোন্ লোককে বাপ বলছে, দেখুন কি মজা। হি-হি-হি। কি বই লিখিনি মশাই। ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, দ্রুতপঠন, জীবনী, যে যা চাইবে, চক্কোত্তির আর না নেই। না করলে চলে কখনো। সংসার কি ছেড়ে কথা কইবে। ছোটবেলায় লেখাটেখার হাত ছিল একটু-আধটু। কিন্তু চক্কোত্তির লেখা ফরমাসী বই ছাপাবার লোক মেলে তো আসল লেখা ছাপার লোক মেলে না। কিন্তু চক্কোত্তির সঙ্গে পারবে কে? শুনুন না 'প্রভাত' কবিতাটা। কেলাস ফোরের বাংলার মধ্যেই চালিয়ে দিয়েছি। শুনতে হল। লোকটিকে ভালোই লাগছিল। হঠাৎ কবিতাটা দেখে চমকে উঠলুম। একী, এ যে ঈশ্বর গুপ্তের লেখা। চক্কোত্তি হো-হো করে হেসে বললে, বয়ে গেছে ঈশ্বর গুপ্তের ও কবিতা লিখতে, ওটাও এই শর্মার। টাকার জন্যে যদি বেনামী হতে পারি তো লেখার খাতিরে না-হয় আরেকবার হলাম। বললুম, কিন্তু কেউ যদি ধরে ফেলে? ফেললো তো এই ঠনঠন, বুড়ো আঙুল নাচিয়ে চক্কোত্তি বললে, আর আপনিও যেমন! কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে মশাই। তাছাড়া ছদ্মনাম তো বড় বড় সাহিত্যিকেরাও নেন, আমি আর এমন

অন্যায়টা কি করলাম। আর সত্যিই কিছু ঈশ্বর গুপ্তের থেকে খারাপও লিখিনে।

প্রকাশকটি মাঝখানে উঠে গিয়েছিলেন। সেই ফাঁকেই এত গল্প। তিনি ফিরে এলেন। চক্কোত্তি চোখ টিপে বললেন, আবার বলে দেবেন না যেন মশাই। প্রকাশককে মিনতি করলেন, পাঁচটা টাকা চাই যে। টাকা! টাকা কোথায় হে ? আজ্ঞে, না হলেই নয়। কিছু অ্যাডভান্স করুন। অ্যাডভান্স করব ? কিসে ? যাতে হয়। যা বলবেন তাই লিখে দেব। প্রকাশক একটু চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, এক কাজ করতে পারো, অনেকদিন থেকে ভাবছি, রামকিষ্টোর বই এখন খুব কাটছে, একটা ছোটদের রামকিষ্টো গোছ বাজারে ছাড়ি— পারবে দিন দশ-বারোর মধ্যে লিখে দিতে ? এই ফর্মা ছয়েক বড়জোর। এসব বই হয়ত র‍্যাপিড রীডিংএ ঝড়াক করে লেগে যেতে পারে। ধম্ম-টম্ম আছে কিনা। কি, পারবে ? চক্কোত্তি একগাল হেসে বললে, কি যে বলেন,পাঁচ বিয়েনের পরেও কি কোনো গোরু বাচ্চা দিতে ভড়কায়। ধরতে গেলে ও-রকম একখানা তো লেখাই আছে। পড়ে দেখুন, যদি পছন্দ হয় তো একটু এদিক ওদিক করলেই খাসা দাঁড়িয়ে যাবে। রেশন ব্যাগ থেকে প্রুফ কাগজের উল্টো পিঠে লেখা একতাড়া পাণ্ডুলিপি বের হল। প্রকাশক এক নজর দেখেই বললেন, দূর, এ তোমার চলবে না। বলছি রাম কিষ্টোর কথা,না বের করলে প্রফুল্ল চাকী। গাল চুলকে চক্কোত্তি বললে, আজ্ঞে কষ্ট করে লিখেছিলাম। ওইটে একটু বদলে-টদলে—কথা শেষ না হতেই রাম-দাবড়ি খেলেন চক্কোত্তি। বুড়ো বয়সে তোমার ভীমরতি ধরেছে। প্রফুল্ল চাকীকে বরঞ্চ মেরে-কেটে নেতাজী করতে পারো,কিন্তু রামকিষ্টো যে আলাদা লাইনের হে। ও-রকম একখানা প্রথমে তোমাকে নতুন করে লিখতেই হবে। দিন পনেরোর মধ্যে এনে দিও। যে আজ্ঞে,বলে চক্কোত্তি টাকা নিয়ে চলে গেল।

এইখানেই দেখা হয়েছিল এক প্রুফ-রীডারের সঙ্গে। টেবিলে প্রুফের তাড়া, সকালসন্ধ্যে প্রুফ দেখে দেখে চোখের দফা গয়া হয়েছে। কাজ করতে করতে কুঁজো হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে শুধুই অভিযোগ। বাংলা লেখা অত সহজ নয় মশাই। রবীন্দ্রনাথ অবধি ভুল বাংলা লিখেছেন, অন্যের কথা তো ছেড়েই দিলুম। সাহিত্য করেন, সাহিত্য কি সাহিত্যিকেরা করেন মশাই, মনের আবেগে এলতাবড়ি লিখে দিয়েই তাঁরা খালাস। বাংলা বানান দুরস্ত করা খই-মুড়কি খাওয়া নয়, বুঝলেন। এই শর্মারা না থাকলে বাংলা সাহিত্যের বাজারে আজ ঘুঘু চরত। বললুম, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে বইএ ভুল থাকে মশাই। আর যাবে কোথায়, রা-রা করে উঠলেন, নচ্ছার প্রেসওয়ালাদেরকে গিয়ে বলতে পারেন না কথাটা? ফাঁকিবাজের যাশু সব। সাতবার কাটলেও করেকশান করে না। কেটে কেটে হদ্দ হয়ে শেষে প্রিণ্ট অর্ডার দিতে বাধ্য হই। একবার হয়েছে কি জানেন, উপন্যাস ছাপা হচ্ছে একখানা, নায়কের নাম ভূপেন। আদ্দেক বইএ ডুপেন ডুপেন ছেপে যাচ্ছে। কেটে কেটে হদ্দ হয়ে চিঠি দিলুম। এত ভুল একটা প্রেসের পক্ষে কেলেঙ্কারি নয় কি? তা ম্যানেজার জবাব দিলেন, আমাব প্রেসে ভুল ছাপা হয় না। অথর মশাই ছাপাখানার কি বোঝেন, গুচ্ছের 'ভূ' তো চালিয়েছেন, কলমের ডগে তো আর কিছু আটকায় না। কিন্তু অত 'ভূ' আমরা পাই কোথায়? এটা ছাপাখানা, টাইপের কারখানা তো নয়। হয় হিরোর নাম পালটে দিন, নয় ভূপেনকে সাবড়ে দিয়ে হরেনকে এনে

উপন্যাস শেষ করুন। 'হ' আমাদের অঢেল আছে। লেখককে বললুম।

কিন্তু ওঁদের তো গোঁ, শূয়োর—বলে আমি নাবালক, রাজি হলেন না কিছুতে। কাজেই আমাকেই হরেন করে দিতে হল। ড্রপ লেটারে তো আর কাজ সারতে পারিনে। দায়িত্ব তো আমারই। সে বইএর দু এডিশন চলছে। সাহিত্যিক না হলে কি হবে, আমরা সাহিত্যিক-মেকার তো বটি।

ঃ ২ ঃ

জন্মের মধ্যে কম্ম শোধ, একবার টিউশনি করতে গিয়েছিলুম। বিদ্যের ক্ষেতের ঝরে পড়া দু একটা দানা আমার হিস্তায়, মেঠো মুষিকও যা 'রাম কহো' বলে ফেলে পঁয়ষট্টি মারে। তাই ভাবলুম বিদ্যের ট্যাকে আধলা সম্বল করে পাকা বাড়িতে উঠতে গেলেই তো ধাতানি ছাড়া কিছু জুটবে না, কাজ কি বাবা মাদার গাছে গা চুলকে, কাপড় যখন কুল্লে দেড় গজ, কোটের আশা ছেড়ে দিয়ে ফতুয়া ভরসা করি। খুঁজে পেতে কাজ নিলুম বর্ণপরিচয় শেখাবার। চার বছরের এক মেয়ে। ভয় ভাঙাতেই লাগল চৌদ্দ আনার লবেঞ্চুশ আর পাকী চৌদ্দটা দিন। মেয়েটিরও ভয় ভাঙল, আর আমি বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের মলাটটি উল্টে বললুম, বল 'স্বরে অ'। ছাত্রী মুখটি গোঁজ করে আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে শুরু করলে। আবার বললুম, বল খুকি, ভয় কি, বল 'অ', 'স্বরে অ'। চেন এটা ? খুকি মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ। ও, এটা চেন ? বেশ বেশ, তাহলে এর পরেরটা ? এই এটা ? 'স্বরে আ' ? খুকি মাথা নাড়লে। বাঃ বাঃ। তাহলে 'হ্রস্বই', 'দীর্ঘই' ? তাও চেন ? বাঃ, তাহলে তো সব শিখেই ফেলেছ দেখছি, ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ—অ্যাঁ ? ভালো ভালো, তা পড় তো দেখি প্রথম থেকে একটু। অমনি খুকির মুখ আবার গোঁজ হল। মাথাটা নিচু করে মাটিতে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে শুরু করলে। বললুম, কি হল ? চুপ করে গেলে যে, বল ? মেয়েটি নরম নরম মুখখানা তুলে বললে, বলব ? আপনি চলে যাবেন না

তো? চলে যাব! কেন? না, আপনার আগে দুজন মাস্টার মশাই চলে গেছেন কিনা, তাই। আরো দুজন চলে গেছেন? বলো কি! খুকি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওঁরা খালি পুরোনো পড়া পড়াতেন। যেগুলো জানি তা পড়ে আর সুখ কি, তাই একদিন নতুন পড়া জিজ্ঞেস করলাম, আর ওঁরা চলে গেলেন। বললুম তাঁরা অন্যায় করেছেন। নতুন পড়া শিখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কোন্ অব্দি শিখেছ, ক খ? খুকি বললে শেষের দিকে সব শিখেছি, বই শেষ হয়ে গেছে। আমি গোড়ার দিকে জানতে চাই। আচ্ছা মাস্টার মশাই, 'অ' এর আগে কি? আঁক্ করে চুপ মেরে গেলুম এই নাকি নতুন পড়া! বলা বাহুল্য কালবিলম্ব না করে ক্লীন কেটে পড়লুম।

কথাটা এদ্দিন বাদে মনে পড়ল—বই-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে। 'আগে কি'-এর চক্করে পড়ে নাকে মুখে ঘোলা জল ঢুকল খানিক। বই-পাড়া বললে এখন কেমন কলেজ স্কোয়ারের চৌহদ্দির ছবিখানাই চোখের ওপর ভাসে। কিন্তু বই-ব্যবসায় আঁতুরঘর হচ্ছে বটতলা। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমদের আমলে বটতলা একেবারে পুরো ইস্টিমে বিদ্যের গাড়ি ছুটিয়েছে। এই তল্লাটটাই ছিল সে আমলে কালচারের খেয়াতরী ভেড়াবার সদরঘাট। চোখ থাকতে কানা যে সব আদমী তাদের জ্ঞানডিম্ব পাদ্রীদের তা-এ ফুটতে লাগল। পেটের ক্ষিধে মেটাতে যেমন খই, এই দিচ্ছে এই নেই, আরো দাও আরো চাই, মনের ক্ষিধে মেটাতে তেমন বই। দিতে না দিতেই লে আও লে আও।

বই যদ্দিন কালিকলমের রায়ত ছিল, ফ্যাচাং ছিল না। বই-পুঁথির কব্জাদার গুরুপণ্ডিতের টিকির ডগে মুলুকের তামাম জান বন্ধক রেখে খাচ্ছি দাচ্ছি মৎস্য মাচ্ছি করে হুক্কা টেনে বেড়াতুম। কিন্তু তগদিরের বাঁশে ঘুণ ধরলে কোন্ ইয়ে কিং করিষ্যতি। হস্তরেখার বেরস্পতির দৃষ্টি জ্বলজ্বল, চোখ বুজে অন্ধকারে থাকব সে উপায় কই? দেশ গেল

বিদেশীর হাতে। আর মশাই সেই সাত সমুদ্দুর তের নদী কাঠের জাহাজে পার হয়ে বনের মোষ তাড়াতে এল কজন ফেদর পাদ্রী। বাংলা ভাষায় বই ছাপালে তারাই প্রথম। বানালে ছাপাখানা, তৈরি করলে টাইপ। হুগলীর পঞ্চা কামার, পঞ্চানন কর্মকার, বড় সরেশ কারিগর। সাহেবরা হাঁ করতেই পেটের কথা বুঝে ফেলে। কাঠ খুদে খুদে বাংলা হরফ তৈরি করে ফেললে। তাই দিয়ে ছাপা হল পাদ্রী হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ। সন ১৭৭৬ সাল, সাকিন শ্রীরামপুর। ওই হল কলেজ ইস্টিটের আজকের এমন মডার্ন ফ্যাসানের বই-পাড়ার প্রপিতামহীর ঠিকানা। কলকাতায় ইংরেজেরা জেঁকে বসলে বিদ্যেদেবী ছানাপোনা সমেত নতুন বাসায় উঠে এলেন। বাঙালী প্রকাশকরা বটতলায় ফরাস পাতলেন। ব্যবসা বেড়ে উঠল। ছড়িয়ে পড়ল চীনেবাজার অব্দি।

চিৎপুরের বাড়ি ছেড়ে হিন্দু ইস্কুল উঠে এল পটলডাঙায়। ইস্কুল থেকে কলেজ হল সন ১৮১৭ সালের জানুয়ারী। সংস্কৃত কলেজের পত্তন হল সন ১৮২৪এ। পটলডাঙায় বিদ্যের নতুন বাজার বসে গেল। পর পর ইস্কুল কলেজ খুলতে লাগল কাছাকাছি। বিদ্যাসাগর মশাই ওদিকে খুললেন মেট্রোপলিটান ইস্কুল আর কলেজ। পাড়াটা জমজমাট হয়ে উঠল।

পরের পুরুষে সুরেন বাঁড়ুজ্যের রিপন কলেজ, ওদিকে সিটি কলেজ, পাদ্রীদের স্কটিশ চার্চ কলেজ, বেথুন ইস্কুল-কলেজ, শেয়ালদায় বঙ্গবাসী। লেখাপড়ার হিড়িকটা পড়ল এ তল্লাটেই বেশি। বই-পাড়াটাও ও তল্লাট থেকে ঝাঁপ ফেলবার জন্যে উসখুস করতে লাগল। বড়লাট ক্যানিং সন ১৮৫৬ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত হিন্দুস্থানের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন। তাঁর নামে এই কলেজ ইস্ট্রিট পাড়ায় একটা বইএর দোকান দরজা খোলে। দোকানটার নাম ক্যানিং লাইব্রেরি। এঁরা

টেকচাঁদ ঠাকুরের 'লুপ্তরত্নোদ্ধার'-এর প্রকাশক। বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনের জন্যে কাউকে টাকা পয়সা দেবার দরকার হলে এই দোকানে সিলিপ পাঠাতেন আর এঁরা সেই রোকাটুকুন দেখে পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিতেন।

গল্পটা বেশ জমে উঠেছিল। প্রকাশক ভদ্রলোকটি বেশ কইয়ে বলিয়ে। বললেন, ব্যবসাই তো দু কেলাস বইএর। এক পাঠ্য যদি হয় আর নয় একেবারে অপাঠ্য হওয়া চাই। দেখলুম তো মশাই যুদ্ধের সময়। কি বিক্রিটাই না হয়েছে। শিক্ষিত শিক্ষিত সব ছোকরা, খাকী উর্দি গায়ে চাপিয়ে ভাবলে, না জানি কি হনু রে! লজ্জা শরম গুলে খেয়েছে, সটান এসে বলে কি, কড়া সেক্সী বই আছে মশাই। তোর ছেঁকছির কড়ায় আগুন, মনে মনে ভাবি। কিন্তু খদ্দের যাই হোক গুরুর খাতির দিতেই হয়, মুখের ওপর বলতে পারলুম না কিছু। কামিয়ে নিয়েছে ভুঁইফোঁড় পাবলিশাররা। ফুটপাতেও আর বই পড়তে সময় পায়নি। তবে এ যুদ্ধে লালে লাল হয়েছে কাগজওয়ালারা। কোটি কোটি টাকা করে নিয়েছে। ফার্স্ট গ্রেট ওয়ারের সময় এই অ্যালবার্ট হলের অবস্থা কি? কখানাই বা দোকান ছিল। তবে বলি শুনুন, ওদিকে গুরুদাস, শরৎ লাহিড়ী, স্টুডেণ্টস লাইব্রেরী, এস্ সি আড্ডি এরা সব আগেকার। অ্যালবার্ট হলের পুরোনো দোকান বোধ করি চক্রবর্তী চ্যাটার্জি, সেন রায়, ধরেরা এসেছে পরে। দাশগুপ্ত ওরাও পরে এসেছে। তারপর আস্তে আস্তে কে কখন কোথায় বসেছে অত হিসেব আর স্মরণে আসছে না। তবে একটা কথা, বাংলা বইএর ব্যবসাটা এখনো পুরোপুরি বাঙালীদের হাতেই আছে। আর বড় কম লোক নেই, এই ভাঙা বাংলাতেও এসোসিয়েশনের মেম্বর হচ্ছে বারো শ। এর বাইরেও অনেক আছে। কলকাতা শহরেও, তা আড়াইশ দোকান আছে বই-এর। বেশি বই কম হবে না।

কম বেশি দুকোটি টাকা খাটছে বলে আমার বিশ্বাস, আর একজন বললেন। সঠিক হিসেব পাবার কোনো রাস্তা নেই। এসোসিয়েশনেও পাবেন না। আমরা জাতটাই যে বড় বেহিসেবী। এই দেখুন না, বই-ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে ধারে কাছে একে ভর দিয়েই আরো কত ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেছে। ছাপাখানার তো অন্ত নেই কলকাতায়। কাগজ, কালি, পিচবোর্ড, বই সেলাইএর সুচ-সুতো, টাইপ ফাউণ্ড্রি, ব্লক তৈরির ব্যবসা, ছাপাখানার মেশিনপত্রের ব্যবসা, কত নাম করব। হুগলীর পঞ্চা কামারের বউ যেভাবে বন-হুগলীর ভুবন তেলীর ভাজের কুটুম্ব, কারণ দুজনের এক রোদে চুল শুকোয়, কুটুম্বিতেটা অত ঢিল না দিয়েও একটু কষাকষি করে ধরলেও প্রায় পঁচিশ লাখ লোক এই ব্যবসায় করে খাচ্ছে মশাই।

আগে তো সব কাঠের ব্লকেই কাজ হত। এক প্রিয়গোপাল দাস ছিল ব্লক মেকার, অত ভাল কাঠের কাজ আর কেউ জানত না। বাঙালীদের মধ্যে হাফটোন ব্লক আমদানি তো করলেন উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মশায়। এই সেদিনের কথা। এখন দেখুন কেমন ধাক ধাক করে এ ব্যবসাটাও বেড়ে উঠল। কোন্‌টাই বা বাদ রাখব, দপ্তরীর কথাই কি কম। বৈঠকখানার চত্বরকে-চত্বর দপ্তরীতে বোঝাই। দুশ আড়াইশ ফার্মের কম হবে না। কয়েক হাজার লোকের রুজি জুটছে এই কম্মে।

দপ্তরী পাড়ায় ঘুরেছি। বেশির ভাগই মুসলমান। খানদানী পেশা এদের। আলী দপ্তরী বললে, নিজের চোক্ষেই দেইখ্যা যান বাবু। কওনের কথা আর আছে কি। আমাগো কাম পুরাই গতরের। গতর ছুটি নিছে তো সব ফাঁক। আমাগো ব্যবসার সব কেপিটালের সেরা কেপিটাল হইল বিশ্বাস। বেইমানের কোন জায়গা এ পাড়ায় নাই। বাবুগো কাছে গেলাম। বাবু হুকুম দিল, অমুক প্রেসে ফর্মা আছে

তমুক প্রেসে কভার আছে, যাও মিস্তিরি নিয়া, পরশু আড়াইশ বই চাই। বাবু কি চোক্ষে দেখল মাল? চিরকুট দিয়াই খালাস। প্রেসে গেলাম, ফর্মা গোনলাম আমিই, মিলাইয়া লইলাম আমিই, প্রেসের খাতায় টিপছাপ দিয়া মাল নিয়া গেলাম গিয়া। বেবাক মাল আমার ঘরেই থাকল। বাবুর যেমুন দরকার ছাপ্লাই দিলাম। এই আমাগো দস্তুর। রাইয়টের সময় কি-একটা দিনই গেছে। এই আকামা বদমাইসগুলার তো আর আক্কেল নাই, না জানি কখন আগুন দিয়া বসে। বাবুগো হাজার হাজার টাকা আমাগো ঘরে, আর ছাখছেন নি, এই তো বস্তির ঘর, হিত অহিত কিছু হইয়া পড়লে বেবাকই গজব। বাবুগো মাল বাবুগো বুঝ দিয়া তবে নিশ্চিন্দি। বাপ দাদা হাচা আছিল, হে গতিকেই পারছি।

হিন্দু দপ্তরীর চাইতে মুসলমানেরা ভালো, অনেকের কাছেই শুনেছি। এক প্রকাশক বললেন, ছ্যা ছ্যা, ওদের কথা আর বলবেন না মশাই। হিন্দু বলেই সাত খুন মাপ এমন আস্থা আমার কাছে নেই মশাই। যতদিন মুসলমানেরা কাজ করেছে একটা কমপ্লেন ছিল না। আর দেখুন সেই গণ্ডগোলের সময় একজনকে ডেকে এনে মাল [illegible] দিলুম, তা সে এমন বেয়াক্কেলে মশাই, কাউকে কিছু না বলে সেরেফ গায়েব হয়ে গেল। স্বজাতি কিনা, স্বজাতিকে সজাতি বাঁশ না দিলে আর কে দেবে? আমি দিনকতক ভাইপো হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে, তিন জোড়া জুতো ছিঁড়ে, নয় ছয় করে কিছু মাল উদ্ধার করে মুসলমানদের হাতে তুলে দিলুম। ওরা কাজও জানে ভাল। সেই যে গোলমাল হয়ে গেল বই-এর, কত টাকা লোকসান দিলুম বলুন তো। কপি-রাইট আমার নয়, রয়ালটি পুরো গুনে দিতে হল লেখককে। ভাবেন পাবলিশাররা সবাই বোধ হয় দুধে ভাতে আছে। লেখক লেখক করেন, ভাবেন খুবই বুঝি নির্জীব ব্যক্তি সব। রাজাগজার পর্যায়ে উঠে গেলে গরমে কাছে যেতে

পারবেন না মশাই। নাম করে আর লালবাতি জ্বালতে চাইনে, নাম হয়েছে শুনে ধরলুম গিয়ে। লেখক বললেন, উপন্যাস মোটে এক চ্যাপ্টার লেখা হয়েছে। এখুনই যদি এগ্রিমেণ্ট করেন তো আসুন। কিন্তু রয়ালটি পুরো অ্যাডভান্স করতে হবে। টাকার বিশেষ দরকার। বুঝুন একবার, কোথায় উপন্যাস তার ঠিক নেই, পুরো টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে! নাম হয়েছে এখন, মানতে হবে বৈকি, সেই টার্মসেই রাজি হলুম। দিলুম টাকা। কথা হল তিন মাসের মধ্যেই ম্যানাস্ক্রিপ্‌ট দিয়ে যাবেন। তা দেখুন, তিন তিরিক্ষে সাড়ে নয় মাস হতে চলল, কোথায় ম্যানাস্ক্রিপ্‌ট আর কোথায় বা কি? লেখক কোথায় তার ঠিক নেই আর আমি এই দোকানে বসে ভ্যারেণ্ডা ভ্রাই করছি। লেখকের কাছে দুদিন গেস্‌লুম। কথাটা বলতেই, ফাউণ্টেন পেন খুলে নিয়ে তেড়ে এল মশাই। বললে, তাগাদা দেবেন না। লেখাটা তিসির ব্যবসা নয়। উপন্যাসের নাম ভাবতেই ছ মাস লাগে। ল্যাজ গুটিয়ে চলে এলুম। নৌকো যতক্ষণ ঘাটে বাঁধা মাঝিকে থোড়াই কেয়ার। কিন্তু গাঙের মধ্যে সেই মাঝিটাই বাবাঠাকুর হয়ে ওঠেন।

কিন্তু লেখকদের কি বলবার নেই প্রকাশকদের নামে? সত্তর টাকায় দুখানা বইএর কপি-রাইট শরৎচন্দ্রকে বেচে দিতে হয়েছিল। অন্যের কথা আর কি বলব। পাবলিশারদের ফিকির কি নেহাৎ কম? উপন্যাস ছাড়া বাজারে কিছু ভালো চলে না, আচ্ছা গল্পের বই কম দামে কিনে নাও। নিয়ে উপন্যাসের রং করে ছেড়ে দাও বাজারে। ছোটগল্পের বইএর টাইটেল দু পাতাতেই চালিয়ে দাও। এক নজরে যেন হঠাৎ উপন্যাস বলেই মনে হয়।

ইস্কুল-বইএর সিজিনে পাড়াটা যেন মৌমাছির চাক হয়ে ওঠে। গাদা গাদা লোক আসছে যাচ্ছে। ডজন ডজন বই যাচ্ছে মফস্বলে।

ঝমাঝম টাকা আসছে সিন্দুকে, এক এলাহী কারবার। ক্যানভাসার গোবিন্দ ধাড়া বললে, এর জন্যে কাঠখড় কি কম পোড়াতে হয়। ডিসেম্বরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারির শেষ ইস্তক তো বিক্রির মরশুম কিন্তু কাজকারবার শুরু হয় অক্টোবর নবেম্বর থেকে। কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে সব ইস্কুল। ছোট সেখানে। যম যেখানে যেতে পারে না বইএর ক্যানভাসার সেখানেও গিয়ে হাজির হয়। পেটের জ্বালা বিষম জ্বালা মশাই। আর কী নচ্ছার কাজ যে এই বইএর ক্যানভাসারি, কি বলব। আমিও ছাত্তরবিত্তি পাশ। প্রাইমারী ইস্কুল কিছুদিন গাধা ঠেঙিয়েছিলাম। পোষাল না! ছেড়ে এই বৃত্তি নিয়েছি। প্রথম প্রথম বেশ ভদ্দর-লোকের মতো পোশাক-আশাক করতাম। কিন্তু তাতে গোলমাল হতে লাগল। ভদ্দরলোকের মতো চেহারা দেখে হেডমাস্টার মশাই আসুন আসুন বলে চেয়ার এগিয়ে দেন। কি খবর, কি হেতু আগমন ইত্যাদি প্রশ্নের পর যেই শোনেন যে বইএর দালাল, আর যাবে কোথায়! না পারেন তাড়াতে, না পারেন কিছু করতে। তাই সোজাসুজি কাট মারেন, গার্জেনদের মহা আপত্তি, এবার আর বুক লিস্টি বদল করা হবে না। তার উপর আর কথা কি? এই তো মশাই মুশকিলে পড়ে গেলাম। যেখানে যাই ওই অবস্থা, বই আর লাগাতে পারিনে একটাও। কোম্পানি ধাতানি লাগায়। শেষকালে একদিন ধুত্তোরি বলে, ভদ্দর-লোকের পোশাক খুলে ক্যানভাসারের পেটেন্ট সাজ ধরলুম। মশাই, ফুসমন্তরে যেন ছুনিয়া বদলে গেল। এখন আমি এ লাইনের এক ঝানুর ঝানু তস্য ঝানু। ইস্কুলে পৌঁছবার আগে হেডমাস্টারের বাড়িতে একটা মাছ, তাঁর ছোট মেয়ের জন্যে শেলেট আর রঙিন পেন্সিল, মেজো ছেলের জন্যে 'শরীরে দিল কাঁটা' সিরিজের ছুটো বই, হেডমাস্টার-মাসিমার জন্যে এক কৌটো জর্দা নিয়ে মাস্টারমশাইএর পায়ের ধূলো নিই। ওতেই অর্ধেক কাজ এগিয়ে থাকে। ভাববেন না, এতেই

হাঙ্গামা ঢুকে গেল। মাস্টারমশাই বলে বসলেন, ছ্যাখ হে, ক্লাস সেবেনের ইংরিজীটা আর এবার তোমাদের লাগল না, মুখুজ্জে মশাই হেড্-এগ্‌জামিনার হয়েই ল্যাঠা বাধিয়েছেন, ওঁর বইটাই এবার দিতে হয়। আজ্ঞে, আমাদেরটা এবার দিতেই হবে, গতবার দেননি, স্যার, হেঁ হেঁ আপনি মন করলেই হয় স্যার, হেড এগ্‌জামিনার আছেন, তিনি আছেন, আপনার এলাকায় হাত ঢোকায় তাঁর ইয়ের বড় ক্ষ্যামতা। মফস্বলে আছেন পড়ে, তাই, কলকাতা হলে আপনার যা সুনাম, কলেজে কলেজে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। তা তুমি ঠিকই বলেছ, দেখছি তো প্রোফেসারদের। নিতান্ত একটা মিশন নিয়ে পড়ে আছি, শহরে যাব না, ব্যাক টু ভিলেজ, তাই—। দিলুম ভিজিয়ে। বই লেগে গেল। কেউ কেউ মশাই মহা বিচ্ছু। সোজা তো বলতে পারে না, তাই ঘুরিয়ে নাক দেখায়। বইএর কথা বললেই বলেন, তা তো বুঝলাম হে, কিন্তু পুওর ফণ্ডের কি করছ, আর চার কপি বই দেবে গরীব ছেলেদের জন্যে, কমপ্লিমেণ্টারী। তাই সই, যে ফুলে যে দেব তুষ্ট। কারো বা বুক-লিস্টি ছেপে দিতে হয় ফিরিতে। কাজ কি সোজা! শুকনো হাতে যে পরিমাণ অয়েলিং করতে হয়, সত্যিকার তেল লাগাতে গেলে বার্মা শেলের ইস্টক শুকিয়ে খট খটাং হয়ে যেত মশাই।

বই-পাড়ার আরেক বাসিন্দা ফুটপাথের বই। যত দেখি, ততই আশ্চর্য হয়ে যাই। বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার সঙ্গে ফ্লবেয়ারের মাদাম বোভারী এক বিছানায় শুয়ে গঙ্গাজল পাতায়। কালিদাস আর কালিদাস রায়, বাণভট্ট আর বারীন দাস, চার্লস ডিকেন্স আর গোপাল হালদার, শেকস্‌পীয়র আর শচীন সেন গুপ্ত, আরো জানা এবং অজানা অজস্র লেখক একই ফুটপাথে শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে অব্যক্ত কোরাসে জানিয়ে দেন, হেথায় সবারে হবে মিলিবারে। এত বই এরা পায় কোথায়? জিগ্যেস করেছিলুম। জবাব দিয়েছিল, ঘুরে ঘুরে কিনি।

অনেকে বেচতে আসেন। শিশি-বোতল ওয়ালারা জোগাড় করে আনে, নীলামেও কিনি বাবু। ঠিক আছে কি কিছু ? আরেকটা খবর ওরা বাদ দিয়ে গেল। সেটুকু ধরিয়ে দিলেন এই লাইনের এক ঘাঘু। দপ্তরীর বাড়ি থেকে কিছু যায়। আর লেখকরা তাদের কমপ্লিমেণ্টারী কপি, সমালোচকেরা সমালোচনার কপি কিছু কিছু ঝেড়ে দেন না ভেবেছেন ? বিখ্যাত বিখ্যাত লেখকরাও অনেক সময় এ কর্ম্ম করেছেন, এই লাইনে আঠারো বচ্ছর কাটালুম. অন্ততপক্ষে আট গণ্ডা কেস আমি জানি। আরে অন্য লোকের কথা ছেড়েই দিন, শুনলে অবাক হবেন, এদিকে সরে আসুন, বলে ফিস্ ফিস্ করে কানে কানে একটা নাম বললে। সত্যিই অবাক হলুম। ভদ্রলোক হাসতে বললেন, নিজের স্বচক্ষে দেখা মশাই, হুঁ হুঁ। যাক আবার কথাটা কাউকে বলে বেড়াবেন না যেন।

সমাপ্ত